হাজার বছরের গম্ভীরা

সম্পাদনায়
ড. মাযহারুল ইসলাম তরু
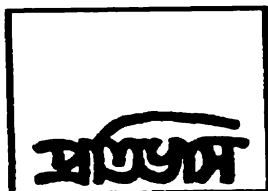
প্রতিভাস □ কলকাতা

প্রথম প্রকাশ
২৩ এপ্রিল ১৯৯৮

প্রকাশক
বীজেশ সাহা
প্রতিভাস
১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা- ৭০০০০২
দূরভাষ : ২৫৫৭-৮৬৫৯

মুদ্রক
বইপাড়া পাবলিকেশনস্ (প্রিন্টিং বিভাগ)
১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা- ৭০০০০২

সূচিপত্র

গম্ভীরা নামকরণের রহস্য

শুভঙ্কর দাস

"শিবঃ প্রধানঃ পুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা।
শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ"॥
–ভগবত গীতা

গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তু মূলত শিবকে কেন্দ্র করে। তাই শিব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু বলা প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনাল্ড শিব সম্পর্কে বলেছেন : "Rudra of The Rig Vada is the earlier form of Siva"। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীয় মতে বৌদ্ধ অক্ষোভ্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মে শিব হয়েছেন। এছাড়া ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্মোহতন্ত্র থেকে প্রমাণ দিয়ে বলেছেন; "There was a Sage Called Aksobhya, who was Siva himself in the form of man on the northern side of Meru. It was he who meditated first on the goddess, who was Parvati herself incarnating in Chinadesh at the time of that great deluge."

যাই হোক এবার আলোচনা প্রসঙ্গে আসা যাক্। প্রাচীন ভারতীয় সংগীত গ্রন্থগুলি পাঠে জানা যায় ন-কার দ্বারা "প্রাণ" এবং দ কার দ্বারা "অগ্নি"– এই দুয়ের (ন এবং দ) সম্মেলনে 'নাদ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। নাদের দ্বারা বর্ণ উৎপন্ন হয়, বর্ণ থেকে সৃষ্টি হয় পদ, পদ থেকে ভাষা উৎপন্ন হয়– এই ভাষাই আমরা ব্যবহার করি। ভাষায় যে সব ধ্বনি আছে তাদের লিখিত রূপ বা প্রতীককে বলা হয় বর্ণ অর্থাৎ ধ্বনির প্রতীককেও অক্ষর বলার রেওয়াজ আছে। যেমন–অ, আ, ক, খ ইত্যাদি। যাই হোক্ এখন গম্ভীরা শব্দটি বিশ্লেষণে তিনটি সাংগীতিক স্বর দেখা যায়। অর্থাৎ গম্ভীরা = গ্ +ম্ + ভ্ + ঈ্ + র্ + আ্। এখানে গ অর্থাৎ গান্ধার স্বর, ম অর্থাৎ মধ্যমস্বর এবং "র" অর্থাৎ ঋষভস্বর তিনটি সাংগীতিক স্বর এর মধ্যে আছে। এই তিনটি গানের স্বর এর স্বরূপ বর্ণনা করেছেন সংগীত পণ্ডিতগণ মহেশ্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের সাহায্যে। তাই গানের "গ, ম, এর-র" এর স্বরূপ বর্ণনার পূর্বে মাহেশ্বর সূত্র সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে, বিশেষ করে সাধারণ পাঠকদের জন্য।

প্রাচীন ব্যাকরণ-পণ্ডিতগণ স্বল্পাক্ষরে সূত্র গ্রথিত করবার জন্য বর্ণ সমূহকে কৌশলে শ্রেণীবদ্ধ করে তাদের দ্বারা এক একটি সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তন্মধ্যে মহেশ্বর সূত্র উল্লেখযোগ্য। মাহেশ্বর সূত্র হচ্ছে ১৪ প্রকার যথা– (১) অ, ই, উ, ন, (২) ঋ, ৯, ক, (৩) এ, ও, উ, (৪) ঐ, ঔ, চ, ... ইত্যাদি।

এখন মাহেশ্বর সূত্রের দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে ঋ, ৯, ক। এই সূত্রের প্রথম বর্ণ ঋ অর্থাৎ পরমেশ্বর, যা সংগীত পণ্ডিতগণের মতে আধুনিক শুদ্ধগান্ধার বা 'গ' স্বর এই স্বরের ভাব হচ্ছে শান্তরস।

উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী ব্যাকরণের পাঁচটি স্বর হচ্ছে 'অ, ই, উ, ঋ, ৯। এদের মধ্যে দুটি মিশ্রিত রূপ হচ্ছে 'এ' এবং 'ও' এবং অমিশ্রিতযুক্ত রূপ হচ্ছে 'ঐ' এবং 'ঔ'।

অ-কার এবং ই-কার এর মিলিত রূপ হচ্ছে এ-কার, ই-কার অর্থাৎ শক্তি-এর মধ্যে অ-কার অর্থাৎ ব্রহ্মার প্রবেশ যার জন্য, এ-কার হচ্ছে জ্ঞানস্বর। প্রাচীন সংগীত পণ্ডিতগণ এ-কার কে মধ্যম বা 'ম' স্বর বলে থাকেন–যার ভাব হচ্ছে শক্তিরস। অপরদিকে মাহেশ্বর প্রথম সূত্রে দ্বিতীয় বর্ণ হচ্ছে 'ই'। সংগীত পণ্ডিতগণের মতে যা হচ্ছে সাংগীতিক দ্বিতীয় স্বর ঋষভ বা 'র' স্বর। সংগীতকারগণ 'ই' কে কামবীজ বলে থাকেন। সর্ববর্ণের কারণ স্বরূপ হচ্ছে 'ই' কার বীর্য এবং শক্তি স্বরূপ হচ্ছে ঋষভ বা 'র' স্বরটি। এটি শ্রবণে বীর রস উৎপন্ন হয় এবং এর ভাব বলবান এবং শক্তিমান।

সুতরাং 'গম্ভীরা' শব্দটির বিশ্লেষণ থেকে আমরা যা জানতে পারি তা হচ্ছে 'গম্ভীরা' শব্দটিতে তিনটি সাংগীতিক স্বর যথা–গ, ম র, বিদ্যমান এবং যার ভাব ও রস হচ্ছে শান্ত, বলবান ও শক্তিমান এবং রূপ হচ্ছে মহেশ্বরের–যা গম্ভীরা গানের বৈশিষ্ট্য।

তাছাড়া প্রাচীন কালের নামকরণের ক্ষেত্রে একটি নিয়ম মানা হতো যা বর্তমান কালে হয় না, অর্থাৎ প্রাচীনকালে নামকরণ থেকে জন্মস্থান, পিতৃকুল বা বংশ পরিচয় ইত্যাদি মোটামুটিভাবে জানা যেত। যাই হোক গম্ভীরা শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করে দেখলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে এর মূল ভিত্তি, গীত ও নৃত্যের উপরে স্থাপিত। গম্ভীরার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অন্বেষণ করতে হলে আমাদের প্রাথমিক গ্রন্থ হিসেবে ঋকবেদ, অথর্ববেদের সাহায্য নিতে হবে। ঋক্‌বেদ্ থেকে গম্ভীরা 'গ' শব্দটি গাথাপতিং এর 'ম' শব্দটি "মেধপতিং" প্রতিপাদন করে। অথর্ববেদ থেকে 'ভ' শব্দটি ভূতপতিং প্রতিপাদন করে। এবং ভূতপতিং-এর জন্যেই গম্ভীরা গানের আরেকটি দিক হচ্ছে মুখোশ নৃত্য। পরিশেষে ঋক্‌বেদে 'র' শব্দটি 'রুদ্রং' প্রতিপাদন করে–যার অর্থ শিব এবং এই সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে।

অতএব গম্ভীরা শব্দে "গাথাপতিং" (গ) + মেধপতিং (ম) ভূতপতিং + রুদ্রং (রা) প্রতিপাদন করে।

যাই হোক এই নামকরণ রহস্য থেকে একটা কথা পরিষ্কার তা হলো, যে বা যিনিই এই নামকরণ করে থাকুক না কেন, যিনি গম্ভীরা নামকরণ করে ছিলেন– তিনি নিশ্চিতরূপে একজন সংগীতজ্ঞ ও তন্ত্রসাধক ছিলেন এ কথা বলা যেতে পারে।

গম্ভীরা স্মরণিকা, তৃতীয় জেলাভিত্তিক গম্ভীরা গানের প্রতিযোগিতা ও উৎসব, মালদহ, ১৯৯৭

গম্ভীরা কত প্রাচীন

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য

গম্ভীরা উত্তরবঙ্গের একটি অতি পরিচিত উৎসব। উৎসবটি এখন শিবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলে শৈব ধর্ম প্রসারের পূর্বেও এই উৎসব এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, তখন তা সূর্যোৎসব বলে পরিচিত ছিল। চৈত্র সংক্রান্তির সময় যখন সূর্যের একটি সাংবাৎসরিক উল্লেখযোগ্য 'অয়ন' হ'য়ে থাকে তখনই এই উৎসবের সময়, সুতরাং তা সুর্যেরই উৎসব, অন্য কোনও দেবদেবীর নয়। উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে শৈব ধর্ম্মের উত্থান হয়েছিল, সেইজন্য এই উৎসব তখন থেকেই শিবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

কিন্তু এই উৎসব প্রথমত: সূর্যের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তার নাম গম্ভীরা কেন? এখানে গম্ভীরা শব্দটির তাৎপর্য কি? গম্ভীরা শব্দের সাধারণ ভাবে অর্থ প্রকোষ্ঠ বা কুঠুরি। পুরীতে চৈতন্যদেব কাশী মিশ্রের গৃহে যে প্রকোষ্ঠে থাকতেন, তাকে বলা হয় গম্ভীরা। কিন্তু কেন তাকে গম্ভীরা বলা হয়, তা কেউ বুঝিয়ে বলতে পারেন নি, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ স্পষ্ট নয়। গম্ভীরা বলতে 'দেবগৃহ কিংবা মন্দির' এই পর্যন্ত পারা যায়, কিন্তু কেন মন্দির বা দেবগৃহকে গম্ভীরা বলা হবে তা বুঝতে পারা যায় না। দেবগৃহ কিংবা মন্দির অর্থে শব্দটি অন্য কোথাও বাংলা কিংবা সংস্কৃত ভাষায়ও ব্যবহার করা হয় না। সুতরাং বিশেষ অর্থেই চৈতন্যদেবের পুরীর বাসস্থানকে গম্ভীরা বলা হয়, অন্য কোনও সাধন-ভজনকারীর বাসস্থান কিংবা আশ্রমকে গম্ভীরা বলা হয় না। এদিকে শব্দটি কেবলমাত্র উত্তরবঙ্গের মালদহেই প্রচলিত, জলপাইগুড়িতে তারই আর একটি লৌকিক রূপ গমীরা শব্দটি প্রচলিত আছে, বাংলা ভাষায় অন্যত্র গম্ভীরা কিংবা গমীরা শব্দের প্রচলন নেই।

মালদহের গম্ভীরার সঙ্গে চৈতন্যদেবের পুরীর বাসস্থান গম্ভীরার কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না, কারণ এই দুই জায়গাতে শব্দটির উদ্দেশ্যে এক নয়। তা হ'লে মালদহের গম্ভীরা শব্দটি কি করে এল?

কেউ কেউ বলেছেন শব্দটি বৈদিক, কেউ বলেছেন শব্দটি দেশজ, আবার কেউ বলেছেন শব্দটি বিদেশী অর্থাৎ দ্রাবিড় কিংবা তিব্বতো-চৈনিক। এ বিষয়গুলো প্রমাণ করা খুবই কঠিন।

আমার একটি কথা মনে হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় দেখা যায় গামার কাঠ ধর্ম্মঠাকুরের পূজোয় অত্যন্ত পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। ধর্ম্ম ঠাকুর যে সূর্যদেবতা সে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। গামার কাঠের পিঁড়ি ধর্ম্মঠাকুর বা সূর্য ঠাকুরের আসন বলে গৃহীত। হয়ত এমন একদিন ছিল যখন গামার কাঠ দিয়েই সূর্য ঠাকুরের মন্দির কিংবা অন্তত দোলা নির্মিত

হতো। এখন তার অভাবে কেবলমাত্র তাঁর আসনটুকু তৈরি হয়। গামার কাঠে সূর্যদেবতার মন্দিরই হোক, কিংবা দোলাই হোক, কিংবা আসনই হোক, তা যেখানে রাখা হতো, তাকে সংস্কৃত (Sanskritize) করে পরবর্তী হিন্দু প্রভাবের যুগে গম্ভীরা বলে উল্লেখ করা হতো। ইতিমধ্যে সূর্য দেবতার পরিবর্তে শিবঠাকুর সেখানে এলে তথাপি গম্ভীরা নামটি তাতে রয়ে গেল। তাই এখনো চলে আসছে।

অনেকে মনে করেন, শিবের নাম গম্ভীরা, তা থেকে গম্ভীরা কথাটি এসেছে। কিন্তু গম্ভীরা উৎসবটি শিবের কোনো উৎসবই নয়, কোনো পুরাণেই শিবের নাম গম্ভীর বলে উল্লেখ নেই। মূলতঃ গম্ভীরা সূর্যের উৎসব। কৃষিভিত্তিক সমাজে সূর্যের পূজো সব চাইতে প্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান। যে দিন থেকে অরণ্যচারী মানুষ কৃষিকর্মে আত্মনিয়োগ করে এই অঞ্চলে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিল, সে দিন থেকেই একভাবে না একভাবে এই অঞ্চলে সূর্যের পূজার উদ্ভব হয়েছিল। গম্ভীরাও সেদিন থেকেই উদ্ভব হয়েছিল, হয়ত সেদিন গামার গাছটির পূজো হতো, তাকে গামার পূজো বলত, আজ তাই সংস্কৃতের প্রভাবে গম্ভীরা হয়েছে।

গম্ভীরা স্মরণিকা, তৃতীয় জেলা-ভিত্তিক গম্ভীরা গানের প্রতিযোগিতা ও উৎসব, মালদহ ১৯৯৭

বাংলাদেশের খ্যাতিমান গম্ভীরাশিল্পী

মরহুম কুতুবুল আলম (নানা) ও মরহুম রকীবুদ্দীন (নাতী)

স্বর্গীয় বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ (নানা) ও ফাইজুর রহমান মানি (নাতী)
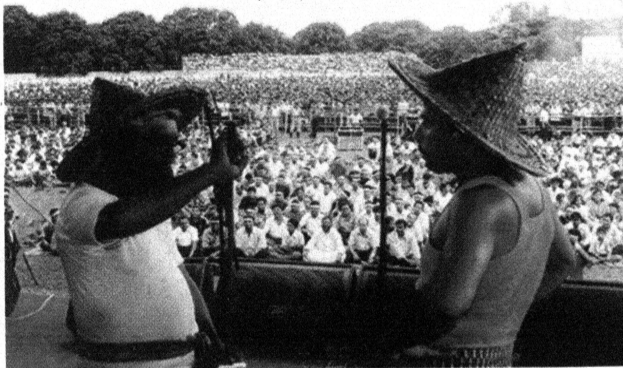
বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় গম্ভীরা জুটি
মাহবুবুল আলম (নানা) ও ফাইজুর রহমান মানি (নাতী)

গম্ভীরাগানের অন্যতম জনপ্রিয় জুটি সৈয়দ শাহজামাল (নানা) ও সোহেল রানা (নাতী)
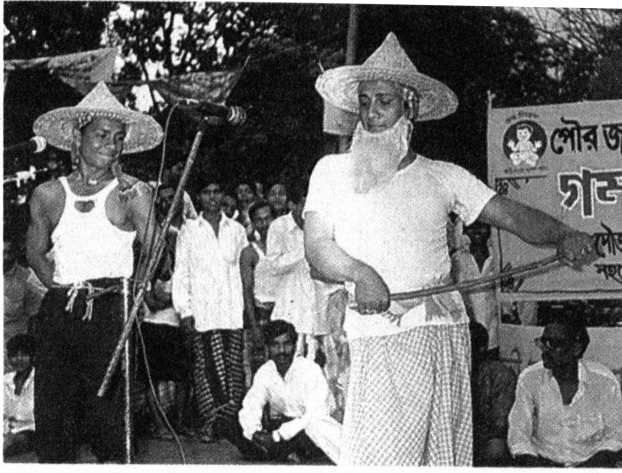
খাইরুল আলম মাস্টার (নানা) ও শীশ মোহাম্মদ (নাতী)
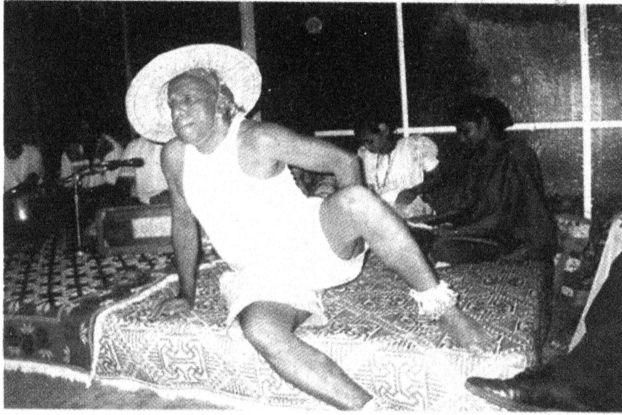
একটি বিশেষ মুহূর্তে গম্ভীরা মঞ্চে নাতী রকীবুদ্দীন

প্রবাদ প্রতিম গম্ভীরাশিল্পী রকীবুদ্দীনের সঙ্গে
একান্ত আলোচনারত ড. মাযহারুল ইসলাম তরু

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত গম্ভীরা গান

গম্ভীরার আসরে শিব

শিব বন্দনা
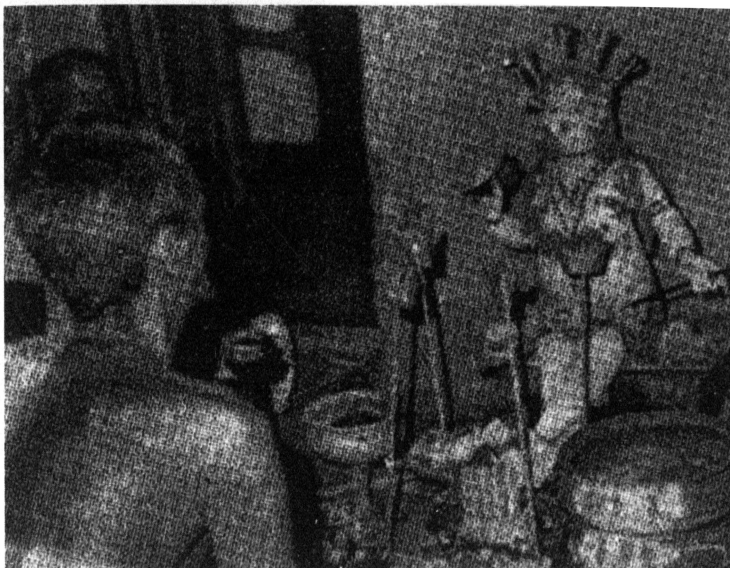
শিবপুজা

চারইয়ারী

দুই বাংলার খ্যাতিমান গম্ভীরাশিল্পী ও রচয়িতা
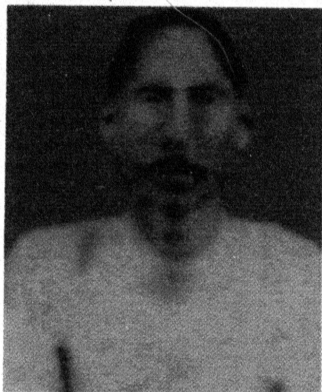
আধুনিক গম্ভীরা গানের রূপকার
শেখ শফিউর রহমান
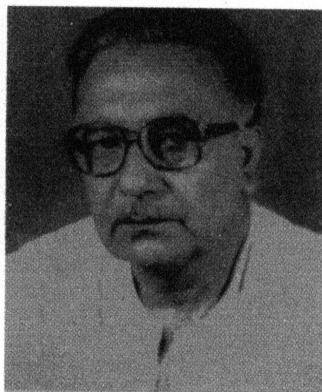
বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

বিশ্বনাথ পণ্ডিত
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
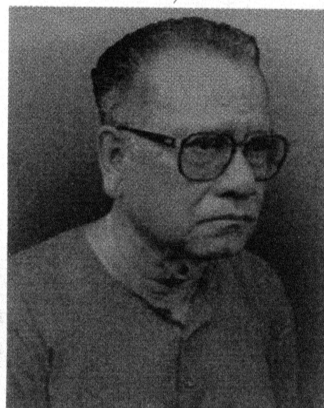
ডা. দেবপ্রসাদ সাটিয়ার
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
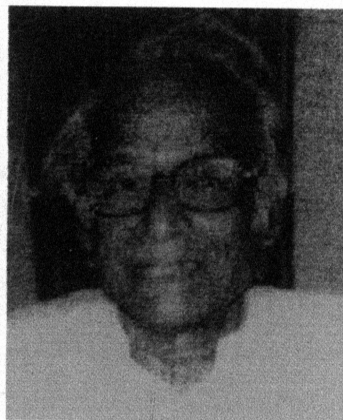
দোকড়ি চৌধুরী
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
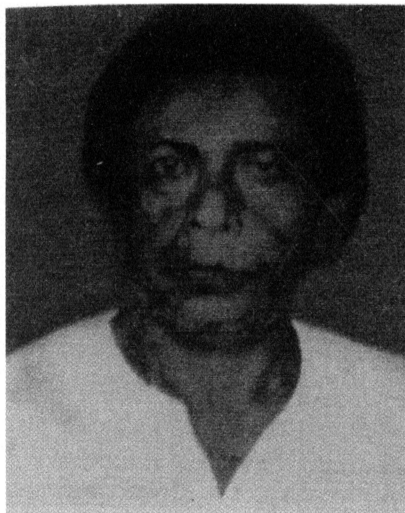
যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী (মটরা)
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
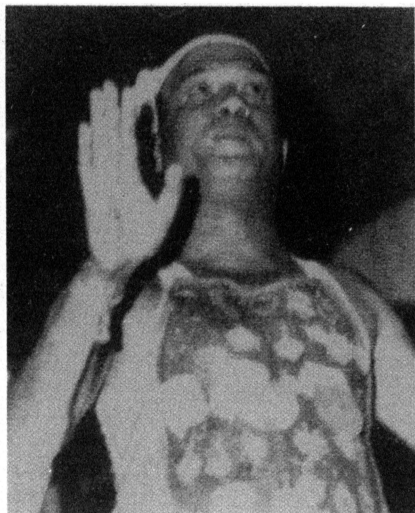
নির্মল দাস (নিরু)
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
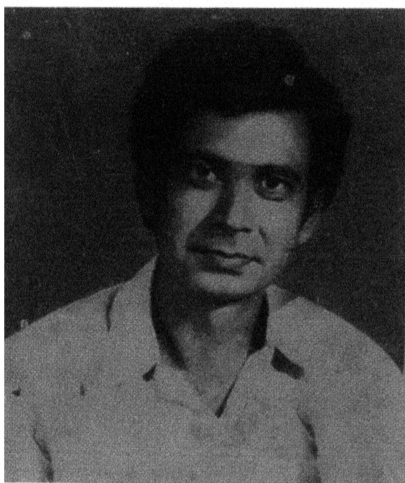
অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম
চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বাংলাদেশ

অধ্যাপক আবদুল গণি
চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বাংলাদেশ

আদ্যের গম্ভীরা

বাঙ্গালার ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাসের
এক অধ্যায়

শ্রীহরিদাস পালিত
ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারী, জাতীয়
শিক্ষাসমিতি, মালদহ

মালদহ-জাতীয়শিক্ষাসমিতির সম্পাদক
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি. এল্, কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

১৩১৯

সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত] [মূল্য ২৲
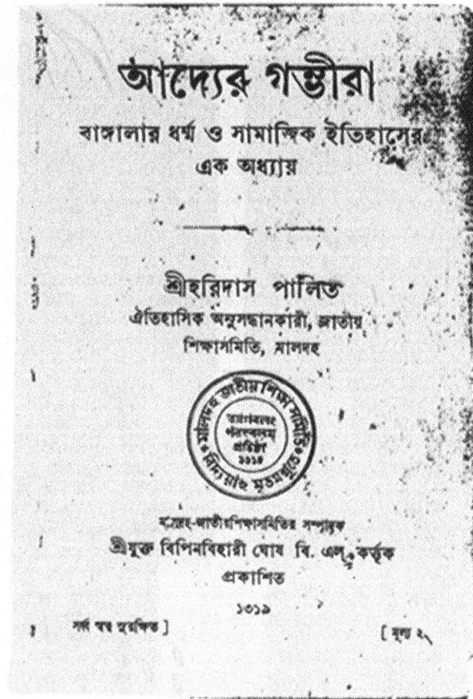
১৩১৯ সনে প্রকাশিত শতবর্ষের প্রাচীন গম্ভীরা বিষয়কগ্রন্থ
'আদ্যের গম্ভীরা' গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা, লেখক : হরিদাস পালিত

: দুই বাংলার গম্ভীরা গবেষক :

ড. প্রদ্যোৎ ঘোষ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
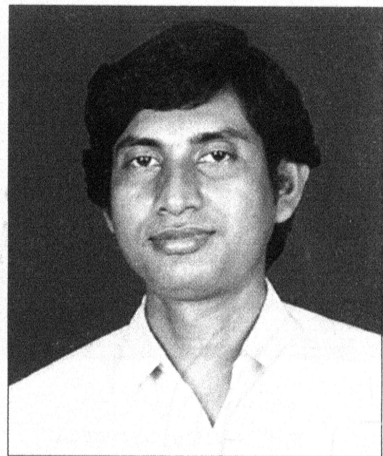
ড. মাযহারুল ইসলাম তরু
চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বাংলাদেশ

গম্ভীরার শাস্ত্রীয় প্রমাণ

হরিদাস পালিত

শিবপুরাণে বিরাট শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি

গাজনের শাস্ত্রীয় প্রমাণ ঃ শিবপুরাণ : যখন এই বিশ্ব সৃষ্টি হয় নাই বা সৃষ্টির উপক্রমমাত্র হইয়াছে তখন বিশ্বব্যাপী একটি তুষারধবল লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত ছিল। শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীব্রহ্মা সেই সাকার লিঙ্গমূর্ত্তির ঊর্দ্ধ, পার্শ্ব ও অধোদেশের সীমা নির্দ্দেশে সমর্থন হন নাই। উহা সাকার হইয়াও সসীম নহে, অসীম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিরাজিত ছিল। শৈবগণের আদিদেব এই প্রকার মহৎ ও বিশ্বব্যাপী। তিনি আদিনাথ মহাদেব। তাঁহা হইতেই এই মহান্ বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে।

শিব মানববৎ সংসারী

ক্রমশই এই শিবের বিশ্বরূপ ক্ষুদ্র সাকার রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িল। মানব-প্রকৃতি তাঁহাকে সংসারী সাজাইয়া ষড়্ রিপুর বশীভূত করিয়া আনিল।

ধর্ম্মসংহিতার বহুযোজন বিস্তীর্ণ লিঙ্গ

"একদা ভগবতী ত্রৈলোক্যসুন্দরী শবরীবেশে শবরবেশধারী মহাদেবের সহিত ভ্রমণে বাহির হইলেন; ঋষিপত্নীরা সৌন্দর্য্যময় শবরের দর্শনে ও তাঁহার মধুর বাক্যাবলী শ্রবণে মোহিত হইয়া সকলে তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। পতিগণের নিষেধসত্ত্বেও তাঁহারা ফিরিলেন না। তাহাতে তাপসগণ শবরকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, 'আমাদিগের এই মহারণ্যে এমন কোন রাজা নাই যে, পরস্ত্রীরত তোমার লিঙ্গ ছেদন করে। পরদাররত দূরাত্মা ব্যক্তির লিঙ্গচ্ছেদনই কর্ত্তব্য। এই মূর্খ দুরাচার আমাদিগের ক্ষেত্রদারাপহারী, অতএব আমরা স্বয়ংই ইহাকে দন্ড দান করিব।' মণিগণের শাপে লিঙ্গ পতিত হইল।"

"মুনীনাং অত্র শাপেন পপাত গহনে বনে।
বহুযোজনবিস্তীর্ণং লিঙ্গং পরমশোভনম্॥"
–ধর্ম্মসংহিতা।

মিশরদেশীয় শিবরূপী অসীরিস্ দেবের লিঙ্গ উপাসনা, গ্রীস ও বেবিলনের পিত্তলময় সুদীর্ঘ লিঙ্গ

সেই সুদীর্ঘ লিঙ্গের নাম বিজয়। মিশরদেশীয় শিব অসীরিস্ সম্বন্ধেও এতাদৃশ একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে। টাইফন্ নামক দেবতা অসীরিস্‌কে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন। এই অশুভ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভার্য্যা আইসীস্ দেবী সেই সমস্ত দেহখণ্ড সংগ্রহপূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ স্থানে খনন করিয়া রাখেন, কিন্তু লিঙ্গাংশ প্রাপ্ত হন না–এই নিমিত্ত উহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার পূজা ও মহোৎসব প্রচলিত হয়।

গ্রিকেরা বেকস্ দেবের মহোৎসববিশেষে একশত বিংশতি হস্ত দীর্ঘ একটি স্বর্ণময় লিঙ্গমূর্ত্তি বহন করিয়া লইয়া যাইত।

বেবিলন দেশে যে সমস্ত পিত্তলরচিত পুরাতন লিঙ্গমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষীয় শিবলিঙ্গ মূর্ত্তির অবিকল প্রতিরূপ। তথায় তিন শত হস্ত দীর্ঘ লিঙ্গ মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইত।

যাহাই হউক ধর্ম্মসংহিতা লিখতি 'বহুযোজনবিস্তীর্ণং লিঙ্গং' উক্তি হইতে অতি বৃহৎ লিঙ্গেরই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এই প্রকার লিঙ্গোপাসনার ক্রম ও পদ্ধতি নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইল।

লিঙ্গ উপাসনা পদ্ধতি

"সাধক শুক্লপক্ষে নিজের চন্দ্রতারানুকূল দিবসে শিবশাস্ত্রের বিধানে যথোক্ত পরিমাণে লিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া এবং পবিত্র স্থানে ভূমির পরীক্ষা করিয়া ব্রক্ষ্যমাণ প্রকারে লক্ষণোদ্ধার করিয়া দশোপচারে পূজা করিবে। প্রথমে গণেশপূজা ও স্থানমার্জ্জনাদি করিয়া লিঙ্গটিকে স্নানগৃহে লইয়া রাখিবে। তখন কুঙ্কুমাদি রসে রঞ্জিত কাঞ্চনশলাকাদ্বারা অঙ্কিত লিঙ্গকে শিবশাস্ত্রোক্তবিধানমতে খোদিত করিবে।

সুভদ্র, বিভদ্র,সুনন্দ ও বিনন্দ নামক দ্বারপাল

অষ্ট পূর্নকুম্ভের বারি (পঞ্চামৃত জল) ও পঞ্চগব্য দিয়া বেদীর সহিত লিঙ্গটির শোধন করিয়া পূজা করিবে। পরে সেই সবেদীক লিঙ্গটিকে দিব্য জলাশয়ে লইয়া গিয়া অধিবাস করিবে। যে পবিত্র মনোহর গৃহে লিঙ্গাধিবাস হইবে, তাহার তোরণাদি দর্ভমাল্যে ও আবরণপটে সর্ব্বাধিক শোভমান থাকিবে এবং তথায় অষ্টদিগ্‌গজ ও অষ্টদিক পালের প্রতিমূর্ত্তি ও অষ্টপূর্ণকুম্ভ (অষ্ট মঙ্গল কলস) থাকিবে এবং গৃহের মধ্যস্থলে একটি পদ্মাসনচিহ্নিত ধাতুময় বা দারুময় পীঠবেদী প্রস্তুত থাকিবে। প্রথমে সুভদ্র, বিভদ্র, সুনন্দ ও বিনন্দ এই চারিটি দ্বারপালকে * যথাক্রমে পূজা করিয়া সবেদীক লিঙ্গকে স্নান করাইয়া বস্ত্রযুগ্মদ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত করিবে ও শনৈঃশনৈঃ জলসমীপে লইয়া গিয়া পীঠিকার উপর পূর্ব্বশির করিয়া শয়ন করাইবে। উহার পশ্চিমে পিণ্ডিকা রাখিবে; এই স্নানেই সর্ব্বমঙ্গলময় লিঙ্গের পঞ্চরাত্র বা ত্রিরাত্র অথবা একরাত্র অধিবাস করিবে। পরে পূর্ব্বমত পূজিত দেবগণকে বিসর্জ্জন করিয়া একমাত্র লিঙ্গটিকে উঠাইয়া পূজা করিয়া উৎসবপথে শয়নগৃহে আনয়ন করিবে। নানা মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি সহকারে লিঙ্গটিকে আনয়ন করিয়া রক্তবস্ত্রযুগ্মে ও পিণ্ডিকা দ্বারা বেষ্টন করিয়া পূর্ব্বের মতো শয়ন করাইবে। লিঙ্গের ন্যায় প্রতিমাতেও প্রতিষ্ঠা কার্য্য করিবে।"

* শূন্যপুরাণে ধর্ম্মের পাঁচটী দ্বারপাল। "অথ দ্বারমোচন" দেখুন। "উল্লুক মুক্ত কৈল পঞ্চম দুয়ার।"

শিবোৎসবে নৃত্য, গীত ও বাদ্য

এই লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা ও পূজাদির বিবরণ পাঠ করিলে শ্রীহর্ষদেবের বৌদ্ধ-উৎসব মনে পড়ে। বুদ্ধমূর্ত্তি স্কন্ধে লইয়া স্নান করান, উৎসবপথে আনয়ন ইত্যাদির সহিত ইহার বিস্তর সাদৃশ্য দেখিতে পাই। আদ্যের গাজনে ও শ্রীধর্ম্মের গাজনে ঐ প্রকারের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। প্রধান আচার্য্যই শিবকুণ্ডস্থ অগ্নিতে হোম করিবেন। অপর অপর দ্বিজগণ চতুর্দ্দিকে প্রধান প্রধান দেবতার হোম করিবেন। লিঙ্গপূজার চারিজন ব্রাহ্মণকে হোম করিতে দেখি। আদ্যের গাজনে চারিজন প্রধান পণ্ডিতের বেদীর উপর অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার কথা আছে। উক্ত শিব-লিঙ্গ-পূজাকালে 'নৃত্যং গীতঞ্চ বাদ্যঞ্চ মাঙ্গল্যান্যপরাণিচ।"

—বায়বীয়সংহিতা।

অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাদ্যের কথাও দেখিতে পাই। ধর্ম্মের গাজনেও ঐরূপ হইয়া থাকে। পাঠক ধর্ম্মের দেহারা বা আদ্যের দেহারার কথা অবগত আছেন। পরমাত্মা শিবের শিবশাস্ত্রোক্ত-লক্ষণসমন্বিত ও রাজকীয় সৌধসদৃশ মন্দির নির্ম্মাণ ভূধরসদৃশ পুরদ্বার ও নানাবিধ রত্নখচিত সুবর্ণময় দ্বারকপাট, তদ্ব্যতীত যুগল রাজহংসাকৃতি সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ চামরদ্বয়, দিব্যগন্ধময় উত্তম মালায় বিভূষিত চতুর্দ্দিকে রত্নখচিত দর্পণ আবশ্যক। শ্রীধর্ম্মের গাজনেও শ্বেতচামর ও মাল্যাদি আবশ্যক হইয়া থাকে।

শিবপূজায় রাত্রিজাগরণ এবং গীতবাদ্য ও নৃত্যগীতাদির সবিস্তার বিবরণ দৃষ্ট হয়। যথা—

"গীতবাদ্যৈস্তথা নৃত্যৈর্ভক্তিভাবসমন্বিতঃ।

জ্ঞানসংহিতা

পূজনং প্রথমং যামে কৃত্বা মন্ত্রং জপেদ্বুধঃ॥"

—জ্ঞানসংহিতা।

নৃত্যগীতবাদ্যযোগে প্রথম প্রহর অতিবাহিত করিবে। সংকল্প করিয়া গীতবাদ্য নৃত্য এবং নানা প্রকার গান করিবে। প্রতি প্রহরেই এই রূপ করিবে।

"সঙকল্পঞ্চ তদা কৃত্বা গীতং বাদ্যং তথা পুনঃ।
নৃত্যঞ্চৈব তথা চাত্র গানঞ্চ বিবিধং তথা॥"

—জ্ঞানসংহিতা।

আরও অবগত হওয়া যায় যে অষ্টজন সিদ্ধ যাঁরা অগ্রে এই স্থানে নিরন্তর নৃত্য করিতেছেন নিজ ভক্তগণ 'জয় জয়' শব্দে তাঁহারই উপাসনা করেন। শ্রীধর্ম্মোৎসবেও সংঘাত সমেত 'ধর্ম্মজয় ধর্ম্মজয়' শব্দ করিবার কথা উল্লেখ আছে।

বিচক্ষণ মানব, সাত্ত্বিকভাবে নৃত্যগীত ও বাদ্যযোগে প্রহরে প্রহরে পূজা করিবে। নানাপ্রকার স্তবদ্বারা বৃষধ্বজের প্রীতিসাধন করিবে। ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি এই ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে। চারিপ্রহর রাত্রিতে চারিবার ঐ প্রকারে পূজা করিতে হয়।

গোদানের ব্যবস্থা

"জাগরণং তদা গত্বা মহোৎসবসমন্বিতম্।" —জ্ঞানসংহিতা।
শিবপূজায় গীত, বাদ্য এবং নৃত্য দ্বারা শিবোৎসব সমাধা হয়।

"গীতং বাদ্যং পুনশ্চৈব যাবৎ স্যাদরুণোদয়ঃ॥"*

সমুদায় রাত্রি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অতিবাহিত করিয়া সূর্য্যোদয় হইলে গুরুমন্ত্র জপ এবং গানাদি করিয়া স্নান ও শিবের পূজা করিবে।

"জপং মন্ত্রবরেণৈব গীতং নৃত্যং তথা পুনঃ॥"—জ্ঞানসংহিতা।

গোদানাদি দানেরও ব্যবস্থা আছে যথা—

"ধেনুং সদক্ষিণাং দদ্যাৎ সুশীলাঞ্চ পয়স্বিনীম্।" +

শিবের শোভাযাত্রা ও সন্ন্যাসী বা ভক্তগমের বেত্র হস্তে নৃত্য গীতাদি

শিরে শ্রীধর্ম্মপাদুকা লইয়া নৃত্যগীতাদি ও বাদ্যোদ্যম সহকারে ধর্ম্মসন্ন্যাসিগণ বেত্রহস্তে উৎসবপথে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করেন। শিব-শাস্ত্রোক্ত উৎসবেও তদনুরূপ অনুষ্ঠান দেখিতে পাই। "রত্নপদ্মোপশোভিত" বিপুল তৈজস পাত্রে দিব্য খণ্ডপত অস্ত্র আবাহন করিয়া পূজা করিবে। পরে অলঙ্কৃত যষ্ঠিধারী দ্বিজের মস্তকে সেই পাত্র স্থাপন করিয়া বাহিরে গিয়া নৃত্যগীতাদি বহুবিধ মঙ্গলকার্য্য করিতে করিতে দীপ-ধ্বজাদি লইয়া দ্রুতও নহে অথচ ধীরেও নহে, এইরূপে মহাপীঠ বেষ্টন করিয়া প্রসাদ করিবার উদ্দেশ্যে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। অদ্যাপি গাজনে সন্ন্যাসীরা বিবিধ অলঙ্কারে শোভিত হইয়া বেত্রহস্তে নৃত্য করিতে করিতে তাম্রপাত্র মস্তকে বহন করিয়া থাকে।

শ্রীধর্ম্মোৎসবে 'গামার কাটা' অনুষ্ঠান আছে। তাহাতে গাম্ভারা বৃক্ষের পূজা করিতে হইত। সংযাতের সমুদায় সন্ন্যাসী উক্ত বৃক্ষ ধারণ করিয়া বরণাদি করিত। শিব-পুরাণোক্ত বায়বীয় সংহিতায় দেখিতে পাই—

বায়বীসংহিতা দ্বারযাগ

"দ্বারযাগঞ্চ বণিকাং পরিবারবলিক্রিয়াম্।
নিত্যোৎসবঞ্চ কুর্ব্বীত প্রাসাদে যদি পূজয়েৎ॥"

যদি প্রাসাদে পূজা করা হয়, তাহা হইলে রম্য কোমল তরু-সমূহ সমীপে গমন করিয়া দ্বারযোগ ও পরিবারবলিক্রিয়া করিবে এবং নিয়ত উৎসব করিবে। এবং—

"নির্গম্য সহবাদিত্রৈস্তদাশাভিমুখঃ স্থিতঃ।
পুষ্পং ধূপঞ্চ দীপঞ্চ দদ্যাদন্নং জলৈঃ সহ॥"*

---

* ধর্ম্মোৎসবে দিবসে পূজা শিব-উৎসবে রাত্রে পূজা হয়।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে ধর্ম্মপূজায় ধেনুদানের ব্যবস্থা আছে। শূন্যপুরাণে—
"অন্নদান বস্ত্রদান কর ধেনুদান॥"১১৪ বৈতরণী।

* শূন্যপুরাণ—পরিষৎ পত্রিকা ৭৯ পৃষ্ঠা "গাম্ভারী মঙ্গল"।

"গামারি মঙ্গলে, চলিল ভকতগণে,
সুনিআ ধাএ সর্ব্বজনা।
আনন্দে কুতূহলে, নিত্তগীত ভালে,
পতাকা চলে সারি সারি।"
* * *
"বোসিল তরুতলে, পবিত্র কুস কুলে,
পূজা কবিলা ময়না।

নানাবিধ বাদ্যের সহিত সেই তরুসমূহের দিকে গমন করিয়া জল পুষ্প ধুপ দীপ অন্ন এই সকল নিবেদন করিবে।*

ত্রিশুল, ব্রজ, পরশু, সায়ক, খড়গ, পাশ, অঙ্কুশ ও পিণাকের পূজা

শিবপূজায় কমলদলদ্বারা পূজা বিশেষ আদরণীয়। শিবপূজায় ঈশান কোণে শ্রীমান ত্রিশূলের, পূর্ব্বাদিকে বজ্রের, অগ্নিকোণে, পরশুর, দক্ষিণে সায়কের নৈর্ঋতে খড়েগর, পশ্চিমে পাশের, বায়ুকোণে অঙ্কুশের ও উত্তর দিকে পিণাকের পূজা করিবে। এই প্রকার পূজার ব্যবস্থা অদ্যাপি শ্রীধর্ম্মপূজায় দৃষ্ট হয়। গম্ভীরা পূজায় ত্রিশুল ও সায়কের পূজা হইয়া থাকে।* প্রতি মাসে শিব পূজার ও উৎসবের ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক মাসিক পূজার ফল-শ্রুতি লিখিত আছে। যথা–

ভপুরাণে অস্ত্র মাসিক পূজার ফল শ্রুতি

"যঃ ক্ষিপেদেকভক্তেন চৈত্রমাসং নরোত্তমঃ।
ধনধান্যসমৃদ্ধে চ কুলে জায়তি রূপবান। ৫।
বৈশাখং যঃ ক্ষিপোস্মাসমেকভক্তেন মানব ঃ।
জাতিসংশ্রেষ্ঠতাং প্রাপ্য পূজিতা ধনবানপি॥"৬।

–সনৎকুমারসংহিতা।

চৈত্র ও বৈশাখ মাসে শিবপূজা উৎসাবাদির ফল-শ্রুতি

চৈত্র ও বৈশাখ মাসে উপবাস করিয়া শিবারাধনা করিলে ধনধান্য ও জাতিশ্রেষ্ঠতা লাভ হয়, এ আশা শিবভক্তের পক্ষে অতি আশাপ্রদ। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে শিবারাধনার ইহাই বিশিষ্ট কারণ। উত্তর-ফাল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত ফাল্গুন মাসে মহোৎসব করিবে এবং চৈত্র মাসে দোল করিবে– "চৈত্রে চিত্রাপৌর্ণমাস্যাং দোলাং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি॥"

–বায়বীয়।

(এবং) "বৈশাখেহপিচ বৈশাখ্যাং কুর্য্যাৎ পুষ্পমহালয়ম্।"

–বায়বীয়।

পণ্ডিত বাস্তন, বেদ নিনাদন,
জালিয়া ধুপ দীপ ধুনা।
কুম্ কুম্ চন্দন, করিআ রোপন,
সুগন্ধি আর পুষ্প-মালা।"

* শ্রী ধর্ম্মমঙ্গলে দেখি–

স্নান পূজা বাদ্য নাটে, দশমে গামার কাটে,
নদীতটে জয় জয় দিয়া।
পণ্ডিত পদ্ধি আছে, জাগাল গামার গাছে,
গণেশাদি পূজিয়া দেবতা।
বৃক্ষের বরন করি, সংযাত সহিত ধরি,
বান্ধিল সবার করি সূতা॥"–ঘনরাম

শূন্যপুরাণে ধর্ম্মসাজন–"পঞ্চদেবতার পূজা, ধর্ম্মপূজা, অস্ত্রপূজা, রথসাজন পরে অর্থ দান"– একখানি আধুনিক পুঁথির অধিক পাঠ। –শূন্যপরাণ পাদটীকা ৯১ পৃঃ :

বৈশাখ পুষ্পদোল এবং পুষ্পময় মন্দির করিবার ব্যবস্থাও আছে। চৈত্রমাসে বসন্তোৎসব বা মদনোৎসবের কথা প্রাচীন নাটকাদিতে ভূরি ভুরি দৃষ্ট হয়। এই উৎসবে রঙ্গিন বারি লইয়া উৎসবামোদের বিবরণ "মালতীমাধবে" দেখিতে পাই। বৈশাখে মহাদেবের পুষ্পময় মন্দির নির্ম্মাণের কথা লিখিত আছে। ইহা পুষ্পরথের অনরূপমাত্র। শ্রীহর্ষদেবের সময়ে হিউ-এনথ্-সঙ্গ লিখিত এই প্রকার বুদ্ধদেবের রথোৎ সবের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে বুদ্ধমূর্ত্তি ও বোধিসত্ত্ব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইত এবং পুষ্পময় মন্দিরে শিব ও নন্দীর অবস্থানের বিষয় দেখিতে পাই। উভয় স্থলেই ভক্তগণের নৃত্যগীতাদি উৎসবামোদের বিবরণ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চৈত্রমাসে শিবের বার্ষিকী যাত্রা

কাশীখণ্ড পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, "যে নারী বা নর চৈত্র মাসের শুক্লতৃতীয়ায় উপবাসী থাকিয়া নিশীথ কালে বস্ত্রালঙ্কারাদি বিবিধ উপচারদ্বারা মঙ্গল গৌরীর পুজা করে, পরে ঐ রাত্রি গীতবাদ্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক জাগরিত থাকে, তাহারা আশাতীত সুখসম্ভার লাভ করিবে। আরও লিখিত আছে যে, কাশীস্থ ব্যক্তিমাত্রেরই চৈত্র মাসের শুক্লতৃতীয়ায় শিবের বার্ষিকী যাত্রা করা উচিত। চৈত্রমাসের পূর্ণিমাতে কৃত্তিবাসেশ্বরের মহোৎসব করিবে। একদা চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে কৃত্তিবাসোৎসব হইতেছিল, ঐ উৎসবে দেবগণ নানাবিধ উপচারের সহিত রাশীকৃত অন্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষদেবের বিরাট অন্নদানোৎব এবং দ্বিতীয় শিলাদিত্যের বুদ্ধোৎসব এই চৈত্রোৎসবের সম্পূর্ণ অনুরূপ। আধুনিক মালদহের গম্ভীরাও এসই চৈত্রোৎসবের ক্ষীণস্মৃতি প্রকাশ করিতেছে।

শিবপূজা প্রচলনার্থ বিবিধ পুস্তক রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল এবং এই সংহিতাগুলি যে খুব পুরাতন তাহা মনে হয় না। যাহাই হউক সেনবাজগণের সময় উপরি উক্ত প্রকারে শিবের চৈত্রোৎসবাদি বিবিধ অনুষ্ঠানের আরম্ভ হইয়াছিল। বানফোড়া, শালেভর, চড়ক প্রভৃতি কৃচ্ছ সাধ্য অনুষ্ঠানের বিকাশ শিবোৎসবে দেখিতে পাওয়া যায়।

বাণফোড়ার শাস্ত্রীয় প্রমাণ : বাণোপাখ্যান অবলম্বনে শিবপূজাপদ্ধতি ও গম্ভীরার মূলোৎপত্তি অবগত হওয়া যায়। বাণ একজন পরম শিব ভক্ত। বাণোপাখ্যানই বর্ত্তমান শিবের গাজনের মূল বলিতে পারা যায়।

হরিবংশ বাণোপাখ্যান

কৌশলে শৈবপ্রভাব খর্ব্ব করাই হরিবংশের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণপূজার উদ্দেশ্য বলবৎ করিবার প্রয়াস বর্ত্তমান। শৈব ও বৈষ্ণব উভয় হস্তের ফলিত বর্ণবিন্যাসে উক্ত গ্রন্থ চিত্রিত হইয়াছে। শোণিতপুরাধিপতি শিবভক্ত মহারাজ বাণের ভীষণ পরাজয়ের কথা উহাতে বর্ণিত। এই উপাখ্যানাংশই শিবের গাজন বা গম্ভীরা উৎসবের শেষ পৌরাণিক কারণ বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। এই বর্ণনায় শৈবগণকে বৈষ্ণবগণ ইহাতে নিকৃষ্ট এবং শৈবগণের হীনতা প্রতিপাদনর চেষ্টা বর্ত্তমান। শৈব ও বৈষ্ণবে ঘোর বিদ্বেষ ও সমরাভিনয়ের কথা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ভুরি ভুরি বিবৃত রহিয়াছে।

যাহাই হউক নিম্নে হরিবংশ এবং শিব পুরাণ উভয় গ্রন্থ হইতেই বান-পরাজয় উপাখ্যান উদ্ধৃত করিলাম–

উষা-অনিরুদ্ধ-জৈষ্ঠ অমানিশায় বাণযুদ্ধ- শিব-কৃষ্ণ

"পরমশৈব বাণকন্যা উষার সহিত দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের গুপ্ত প্রণয় সংঘটিত হয়; মহামতি বাণ কুপিত হইয়া অনিরুদ্ধকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করেন। ভিন্নাঞ্জনসন্নিভা কালী অনিরুদ্ধের স্তবে তুষ্ট হইয়া জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর দিবস নিশীথ সময়ে তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। জ্যৈষ্ঠ অমানিশায় দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাণরাজের ঘোর যুদ্ধ হয়। সেই মহাযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্রদ্বারা বাণরাজের বাহু সমুদায় ছেদন করিয়া যেমন তাঁহার শিরশ্ছেদনের জন্য প্রস্তুত হইলেন, অমনি শঙ্কর বলিয়া উঠিলেন, – 'আমার বাণের শিরশ্ছেদ করিও না।'

'মা বাণস্য শিরশ্ছিন্ধি সংহরস্ব সুদর্শনম্।' ৭।

–ধর্ম্ম সংহিতা

নন্দী ও বাণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে বলিলেন, 'আপনার বাণ জীবিত থাকুক, এই আমি চক্র প্রতিসংহার করিলাম।'

নন্দী বাণকে শুভঙ্কর বাক্যে কহিলেন, 'বাণ! তুমি এই ক্ষতার্ত্ত শরীরেই দেবদেব মহাদেবের সন্নিধানে উপস্থিত হও'। বাণ নন্দীর বাক্যে সত্ত্বরগমনে সমুদ্যত হইলে, প্রতাপশালী নন্দী তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া রথে আরোহণ করাইয়া মহাদেবের সন্ধিধানে উপস্থিত করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, 'বাণ! তুমি মহাদেব সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নৃত্য করিতে থাকিবে তাহা হইলে তোমার কল্যাণলাভের সম্ভাবনা আছে'। জীবনপ্রার্থী ভয় বিহ্বলচিত্ত বাণ নন্দীবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে ভয়োদ্বিগ্ন মনে মহাদেবের সম্মুখে গিয়া পুনঃপুনঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন।"

খিল হরিবংশে এই প্রকার বর্ণনা আছে, কিন্তু শিবপুরাণের ধর্ম্মসংহিতায় নৃত্যের ভাবান্তর বর্ণনা আছে–

সকাশে রক্তাপ্লুত দেহ বাণের নৃত্য

"বাণরাজ তৎকালে পাদদ্বয় ও একশীর্ষমাত্র হইলেও নন্দীর আদেশানুসারে ভগবানের সম্মুখে অদ্ভুত নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রমুখ, বিবিধাকার, শালী স্থানপঞ্চকও প্রদর্শিত হইল; নিনাদে দিগন্ত পূরিত হইয়া উঠিল, ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মস্তক ভ্রূক্ষেপ সহকারে ভয়ানকরূপে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল; নানাবিধ গতি প্রদর্শিত হইয়া দর্শক বিস্ময়সাগরে মগ্ন করিতে লাগিল। ভূতলও শোণিতসক্তি হইয়া প্রাপ্ত হইল।"*

মানিকগাঙ্গুলির শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে দেখিতে পাই :–

"নয় কর নবখণ্ড নাই কালব্যাজ।

বানের বিবিধ প্রকার নৃত্য

"শিরঃকম্পসহস্রাণি প্রত্যনীকান্ সহস্রশঃ।
চারীশ্চ বিবিধাকারা দর্শয়িত্বা শনৈঃশনৈঃ॥"
–ধর্ম্মসংহিতা

গম্ভীরার নৃত্য ইহার অনুকরণ

বাণ এই প্রকার নৃত্য করিয়াছিলেন। গম্ভীরামণ্ডপে কার চামুণ্ডা, নারসিংহী প্রভৃতি নৃত্যও উক্ত প্রকার সম্পাদিত হয় এবং অঙ্গভঙ্গী অতিশয় প্রাচীন ভাবসমন্বিত বলিয়াই বোধ হয়। আধুনিক নৃত্য ও প্রাচীন নৃত্যবিশেষ সামান্য বিভিন্নতা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শিবের দয়া, বানের বর প্রার্থনা

ভক্তবৎসল মহাদেব বাণরাজাকে তাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও হতচৈতন্য প্রায় অবস্থায় বারংবার নৃত্য করিতে দেখিয়া কারুণার বশীভূত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি বাণকে বলিলেন, "বৎস বাণ! তোমার দুরবস্থা দর্শনে আমারও হৃদয়ে শোক-সঞ্চার হইতেছে। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে অভিলাষিত বর প্রার্থনা কর।'

বাণ কহিলেন, 'প্রভো! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন আমি যেন চিরদিন অজর ও অমর হইয়া থাকিতে পারি এই আমার প্রার্থনা।'*

প্রসন্ন হবেন তবে প্রভু ধর্ম্মরাজ॥
*   *   *
নবখণ্ড কার নাম না জানি কেমন॥
কৃপা করে কহ মাসী কিবা তার বিধ॥
*   *   *
করমূল, কপাল, কবচ, কর, কক্ষ।
পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, ওষ্ঠ, আর পয়োধর, বক্ষ॥
দক্ষিণ ইংশানে আমি জেনে দিব দন্ড।
কাটিয়া ইহার মাংস কর নব খন্ড॥"
"সকল শরীরে বয় শোনিতের ধাবা।
অঙ্গে মাংস মাত্র নাই অস্থি হল সারা॥"
"কাতি ধরে কিসরে কাটিল দুই স্তন।"
"কাতি ধরে লাউসেন কাটিলেন মাথা॥"
"তিকাঠা করিয়া মুণ্ডু রাখেন তখনে॥"
"প্রদীপ দিলেন জ্বেলে পঞ্চ পক্ষ করি।"
"শঙ্খ ঘণ্টা ঢাক ঢোল বাজে অনিবার।
জয় জয় ধর্ম্ম জয় বাজে করতাল।"
"বাণঃ সদাশিবো দেবো বাণান্তরোঽপিচ।
তেন যস্মাৎ কৃতং তস্মাদ্বাণলিঙ্গ মুদাহৃতম॥"
–বীরমিত্রোদয়।

মহাদেবের বরদান

মহাদেব কহিলেন, "বৎস! তুমি দেবগণের তুল্যকক্ষ হইয়া চিরদিন জীবিত থাকিবে, তোমার মৃত্যু নাই। তুমি আমার নিতান্ত অনুগ্রহভাজন। এতদ্ভিন্ন অন্য যে কোন বর অভিলাষ, প্রার্থনা কর।' বাণ কহিলেন, 'দেব! আমি যেমন বাণ-পীড়িত ও দুঃখার্ত্ত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে আপনার সম্মুখে নৃত্য করিলাম, যদি আপনার কোন ভক্ত এইরূপ নৃত্য করে, তবে সে যেন আপনার পুত্রত্ব লাভ করিতে পারে।'

মহাদেব কহিলেন, 'বৎস! সত্যপরায়ণ ও সরলতাসম্পন্ন আমার ভক্ত নিরাহার থাকিয়া এইরূপ নৃত্য করিবে, তাহার এই রূপ ফললাভ হইবে। এক্ষণে তোমার মনোমত তৃতীয় বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তাহাও দিব।'

বাণ কহিলেন, "হে ভব! চক্রাস্ত্র প্রহারে আমার দেহে যে অতি তীব্র যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, ইহা আপনার তৃতীয় বরে শান্তিলাভ করুক।'

তৎপরে মহাদেব চতুর্থ বর দিতে চাহিলেন। বাণ কহিল, 'হে বিভো! তবে আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন, আমি যেন আপনার প্রমথগণের প্রধান হইয়া চিরকাল মহাকাল নামে খ্যাতি লাভ করিতে পারি।' মহাদেব তাহাও প্রদান করিলেন।

গম্ভীর বা গাজনে ভক্তগণের বাণফোড়া ও নৃত্য বাণোপাখ্যাণ হইতে গৃহীত

চৈত্র পর্ব্ব বা চড়ক পূজাদি শৈব উৎসবে যে 'বাণফোড়া' ইত্যাদি ক্লেশকর ব্যাপার ও উপবাস নৃত্যগীতাদির মহোৎসব দেখি তাহার মূলসূত্র এই স্থলে বিবৃত রহিয়াছে। অধিকন্তু শাস্ত্রকার মহাদেবমুখে বলাইয়া লইয়াছেন যে, সত্যপরায়ণ ও সরলতাসম্পন্ন আমার যে ভক্ত নিরাহার থাকিয়া ঐরূপ নৃত্য করিবে, তাহার এইরূপ ফল লাভ হইবে। পুত্রলাভ এবং শিবের প্রমথ হইয়া শিবসকাশে অবস্থান অতিশয় প্ররোচনাপূর্ণ। সাধারণ শিব ভক্তগণ কখনই এই সুযোগ ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি সংবরণ করিতে সমর্থ হইবে না। এই কারণে চৈত্রোৎসবে ভক্তেরা বাণবিদ্ধ শোণিতাপ্লুত কলেবরে শিবসকাশে তাণ্ডব পৈশাচিক নৃত্য করিতে থাকে। উপবাস ও নৃত্য-গীত-বাদ্য শিব-সন্তোষবিধানমানসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বিশ্বাসে অদ্যাপি আদ্যের গম্ভীরামণ্ডপে বালকবালিকাগণকেও নৃত্য করিতে দেখি। ইহাতে পরমায়ু, ধন, মান ও জীবনান্তে অমরত্ব লাভ হইবে বলিয়া এদেশবাসীর একান্ত বিশ্বাস।

সং-সাজার শাস্ত্রীয় প্রমাণ

শিবসকাশে কি কারণে কালী, দুর্গা, চামুণ্ডা, ভূত প্রেতাদির মূর্ত্তির অনুরূপ আকারে সজ্জিত হইয়া ভক্তগণ নৃত্য গীতাদি করিয়া থাকে এই পরিচ্ছেদে তাহার সবিশেষ আলোচনা করা হইল। রাঢ়ীয় শিবের গাজনে, শান্তিপুরে শিবের বিবাহে, কালীঘাটে নীলপূজার দিবস প্রাতে এবং মালদহাদি দেশে গম্ভীরা ও শিবোৎসবে যে সংসাজা হয় তাহারও কারণ আছে, নিরর্থক ইহা পূজা অঙ্গবিশেষ হইয়া যায় নাই।

শিব সকাশে ভক্তগণের বিবিধ শক্তি ধারণ পূর্ব্বক নৃত্য অশাস্ত্রীয় নহে

সম্ভবত লক্ষ্মণসেন দেবের সময় রাজানুকরণে বৌদ্ধ-উৎসব ও নৃত্যগীতাদির সহিত পৃথক্ ভাব দেখাইবার জন্য 'গম্ভীর' সন্নিকটে পঙ্কজ মণ্ডিত গম্ভীর মধ্যে চামুণ্ডা, কালী, বাসুলী, মশানকালী, প্রমথগণাদির শিবানন্দপ্রদ তাণ্ডব নৃত্যাদির সমাবেশ হয়, ইহা তৎকালীন তান্ত্রিক শৈব-ধর্ম্মের পূর্ণপ্রভাব দৃষ্টে অনুমান করিতে পারি।

এই প্রকার নৃত্যগীতাদি পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার নিদর্শন শিবসংহিতান্তর্গত ধর্ম্ম সংহিতা মধ্যে দৃষ্ট হয়। অধুনা আমরা গম্ভীরা মধ্যে গৌরী, কালী, চামুণ্ডা, চণ্ডী, বাসুলী প্রভৃতি শিবশক্তির রূপধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে দেখি, ইহা অপৌরাণিক নহে, সম্পূর্ণ পুরাণসম্মত।

শিবঠাকুর নৃত্যপ্রিয় ও কৌতুকপ্রিয়, সুতরাং তদ্ভক্তগণ নৃত্য কৌতুকাদিদ্বারা তাঁহার সন্তোষলাভের চেষ্টা করিবেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ।

ধর্ম্মসংহিতায় বর্ণনা, হিমালয়ে অপ্সরাগণের শক্তিরূপ ধারণ

ধর্ম্মসংহিতায় আছে,–একদা চন্দ্রশেখর ক্রীড়া করিতে করিতে হৃষ্টান্তঃকরণে নন্দীকে আদেশ করিলেন, "হেবানরানন! তুমি আমার আদেশানুসারে কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিয়া কৃতমণ্ডনা গৌরীকে আমার নিকট শীঘ্র আনয়ন কর।" নন্দী প্রস্থান করিলে, অপ্সরাগণ আদরের সহিত পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন–'দাক্ষায়ণী ব্যতিরেকে কোন্ স্ত্রী ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে?"কুষ্মাণ্ড-দুহিতা চিত্রলেখা অপ্সরাগণের এইরূপ বাক্যশ্রবণে উত্থিত হইলেন ও "আমি গৌরীর রূপ ধারণ করিয়া ভগবানকে স্পর্শ করিতে পারি, যদি তোমাদের মধ্যে কেহ নন্দিকেশ্বরের রূপ ধারণ করিতে পার। দেবীর সখীগণের দেবী রূপ ধারণ করা কঠিন নহে।" উর্ব্বশী বৈষ্ণব যোগ অবলম্বন করিয়া নন্দিকেশ্বরের রূপ ধারণ করিলেন।

উর্ব্বশীর বৈষ্ণবযোগাবলম্বনে নন্দিকেশ্বরের রূপ ধারণ, প্রাম্লোচীর সাবিত্রীরূপ ধারণ, চিত্রলেখার পর্ব্বতী রূপ ধারণ

অনন্তর অন্যান্য অপ্সরাগণ উর্ব্বশীর রূপ পরিবর্তন সন্দর্শন করিয়া স্ব স্ব রূপ পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রাম্লোচা সাবিত্রীরূপ ধারণ করিলেন, মেনকা গায়ত্রী, সহজন্যা জয়ারূপ, কুঞ্জিকস্থলী বিজয়ারূপ এবং ক্রতুস্থলী বিনায়ক রূপ ধারণ করিলেন। তাহাদের এই কৃত্রিম রূপধারণ করিলেন। তাঁহার পার্ব্বতীরূপ ধারণ অতি মনোহর ও আশ্চর্য্যই হইয়াছিল। স্বর্গীয় নূপুরমণির রণৎকারে দিগন্তরাল সকল পূর্ণ হইল।

ছন্দবেশী নন্দিকেশ্বরের শিবসম্ভাষণ

ছদ্মবেশিনী উর্ব্বশী শিবসকাশে গমন করিয়া বলিলেন, "হে দেবেশ! গৌরীও গণের সহিত মাতৃগণ ও আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি; আপনি কৃপাকটাক্ষপাতে আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন। শিব তৎকালে যাহা আচরণ করিলেন তাহা পাঠ করুন।

"এবমুক্তস্তয়া রুদ্রস্ত্যক্তাশয্যাত্তু হৃষ্টবৎ।
পুরস্তান্নির্যযৌ শৌর্য্যাঃ শনৈঃ সপ্ত পদানি তু॥"
–ধর্ম্মসংহিতা।

অনন্তর পিণাকধৃক্ পার্ব্বতীর হস্ত ধারণ করিলেন এবং শয়নাগারে প্রবেশপূর্ব্বক শয্যাতে সমারূঢ় হইয়া তাঁহার সহিত নানাবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তৎপরে–

ছদ্মবেশিনী পার্ব্বতী ও শিব

"রুদ্রং গায়ন্তি নৃত্যন্তি সর্ব্বাঃ কপটমাতরঃ।
কশ্চিদগায়ন্তি ন-ত্যন্তি রময়ন্তি হসন্তি চ॥"
–ধর্ম্মসংহিতা।

কপটরূপিনী মাতৃগণের শিবসকাশে নৃত্যগীতাদি

কপটরূপিণী মাতৃগণ রুদ্রদেবের চতুর্দ্দিকে গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নৃত্য ও সঙ্গীত দ্বারা তাঁহাদিগের উভয়ের অনুরাগ সংবর্দ্ধিত করিয়া হাস্যজ্যোৎস্না বিস্তার করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সহস্র মাতৃগণ অতি মধুর শব্দ এবং শিব ও রুদ্রের সহিত অত্যন্ত অদ্ভুত শব্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের এই ব্যবহারে বিন্দুমাত্রে দোষ ছিল না। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ–

"কেচিদ্গায়ন্তি নৃত্যন্তি হসন্তি চ রুদন্তি চ।"– –ধর্ম্মসংহিতা।

প্রকৃত গৌরীর আগমন

শিব একেবারে এই আচরণে বিমোহিত ও আনন্দিত হইলেন। এমন সময়ে নন্দিকেশ্বর মাতৃগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। অদ্ভুতবেশা গৌরী ও অনুচরবর্গ পরিবৃত হইয়া আকাশ হইতে ভর্ত্তার নিকট আগমন করিলেন। এই উভয় সম্প্রদায় যখন একত্র হইলেন, তৎকালে বিস্ময়ভাবের অবতারণা হইল।

"কিমিয়ং পার্ব্বতী দেবী কিমিয়মিত্যচিন্তয়ন।
তাং দৃষ্টা চকিতাঃ সর্ব্বে কিমিয়ং বা সুশোভনা॥"[১২]
–ধর্ম্মসংহিতা।

এক্ষণে প্রকৃত পার্ব্বতী কে তাহার নিদর্শন হইল না। কারণ তাঁহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ দৃষ্ট হয় নাই।

নারীগণের ক্রীড়িতরূপ ভর্ত্তৃ ব্যতিক্রম ভ্র-অভিনয়ে শিবের অনির্ব্বচনীয় প্রীতি লাভ

সকলেই দুই দুইটি, বড়ই আশ্চর্য্য। অন্তর মহাদেবের পার্শ্বস্থিত পার্ব্বতী দিব্য নারীগণের ক্রীড়িতরূপ ভর্ত্তৃব্যতিক্রম জানিতে পারিয়া তৎকালে হাস্য করিতে লাগিলেন। অপ্সরাগণও আনন্দে মত্ত হইয়া কিলকিলা রব করিতে লাগিল। ভূত পিশাচ যক্ষগণও আনন্দে মত্ত হইল। শিবেরও যথেষ্ট আনন্দের উদয় হইল। অপ্সরাগণের ক্রিয়াকলাপ

সেইরূপ তাঁহার প্রীতিকল্প হইয়াছিল। এই বিস্তীর্ণ ভ্রম-অভিনয়ে শিবের অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ হইয়াছিল।

এই পৌরাণিক শিবসন্তোষব্যাপার হইতে শিবপ্রীতি উৎপাদন মানসে (আদ্যের গম্ভীরাতে) গম্ভীরদেবের সেবকগণ নৃত্যকালে উক্ত প্রকার বেশান্তর অবলম্বনে নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে। সেনরাজগণের সময়ে এই প্রকার উৎসব আচরিত হওয়াই সম্ভব। এই প্রকার ভর্তৃব্যতিক্রম ক্রীড়াপ্রদর্শন অদ্যাপি গম্ভীরার অঙ্গস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্রমে তান্ত্রিকগণকর্তৃক দক্ষযজ্ঞে পিতৃগৃহে গমন অভিলাষী সতীর হরকে যে কয়েক প্রকার মূর্ত্তি প্রদর্শন বর্ণিত হইয়াছে এবং শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধে চণ্ডমুণ্ড বিনাশকালে যে ভয়ঙ্করী চামুণ্ডাদিরূপের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই সমুদায়ের প্রতিরূপ মূর্ত্তির নৃত্যদ্বারা গম্ভীরার শোভা যে বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

আদ্যের গম্ভীরা, জাতীয় শিক্ষাসমিতি, মালদহ, ১৯১২

গম্ভীরা-শিবোৎসব অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান

হরিদাস পালিত

ঋগ্বেদে গম্ভীরার সূত্রপাত, ঋগ্বেদের রুদ্র গম্ভীরায় বৈদ্যনাথ, বৈদিকভাব বিকৃতভাবে শূন্যপুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছিল

অতি প্রাচীনকালে, শিব বর্ত্তমান কালের ন্যায় মানব হৃদয়ে মূর্ত্তিমান রূপে দেখা দেন নাই। ঋগ্বেদে তিনি রুদ্র নামে, অগ্নিরূপে যজ্ঞে ও মহোৎসবে বর্ত্তমান ছিলেন। ঋগ্বেদে গৃৎসমদ ঋষি রুদ্রকে সর্ব্বালঙ্কার বিভূষিত বলিষ্ঠ যুবার ন্যায় রথে আরোহণ করাইয়া ভক্তগণের জন্য যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার কথা বলিয়াছেন। তিনি রুদ্র উপাসকগণের জন্য নিজ হস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার তুল্য আর কেহ বলবান, ছিলেন না। আর্য্যগণ রুদ্রের সুখকর, ভয়হারী ঔষধ পাইবার কামনা করিতেন। রুদ্রের পুত্র মরুদগণ, মরুদগণের মাতা 'মহতী' নামে উক্ত হইয়াছেন। সায়ন বলিয়াছেন রুদ্রের কন্যা ঊষা। যুবতী কন্যা ঊষার প্রতি রুদ্র রতিকামনা করিয়াছিলেন। তাহাতে ব্রহ্মার সৃষ্টি হইয়াছিল।

এই সমুদায় বৈদিক কাহিনী গম্ভীরা-পূজার বন্দনায় ও গম্ভীরার পদ্ধতি বিষয়ক পুস্তকের মধ্যে নিরঞ্জন কন্যা যুবতী আদ্যাচণ্ডিকা দেবীর সহিত রতি কামনা করার বিবরণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছিল। এই শিবের সহিত আদ্যাচণ্ডিকার বিবাহ হয়। এই শিব ও চণ্ডিকার উৎসবই গম্ভীরা উৎসব। ঐ প্রকার বৈদিক ভাবময় সৃষ্টি প্রকরণ বর্ণনা গম্ভীরায় উৎসবের অঙ্গ। বৈদিকভাব মহাযানগণ একটু বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মূলে তাহা ঠিক ছিল।

ঋগ্বেদে উৎসবকারে নৃত্য, গীত, বাদ্য, স্তব

ঋগ্বেদে আর্য্য ঋষিগণ যজ্ঞস্থানে যে প্রকার নৃত্যগীতাদি করিতেন তাহা বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি গাহিয়াছেন। যজ্ঞস্থলে দেবতাগণের আনন্দার্থে গান, বংশদণ্ড হস্তে নৃত্য, স্তব, বন্দনা ইত্যাদির অনুষ্ঠান দেখিয়া উহা যে বর্ত্তমান গম্ভীরা বা শিবোৎসবের প্রাচীন অনুষ্ঠান তাহা বুঝিতে পারি। বৈদিক যুগের 'পণি' নামক বনিকগণ শিব-শক্তি পূজা দেশে ও পরে দেশান্তরে সমুদ্র পার পর্য্যন্ত প্রচারিত করিয়াছিলেন।

বৈদিক সমাজ পরিবর্ত্তিত হইয়া পৌরাণিক সমাজে আসিলে সমাজ ও ধর্ম্মভাবের পরিবর্ত্তন

বৈদিক যুগের প্রথমার্দ্ধে যথেষ্ট বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই। কিন্তু এক প্রকার বীণা ও কর্করী নামক বাদ্যযন্ত্রাদিসহ নৃত্য গীতাদি উৎসব সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত। এই প্রকার উৎসবই যে গম্ভীরা উৎসবের নৃত্য গীতাদির অঙ্কুর তাহা নিঃসন্দেহ।

ক্রমে বৈদিক সমাজ পৌরাণিক সমাজের দিকে অগ্রসর হইল। তখন দেবতাগণের ও ধর্ম্মের বৈদিক আকার ও ভাব ঠিক রহিল না। মহোৎসব সমূহ প্রভূত আড়ম্বরপূর্ণ হইয়া

উঠিল, তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা বিলাসিতার ভাব প্রবেশ করিল। বৈদিক সমাজের যজ্ঞান্তে স্নান উৎসবের অনুষ্ঠান লইয়া একটা শোভাযাত্রা বাহির করিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই, ক্রমে সেই 'অবিভূথ' স্নান ব্যাপার লইয়া রাজারা যথেষ্ট শোভাযাত্রা ও উৎসবের আয়োজন করিলেন। পল্লীসমাজ ধীরে ধীরে এই প্রকার শোভাযাত্রা বিবিধ উৎসবের অঙ্গীভূত করিয়া থাকিবে। মহাভারত, চণ্ডী, হরিবংশ, রামায়ণ প্রভৃতি পৌরাণিক সাহিত্যে শিব-উৎসবের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই।

সাহিত্যে শিবপূজা ও উৎসবাদির বিবরণ ও বর্ত্তমান গম্ভীরার বিকাশ

শিবপুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা, সনৎকুমারসংহিতা, বায়বীয় সংহিতা ইত্যাদি বিবিধ পুরাণে শিব ও শিব শক্তির পূজা ও মহোৎসবাদি, নৃত্যগীতবাদ্যাদিসহ সম্পাদিত হইত। এই প্রকার বিবিধ নৃত্যগীত বাদ্য সহ শিব-দুর্গার মহোৎসবই গম্ভীরা। সুতরাং গম্ভীরার বীজ অতি প্রাচীন সাহিত্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচীন বৈদিক ও পৌরাণিক শোভাযাত্রা ও উৎসব বর্ত্তমান গাজন ও গম্ভীরাতে বিদ্যমান।

ফা-হিয়ানের সময়ে ত্রিমূর্ত্তিবিশিষ্ট বৌদ্ধের রথোৎসব * এবং রাত্রে সজ্জিত, আলোকমালায় বিভূষিত মণ্ডপে সমস্ত রাত্রি গীতবাদ্য, সঙ্গীতামোদ ও জনসংঘট্ট গম্ভীরার এক প্রাচীন অভিব্যক্তি।

হিওএনথ্-সঙ্গের সময়ে শ্রীহর্ষ ও কুমারের ইন্দ্র ব্রহ্মা সাজে সাজিয়ে বুদ্ধমূর্ত্তির পরিচর্য্যা ও গীতাদি দ্বারা মহান্ আনন্দোৎসবও গম্ভীরার ক্রমবিকাশ। গৌড়দেশে শশাঙ্কগুপ্তের হিন্দুধর্ম্মপ্রচার ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিদ্বেষে এদেশেব শৈব ও সূর্য্য প্রচার হইয়াছিল।

পালরাজত্বকালে সহস্রায়তন দেবালয়ে, শিব ও বুদ্ধমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা, গয়ায় চতুর্ম্মুখ শিব প্রতিষ্ঠা ও উৎসবানুষ্ঠান গম্ভীরার অনুকূল।

রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপূজা প্রচার ও উৎসব শৈবউৎসবের অনুকরণ না হইতে পারে কিন্তু অনুরূপ বটে।

সুধন্বা রাজার বৌদ্ধ বিদ্বেষে এবং কুমারিলের বৌদ্ধ পণ্ডিতের মস্তক উদুখলে কুট্টন করায় প্রকৃতিপুঞ্জ শৈবধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করিয়াছিল। ক্রমশঃ শঙ্কশিষ্যগণের অক্লান্ত চেষ্টায় গৌড়বঙ্গে শৈবধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল। বাণ-উপাখ্যান দেশের শৈবগণকে মুক্তির সুন্দর পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। গীতবাদ্য সহকারে শিবসকাশে শোণিতাপ্লুত দেহে নৃত্য প্রকৃতই শিবের গাজনের মূল।

গম্ভীরার বিবিধ অঙ্গের সহিত হিন্দু সমাজ বহুকাল হইতে পরিচিত

আদ্যের গম্ভীরা বা আদ্যের গাজন ব্যাপারের কোন ও অঙ্গই আধুনিক নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতে বিশেষ বিশেষ অঙ্গগুলি অপরিবর্তিত বা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত বা সাময়িক রুচি অনুসারে কোন কোন গম্ভীরাঙ্গ পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

* অদ্যাপি মালদহে "রথাই" "রথচ্চরত ব্রত" নামে বৈশাখ মাসে প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। "রথাই ব্রত কথায়" ফা-হিয়ানের রথযাত্রার অনুরূপ বর্ণনা দেখা যায়।

গম্ভীরার প্রধান অঙ্গ "হরগৌরীব" মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা। এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা না করিলে আদৌ গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে পারে না।

হরগৌরী

রামায়ণ মহাভারত রচনার অতি পূর্ব্ব হইতেই "হরগৌরী" পূজা ও প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইয়াছিল। রাজা রামচন্দ্র দূর্গোৎসব করিয়াছিলেন। ' প্রবাদ ইহারপূর্ব্বে উহা বসন্তোৎসব এবং চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত হইত। রাবণ শৈব ছিলেন, চণ্ডীর দেউলে চণ্ডী থাকিতেন। তথায় উৎসব হইত।

মহাভারত ও হরিবংশাদিতে রণচণ্ডী ও শিবোপাসনা প্রচলিত ছিল। কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান গোকুলে হইত; আজিও সেই কাত্যায়নী ব্রত মালদহে "সাঞ্জাপূজা" নামে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।* উহা "হরগৌরী" উজ্জয়িনীর মহাকালমূর্ত্তি-শোভিত শিবালয় অতি প্রাচীন, কবি কালিদাস তাহা দেখিয়াছিলেন। কবি কালিদাস বর্ণিত শিব-পার্ব্বতী বন্দনা হইতে তাৎকালিক শিব-শক্তির পরিচয় পাইয়া থাকি। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র হর-গৌরীর পাষাণময়ী প্রতিমা ভগ্ন ও অভগ্ন অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভবানীমূর্ত্তি, সুবৃহৎ বিবিধ লিঙ্গমূর্ত্তি, যথা পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গমূর্ত্তি কয়েকটি মালদহে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান মালদহের বনভুমি মধ্যে বহু শিবমূর্ত্তি ও দুর্গা, চণ্ডিকা, কালী, চামুণ্ডা, বাসুলী প্রভৃতির শিলাময়ী মূর্ত্তির অভাব নাই। সুতরাং প্রাচীন গৌড়-বরেন্দ্রবাসী জনগণ অতি পূর্ব্বকাল হইতেই শিব ও শিবশক্তির পূজাদি করিতেন।

দমদমার নিকট হইতে যে প্রস্তরস্তম্ভ দিনাজপুররাজ আপন উদ্যানে লইয়া গিয়াছেন তাহাতে যে শ্লোকউৎকীর্ণ আছে তাহাতে দৃষ্ট হয় যে ইহা গৌড়পতি শিবালয়ের স্তম্ভস্বরূপে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং যে স্থানে এই স্তম্ভটি প্রোথিত ছিল তাহা বহু শিবালয়ে সমাকীর্ণ ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

শোণিতপুর, করদা (করবী বা করদাহ) বানপুর প্রভৃতি স্থান প্রাচীনকালে শৈবগণের পূজনীয় হরগৌরীমূর্ত্তিশোভিত দেবালয়ে পূর্ণ ছিল, তাহা বর্ত্তমান ধ্বংস-স্তুপাকীর্ণ স্থানে পরিভ্রমণ কবিলেই অবগত হইতে পারি। গৌড় নগরের চণ্ডী, পাটলাদেবী, বাণদুর্গা প্রভৃতি হিন্দু রাজত্বকালের হরগৌরীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার নিদর্শন বহন করিতেছে।

শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, বায়বীয় সংহিতা, সনৎকুমার সংহিতা, ধর্ম্মসংহিতা, হরিবংশ নিতান্ত আধুনিক নহে। তাহাতে "হরগৌরী' প্রতিষ্ঠা, পূজা ও বিবিধ উৎসবাদির সুন্দর পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে; সুতরাং "হরগৌরী" অতি পূর্ব্বকাল হইতে হিন্দুসমাজে পরিচিত। শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার রচিত "শিবস্তোত্র" অতি প্রাচীন না হইলেও কালহিসাবে নিতান্ত আধুনিক নহে।

গম্ভীরামণ্ডপে হরগৌরী প্রতিষ্ঠার পর যত প্রকার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানই হিন্দুসমাজের নিকট বহুকাল হইতে পরিচিত রহিয়াছে।

' বাল্মীকি রামায়ণেব নহে— পৌরাণিক কথা।

* শ্রীমদ্‌ভাগবতে বস্ত্রহরণ ব্যাপাব কাত্যায়নী পূজাব শেষে অনুষ্ঠিত হয়।

নৃত্যগীত

প্রতিষ্ঠা ও পূজার নিয়মসমূহ ধর্ম্মসংহিতাদি শিবপুরাণে অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত রহিয়াছে। বৌদ্ধযুগেও বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, স্নান, পূজা, শোভাযাত্রা, রথ, নৃত্যগীত বাদ্যাদির ব্যাপার শিবপুরাণাদির অনুকূল। বুদ্ধদেবের সম্মুখে হিন্দু দেবদেবীর বেশে সজ্জিত মানবগণ দণ্ডায়মান থাকিয়া উৎসব করিতেন তাহা যেমন দেখিতে পাই, হরগৌরী পূজায়ও তদ্রূপ দেখা যায়। কাঙ্গাড়া উপত্যকার 'মহাদেবের নৃত্য' চিত্রে রাজারাজেশ্বরী মূর্ত্তির সম্মুখে মাহদেবের নৃত্য, সমগ্র দেবতাগণের দর্শক ও গীতবাদ্যকার রূপে অবস্থান, গম্ভীরোৎসবের একখানি উজ্জ্বল চিত্র। কেবল মালদহে নহে, গম্ভীরায় নৃত্য মহোৎসব এবং বহু দেবদেবীর ও জীবজন্তুর মুখোস্ পরিয়া আদ্যাদেবী গৌরীসকাশে নৃত্য-তিব্বৎ, কাঙ্গাড়া, নেপাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ভূখণ্ডে প্রচলিত দেখিতে পাইতেছি। তান্ত্রিক দেবদেবীগণের সম্মুখে লামাগণের মুখোস্ পরিয়া নৃত্য, মালদহের গম্ভীরার নৃত্যের অনুরূপ। আজিও গম্ভীরামণ্ডপে শিব সাজিয়ে শিবের মুখোস্ পরিয়া ভক্তগণ তাণ্ডব নৃত্য করিয়া থাকেন। কাঙ্গাড়ার চিত্রখানি দেখিয়া বোধ হয় চিত্রকার মালদহের গম্ভীরায় গৌরীসকাশে শিববেশী ভক্তের নৃত্য সন্নিকটে কার্ত্তিক, নন্দী, ভৃঙ্গী, কালী, উমা, মশান চামুণ্ডা, নার-পার্ব্বতী ও বহু ভূত-প্রেত-বেশে সজ্জিত ভক্তগণের নৃত্য-গীত-বাদ্যেরই প্রতিচ্ছায়া অঙ্কন করিয়া রাখিয়াছেন।

বাণ রাজার শোণিতাপ্লুত দেহে শিবসকাশে নৃত্য ও বরপ্রাপ্তি, হিমালয়শিখরে শিবের নিকট ধর্ম্মসংহিতায় বিবৃত অপ্সরাগণের ব্যতিক্রম অভিনয়, এই সকলের অনুরূপেই যেন গম্ভীরামণ্ডপে শিব-পার্ব্বতী-সকাশে ভক্তগণ নীরব নাটক অভিনয় করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে গম্ভীরামণ্ডপে গ্রাম্যসভা বসিয়া তথায় প্রত্যেক বিষয়ের বিচার হইত– পৃথিবীর উৎপত্তি, আদ্যার জন্ম, শিবের বিবাহ, এমন কি ধুনাচি, ঢাক, গাভী প্রভৃতির জন্মবিবরণ মূল সন্ন্যাসীকে প্রাচীন প্রথামত গীতাকারে উচ্চারণ করিতে হইত। বৌদ্ধযুগে বুদ্ধ-শিব-সূর্য-প্রতিষ্ঠিত উৎসব-মণ্ডপেও এই প্রকার সৃষ্টিরহস্যের বিচার হইত। শূন্য, পুরাণ, ধর্ম্মমঙ্গল, মানিকদত্তের চণ্ডী, মনসার গীত ও মুকুন্দভারতী-কৃত জগন্নাথবিজয়ে'র মধ্যে মুসলমান রাজত্বের সময়ের শিবাদি দেবতাগণের উৎসবের পরিচয় বৌদ্ধ উৎসবের সহিত মিশ্রিত হইয়া বর্ণিত হইয়াছে। মুসলমান আমলেও চড়ক, শিবের গাজন, চণ্ডীর দেউলে উৎসবব্যাপারে গম্ভীরার ন্যায় উৎসবামোদের অনুষ্ঠান হইত। সুতরাং সেই প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত গম্ভীরার প্রত্যেক অঙ্গ সুপরিচিত রহিয়াছে।

বিশেষত মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা ও তাহার পূজাকালে ভক্তগণের গীত, বাদ্য নৃত্য সেই যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত সমানভাবে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিতে পাই। নন্দী, ভৃঙ্গী, মহাকাল, ক্ষেত্রপাল* আদির পূজা অতি প্রাচনিকাল হইতেই দেখা যায়।

ক্ষেত্রপালের একখানি চিত্র Mayurbhanja Archaeological Survey তে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা মণিনাগেশ্বরে নির্ম্মিত ছায়াচিত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। "Images of Ksetrapala are almost invariably found at the entrance of ancient temples consecrated to Siva Lingas. There is a grim image of Bhairava, four feet in height on the left side of the entrance of the temple of Maninageeva. It is known

গম্ভীরায় ইহা আজিও অনুষ্ঠিত হইতেছে। শাস্ত্রাদিতে শিবপূজাপ্রসঙ্গ যে প্রকারে বিবৃত রহিয়াছে, তদ্দ্বারা গম্ভীরাতে বর্ত্তমান অনুষ্ঠানের বীজ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বাণোপাখ্যান বাণবিদ্ধ শোণিতাপ্লুত দেহে বাণের শিবসকাশে নৃত্য বর্ত্তমানকালে গম্ভীরায় 'বাণফোড়া' ইত্যাদি ব্যাপারে বিদ্যমান রহিয়াছে। শাস্ত্রে শিব পূজাব্যাপারে শোভাযাত্রার উল্লেখ দেখিতে পাই। বর্ত্তমানকালে গাজন বা গম্ভীরায় সন্ন্যাসী ও ভক্তগণের শোভাযাত্রা প্রাচীন শোভাযাত্রা আধুনিক অবস্থা বলিতে হইবে। পুরাণাদিতে সায়ক, খড়্গ, ত্রিশূল প্রভৃতির পূজার কথা আছে। গম্ভীরাতেও বাণ, খড়্গ ও ত্রিশূলের পূজা হইয়া থাকে।* ধর্ম্মসংহিতা-বর্ণিত শিবের ভর্ক্তৃব্যতিক্রম-উৎসব বর্ত্তমানকালে বিবিধ মুখোস্ পরিয়া শিব শক্তি-বেশে নৃত্যের বীজ বলিতে হইবে। উৎসবান্তে শেষ-স্নানও গাজনের প্রাচীন অঙ্গ।

by the people as Mahakala. On his head are many serpents entwined like braided hair. His eyes are like large balls and all his teeth are exposed."

শিবের গাজনে, গম্ভীরায় বর্ত্তমানকালে জিহ্বায় বাণফোড়া না হইলেও সেই বাণের পূজাদি হইয়া থাকে। ত্রিশূলের পূজা সর্ব্বত্র হয়। মালদহে প্রাচীন গম্ভীরা মণ্ডপে (মাধাইপুর, গিলাবাড়ি ইত্যাদি) ত্রিশূল, খড়্গ ইত্যাদির পূজা হইত, এখনও হয়।

ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিতে—গৃহভরণ অনুষ্ঠানে "কুণ্ডসেবা সেবন, হিন্দোলনং জিহ্বাভেদনং মানগ্রহ প্রভৃতি পঞ্চভেদন সন্ন্যাস ছাগলাদি বলিদান" ইত্যাদি ব্যবস্থা দেখা যায়।

আদ্যের গম্ভীরা জাতীয় শিক্ষা সমিতি, মালদহ, ১৯১২

গম্ভীরা প্রসঙ্গে

ডা. দেবপ্রসাদ সাটিয়ার

চৈত্র-বৈশাখ মাস এলেই মালদার প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জে জেলার নিজস্ব লোক-সংগীত 'গম্ভীরা'কে কেন্দ্র করে একটা সার্বজনীন উদ্দীপনা, উন্মাদনাব সাড়া জনমানসে উত্তাল হয়ে উঠতো। বিভিন্ন গায়কী দল তাদের পরিবেশিত গানের মাধুর্যে সমাজ জীবনের নানান সমস্যা, সংকীর্ণতা ও আদর্শহীনতাকে জন-সমক্ষে উন্মোচন করে প্রবল আলোড়ন তুলতো। জন শিক্ষার এমন আকর্ষণীয় লোক সংগীত ঘরে-বাইরে বিপুলভাবে সমাদৃত হতো। গম্ভীরা গানের রচনাশৈলী, পরিবেশনা ও বিভিন্ন শিল্পীর বাগ্মিতা ও অভিনয় নৈপুণ্য মানুষকে আনন্দ বিহ্বল করে রাখতো। কিন্তু কালের ব্যবধানে আধুনিক শহর-কেন্দ্রিক পাশ্চাত্য ভাবধারা ও দূরভাষের চটুল উপাদানের দৌলতে গম্ভীরা গানের অবক্ষয় শুরু হয়েছে এবং গম্ভীরা গানের মত এমন জনদরদী ও শিক্ষামূলক গণসঙ্গীত আজ অবলুপ্ত হতে চলেছে। শুধু গম্ভীরা গানই নয়, এর সঙ্গে অন্যান্য লোকগীতি যথা আলকাপ, কবিগান, তরজা গানেরও পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে। আমার তো মনে হয় আমরা আমাদের এই একান্ত নিজস্ব গ্রামীণ লোক-সংস্কৃতিকে ভুলে নিজেরাই দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছি। এ যেন আত্মহত্যারই এক বিকল্প প্রয়াস।

কিন্তু এই অবক্ষয় আমাদের রুখতেই হবে। গম্ভীরা গানের মতে এমন রস-ঘন গান, শিক্ষার-বাহক লোক-সংগীতকে আমাদের বাঁচাতেই হবে। এ কাজ একার পক্ষে সম্ভব নয়। সংগীতপ্রেমী ও সংস্কৃতিপ্রেমী সর্বস্তরের মানুষকে এতে আগ্রহী হতে হবে। ইদানীং বিদগ্ধ সমাজের অসহযোগিতা ও যোগ্য রচয়িতার অভাবে গম্ভীরা গানের গুণগত মান কমে যাওয়ায় হয়তো কিছুটা আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। এ ব্যতীত নোংরা রাজনীতির দলগত হস্তক্ষেপ ও অযোগ্য উত্তরাধিকার গম্ভীরা গানের ব্যাপক প্রসার ও প্রচারে এক বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি প্রতিকুলতা ও গোষ্ঠীবাদী নীতি গম্ভীরা গানের সুস্থ ও সাবলীল বিকাশে এক অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গম্ভীরা মালদাবাসীর একান্ত নিজস্ব গণঁ-সংগীত এবং একে বাঁচাতে হলে এক জন-জাগরণ দরকার। সর্বস্তরের বিদগ্ধ মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা গম্ভীরাকে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে: গম্ভীরা যদি কালের স্রোতে হারিয়ে যায় তা'হলে সংস্কৃতি প্রেমী মালদার মানুষের কাছে একটা গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায় শেষ হয়ে যাবে এবং আমরা এই গম্ভীরা গানের পূর্বসূরী ও ঐতিহ্যের কাছে এক ব্যর্থ নাগরিকের সাক্ষী হয়ে বেঁচে থাকবো।

গম্ভীরা স্মরণিকা, তৃতীয় জেলা-ভিত্তিক গম্ভীরাগানের প্রতিযোগিতা ও উৎসব, মালদহ, ১৯৯৭

গম্ভীরা : গানের রূপ-রীতি ও আবেদনসূত্র

ডক্টর প্রদ্যোত ঘোষ

গম্ভীরা গানের রূপের মধ্যে আছে শিব-বন্দনা, ডুয়েট (দ্বৈত), চারইয়ারী (চতুষ্টক), পালাবন্দি গান ও বাউল গান। বিশেষত এবং প্রধানত এই সব গানের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অবক্ষয়েরই ফলশ্রুতি। স্বাভাবিকভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও প্রধানত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের সমাজ-ভাবনার অনিবার্য প্রকাশে তার জন্ম এবং ধর্মীয় চৌহদ্দীকে অতিক্রম করানোর গৌরব দুই মুসলিম গায়ক-রচনাকারের। তাঁরা হলেন–মোহাম্মদ সুফী ও শেখ সোলেমান (সুফী মাস্টার ও সোলেমান ডাক্তার হিসেবে যাঁদের লোক-সাধারণ্যে পরিচিতি)।

একটি ছকের মাধ্যমে গম্ভীরা গানের আবেদনের অন্তিম-পর্বটি দর্শক-শ্রোতাদের নিকট কেমন ভাবে পৌছায় তা নিম্নে দেখানো যেতে পারে–

গানের মূল সুর + শিল্পী (artistc) বা পাত্র-পাত্রীর (Folk Dramatic Personac) রস-রসিকতাযুক্ত উদাহরণ (analogy) সহ তাৎক্ষণিক (Extempore) সৃষ্ট সংলাপ (ক্ষীণ-কাঠামো আগে সৃষ্ট)।

= মূলগান + সংলাপ+স্থানীয় শব্দভাণ্ডার+স্থানীয় লোকায়ত উদাহরণ+রস-রসিকতা

উপরিউক্ত ছকটি গাণিতিকসূত্রে ব্যাখ্যা করা যায় এমনভাবে–যদি ১ অংশকে $\frac{dA}{dx}$ ও খ, গ, ও ঘ কে B, C, D, ধরি তবে f' (x)

$$\frac{dA}{dx} = \frac{d}{dx}(B+C+D)$$

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(B) + \frac{d}{dx}(c) + \frac{d}{dx}(D)$$

আবার দেখা যায়, $A \propto B + C + D$

বিস্তারিত সূত্রের জন্য/ ড. প্রদ্যোত ঘোষ-লোকসংস্কৃতি ঃ গম্ভীরা, ১৯৮১
গম্ভীরা স্মরণিকা, তৃতীয় জেলা-ভিত্তিক গম্ভীরা গানের প্রতিযোগিতা ও উৎসব, মালদহ, ১৯৯৭

গম্ভীরা গানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

অধ্যাপক মুহম্মদ এলতাস উদ্দিন

গম্ভীরা গান সম্পর্কে খুব বেশি একটা লেখা চোখে পড়ে না। মাঝে মধ্যে দুই একটা লেখা চোখে পড়লেও তা সম্পূর্ণ নয়। তাছাড়া অনেকে আবার আলকাপ গানের সঙ্গে গম্ভীরা গানকে মিশিয়ে ফেলে গম্ভীরা গানের বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ন করেছেন। আলকাপ গানের পরিসর ব্যাপক। একটা আসর দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলতে পারে। কিন্তু গম্ভীরা গানের পরিধি তত ব্যাপক নয় এবং একে খুব বেশি হলে এক ঘণ্টা পর্যন্ত চালিয়ে নেওয়া যায়। যা হোক, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে গম্ভীরা গান সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশন করতে চাই। যতদূর জানা গেছে, মালদহের শেখ শফিউর রহমান ওরফে শফি মাস্টারই নাকি এই গম্ভীরা গানের প্রবর্তক (ভিন্নমত থাকতে পারে)। তিনি পোস্ট অফিসে পোস্ট মাস্টার হিসেবে কাজ করতেন এবং অবসর সময়ে গম্ভীরা গান লিখতেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের পরে তিনি চাঁপাই নবাবগঞ্জের রহনপুরে এসে বসবাস কবতে আরম্ভ করেন। ১৯৮০ সালে পরিণত বয়সে (৯০ বছর) এই গম্ভীরা গানের প্রবর্তক শফি মাস্টার ইন্তেকাল করেন।

কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শফি মাস্টার গম্ভীরা গান রচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন, এর পেছনে কিইবা অনুপ্রেরণা ছিল, তা জানতে হলে সে কালের রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে। ব্রিটিশ শাসনের যাঁতাকলে এ দেশের মানুষ যখন নিষ্পৃষ্ট, উৎপীড়িত, শোষিত তখন মুখ ফুটে কিছু বলার কারও সাধ্য ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের নীতির সমালোচনা করলে, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে নির্ঘাত জেল-জুলুম-হাজতবাস, কখনও কখনও বা ফাঁসিকাষ্ঠেও ঝুলতে হয়েছে এ দেশের বহু নিরীহ মানুষকে। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছে, বাঘা যতীন জেলে অনশন করে আত্মবিসর্জন দিয়ে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আমাদের বাঁচার পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। "মরিয়াও তোমরা শিখাইয়া গেলে বাঁচিবার কৌশল।" এদেশের বীর মানুষেরা কিন্তু পশ্চাদপদ হননি কোনও দিন। নতুন উপায়ে, নতুন পদ্ধতিতে তাঁরা এই ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। সমালোচনায় নতুন পথ খুঁজে বের করেছে এ দেশের মানুষ। শফি মাস্টার গম্ভীরা গানের মাধ্যমেই সেই ব্রিটিশ সরকারের শোষণ নীতিব সমালোচনা করবার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। এমনকি পাকিস্তান আমলেও তার কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। গানের ছলে রাস্তা-ঘাটের মানুষ, কামার-কুমার-জেলে-মজুর ও চাষী ভাইয়েরা যদি কিছু বেফাস কথা বলেই ফেলে তাতে কিইবা আসে যায় এবং এজন্যই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে এ দেশের শিক্ষিত সমাজই এই সর্ব সাধারণ মানুষের বেশে গম্ভীরা গানের মাধ্যমে সরকারের ঘোর সমালোচনা করে থাকেন।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে এতদঞ্চলে গম্ভীরা গানের প্রচলন কিভাবে ঘটলো। ১৯৪৭ সালের পূর্বে নবাবগঞ্জ মালদহ জেলার একটি থানা ছিল। ১৯৪৭ সালে

দেশ বিভাগের সময় মালদহ জেলার ১৫টি থানার মধ্যে ১০টি থানা নিয়ে মালদহ জেলা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অধীনে রয়ে গেল। বাকি ৫টি থানা রাজশাহী জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৎকালীন পূর্ব বাংলার অন্তর্ভুক্ত হলো। ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, নাচোল ও ভোলাহাট এই পাঁচটি থানা নিয়েই নবাবগঞ্জ মহকুমার সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য পোরশা থানাও নবাবগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্রিটিশ আমল থেকেই নবাবগঞ্জ থানা মালদহ জেলার অন্তর্ভুক্ত হলেও রাজশাহীর সঙ্গে নবাবগঞ্জের মানুষের ঘনিষ্ঠতা ও যোগসূত্র খুব বেশি ছিল। জেলার প্রধান শহর মালদহ হওয়াই একমাত্র মামলা-মকদ্দমা, কোর্ট-কাচারী ইত্যাদি সম্পর্কিত কাজেই নবাবগঞ্জের মানুষ নেহাৎ দায়ে ঠেকেই মালদহ যেতে বাধ্য হতো। যদিও শিবগঞ্জ থানার সঙ্গে মালদহের যাতায়াত ব্যবস্থা কিছু ভালো থাকায় সেখানকার মানুষের যোগাযোগ মালদহের সঙ্গে একটু বেশি ছিল। তাছাড়া ১৯০৩ সালে নবাবগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুনসেফ কোর্টও শিবগঞ্জে ছিল। যে কোনও ধর্মীয় উৎসব বা বিয়ে-শাদীর কেনাকাটার ব্যাপারে নবাবগঞ্জের লোকের প্রচুর সমাগম হতো রাজশাহীর বাজারে। তাছাড়া রাজশাহী কলেজের অবস্থানের কারণে শিক্ষিত সমাজের প্রায় প্রত্যেককেই আকৃষ্ট করতো এই রাজশাহী শহর। মালদহ শহর হিসেবে অত্যন্ত ছোট ছিল। এর কোনও মহকুমা ছিল না। সেখানে কোনও উল্লেখযোগ্য কলেজও ছিল না। উপরন্তু মালদহ, মুর্শিদাবাদ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও গোদাগাড়ির জনসাধারণের মধ্যে ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যাবলীর অদ্ভূত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। চাল-চলন, কথা-বার্তা, আচার-ব্যবহার ও কুসংস্কারের দিক থেকে তারা যেন অভিন্ন। এর প্রধান কারণ হলো, নবাব আলীবর্দী খাঁর আমলে মুর্শিদাবাদ তথা পশ্চিমবঙ্গ মারাঠা বর্গী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। ফলে রাজশাহী ও নবাবগঞ্জের বরেন্দ্র ভূমিকে নিরাপদ মনে করে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া প্রভৃতি স্থান থেকে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ পরিবার, কংস শিল্পী ও বহু মুসলমান সওদাগর গঙ্গা ও মহানন্দার সঙ্গমস্থল বর্তমান নবাবগঞ্জ ও গোদাগাড়ি ভূ-খণ্ডে বসতি স্থাপন করে। বর্গীদের অত্যাচার, লুণ্ঠন, অগ্নি-সংযোগ, জুলুম ও নারী নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে হাজার হাজার চাষিকূলও পদ্মা পার হয়ে রাজশাহী, গোদাগাড়ি ও নবাবগঞ্জ এলাকার স্থায়ী অধিবাসী হয়ে যায়। কাজেই এদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যাবলীর মিল থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

তবে ভাষার দিক থেকে শিবগঞ্জ ও নবাবগঞ্জের জনসাধারণের কথা-বার্তায় একটু উর্দুর টান আছে। উত্তর মালদহের লোকেরা ভাঙা উর্দুতে কথা বলে। কারণ, পাশে বিহার প্রদেশের অবস্থিতি তৎকালীন মালদহ জেলার বাসিন্দাদের ওপর ভাষা, খাওয়া-দাওয়া ও সংস্কৃতির দিক থেকে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। নবাবগঞ্জ এলাকায় 'ছাতু' খাওয়ার প্রচলন ও দড়ি দিয়ে বোনানো খাটিয়ার ব্যবহার সেখান থেকেই এসেছে বলে অনুমিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মুসলমান প্রধানত মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বিহার থেকে তৎকালীন পূর্ব-বাংলায় (পূর্ব পাকিস্তান) চলে আসে এবং রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও অন্যান্য এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে এবং তারপর থেকেই তারা এতদঞ্চলের মানুষের সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে বাস করছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৪৭ সালের পূর্বেও নবাবগঞ্জে গম্ভীরা গানের প্রচলন ছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে (মোতাবেক ১৩৫০ সাল) এতদঞ্চলে অনাবৃষ্টির জন্য আমন ধানের ফলন

অত্যন্ত কম হয়েছিল। ফলে খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাবে খাদ্য সমস্যা আরও প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এ দেশের মানুষ গান লিখে মাঠে-ঘাটে গান গেয়েছিল (যদিও গম্ভীরার ঢঙে নয়) :

খাদ্যের অভাবে খেয়ে অখাদ্য,
হজম করেরে আছে কার সাধ্য
আশি টাকা মণ চাল তাই খেতে বাধ্য
কালা বাজার চলে বড় জমকাল,
সাল, ১৩৫০ সাল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সময় বাংলার প্রতিটি জেলা মারাত্মক দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। ডাস্টবিন থেকে মানুষ ও কুকুরকে একই সঙ্গে উচ্ছিষ্ট খাদ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে দেখা গিয়েছিল। পল্লীর বহু অসহায় জনগণ বনজঙ্গলের কচু-শাক-পাতা ইত্যাদি অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে অকালে প্রাণ হারায়। বিভিন্ন স্থানে লঙ্গরখানা খুলে একবেলা খিচুড়ি খাওয়ানো হতো। মানুষের সৃষ্টি এই দুর্ভিক্ষে বাংলার লক্ষ লক্ষ (প্রায় এক তৃতীয়াংশ) মানুষ প্রাণ হারায়। এই দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা ১৯৪৪ সালে নবাবগঞ্জ হরিমোহন হাই স্কুলের (বর্তমানে সরকারি) সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন সময়ে আমি যে গম্ভীরা গানটি শুনেছিলাম তার প্রথম ক'টি লাইন নিম্নে দেয়া হলো। গানটি আমাদের স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষে জুড়ে দেয়া হয়েছিল। যতদূর মনে আছে গানের কথাগুলি লিখেছিলেন নবাবগঞ্জ হরিমোহন হাই স্কুলের তৎকালীন বাংলার শিক্ষক রাধা গোবিন্দ বাবু। আমরা ছাত্র থাকাকালীন সময়ই গোবিন্দ বাবু অল্প বয়সেই আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেন।

গানের কথাগুলি হলো :

মামু, বলবো কি আর দুঃখেরও কাহানী
দুনিয়ার গতি দেইখা শুইন্যা জ্ঞান করে খানাখানি
মামু বলব... দুঃখেরও কাহানী।
মামু, দেশে ফসল যা কিছু ছিল,
সব কুঠেতে লুকিয়ে গেল
রেঙ্গুনের চাল আসতো আগে, তাওতো এখন বন্ধ হলো
মামু দারুণ আকাল পইলো।
কত লোক যে মারা গেল, তার খবর কি জানি,
মামু, কত লোক যে ... কি জানি,
মামু বলবো কি আর দুঃখেরও কাহানী ... ইত্যাদি ইত্যাদি

তাছাড়া এ গানের মধ্যে ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার নানা সমস্যার কথা। কাপড়, চিনি, কেরোসিন কিছুই পাওয়া যেতো না তখন। কেরোসিন আনতে গিয়ে ৩ ঘণ্টা ধরে লাইন দিয়াও এক ফোটা কেরোসিন তেল জুটতো না। প্রচণ্ড ভীড়ের চাপে কেরোসিনের বোতল ভেঙে খান খান হয়ে যেতো। আরও কত অভাব-অনটন, সমস্যা ও সুখ-দুঃখের কথা ছিল সেই গানের মধ্যে।

গানের কথায় আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করার মতো ছিল, সেটা হলো তখন মামা-ভাগনে বানিয়ে গান গাওয়া হতো। পরে অবশ্য নানা নাতি সম্পর্ক এসে যায়। মামা-ভাগনে

সম্পর্ক করে গান গাওয়াতে প্রাথমিক কিছু অসুবিধাও দেখা দিলো। বড় বড় গণ্যমান্য লোকের সামনে গম্ভীরা গান গেয়ে নানারকম অভাব-অভিযোগ ও সুখ-দুঃখের কথা ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। গণ্যমান্য লোকদের ছোট নানা, বড় নানা ইত্যাদি বলে সম্বোধন করা যায়। কিন্তু যেখানে সেখানে যাকে তাকে তো আর মামা বলা যায় না।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও অর্থাৎ ১৯৪৮-৪৯ সালের দিকে রাজশাহী কলেজের এক অনুষ্ঠানে ডাঃ বাশার (তখন রাজশাহী কলেজের ছাত্র) ও তাঁর সহকর্মীরা গম্ভীরা গান পেশ করে কলেজের ও হোস্টেলের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। তখন গানের সুরও ছিল ভিন্ন। তবে গান গাওয়ার ঢঙ অনেকটা এখনকার মতোই ছিল।

এরপরেও নবাবগঞ্জ এলাকায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গম্ভীরা গান পরিবেশিত হয়েছে। গম্ভীরা গান ব্যতিরেকে স্কুল কলেজের কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই যেন জমতো না। এই গম্ভীরা গানগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রচনা করতেন হরিমোহন হাই স্কুলের শিক্ষক জনাব লুতফুল হক (লুথু মিয়া) এবং সুর দিতেন নাইমুল মাস্টার (১৯৭১'র যুদ্ধে তিনি শহীদ হন)। এককথায় বলা চলে গম্ভীরা গান নবাবগঞ্জের সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা আগাগোড়ায় পালন করে আসছে। এতদসত্ত্বেও গম্ভীরা গান কোনোদিনই একক অনুষ্ঠান হিসেবে প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি। এর প্রধান কারণ হলো, সে যুগের নবাবগঞ্জ-মুর্শিদাবাদ ও মালদহের বিখ্যাত আলকাপ গানের প্রভাব। আলকাপ গানের কথা শুনলে মানুষ মাইলের পর মাইল হেঁটে এসে গানের আসরে ভীড় জমাতো। সাধারণ মানুষের চিত্ত বিনোদনের নিমিত্তে আলকাপ গান নবাবগঞ্জ এলাকায় এক বিশিষ্ট অবদান রেখেছিল। এদিক থেকে বড় বড় যাত্রাপার্টিও প্রতিযোগিতায় আলকাপ গানের কাছে হার মেনে যেতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সাধারণ মানুষ যাত্রাগানকে উপেক্ষা করেও দৌড় দিয়ে আলকাপ গানের আসরে জায়গা নিয়েছে। আলকাপ গানের বিভিন্ন দলের মধ্যে হর-হামেশায় প্রতিযোগিতা লেগে থাকতো। মাঝে মাঝে মুর্শিদাবাদের লালগোলা থেকে প্রখ্যাত আলকাপ গানের দলগুলি এসে এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গান করতো। তাছাড়া আলকাপ গানের ঘটনা-প্রবাহ, সুরের বৈচিত্র্য, অভিনয়, তবলার বোল, অর্গান টাইপ হারমোনিয়ামের টিউন, ছোকরার (নারীর বেশে পুরুষ) আকর্ষণীয় অঙ্গভঙ্গি ও নাচ এবং প্রতিযোগিতার মনোভাব আলকাপ গানকে এতো বেশি আনন্দায়ক ও আকর্ষণীয় করে তুলতো যে, এই আলকাপ গানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গম্ভীরা গান কখনই কুলিয়ে উঠতে পারতো না। তাছাড়া গম্ভীরা গানের সুরের বৈচিত্রহীনতা, এক ঘেঁয়েমি, ঘটনার দৈন্য, সর্বদাই সমালোচনার মনোভাব এই গম্ভীরা গানকে একটা সীমিত গণ্ডির বাইরে নিয়ে যেতে পারেনি।

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই ধর্মীয় প্রভাবে আলকাপ গানের চর্চার মধ্যে আস্তে আস্তে একটু ভাটা পড়তে আরম্ভ করে। মুর্শিদাবাদের লালগোলা থেকে আলকাপ গানের কোনো দল সহজে এখানে আসতে পারতো না। ফলে গম্ভীরা গানের জনপ্রিয়তা কিছুটা বাড়তে থাকে। স্কুল-কলেজের প্রায় অনুষ্ঠানেই এই গম্ভীরা গানের প্রচলন বেড়ে যায়। সুরের মধ্যে কিছু বৈচিত্র এসে যায়। গানের মধ্যে চাচা ও নানা ইত্যাদি সম্বোধনের প্রচলন ঘটে।

গম্ভীরা গান

ড. প্রদ্যোত ঘোষ

গম্ভীরা গানই আদরণীয়; সে তার জেলার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। পূজার সঙ্গে সংযুক্ত থেকেও পরবর্তী পর্যায়ে সে পূজার সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে।

গম্ভীরা গানের ঢঙ যাত্রার। অনেক লোকগীতিতে অবশ্য যাত্রার স্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়। ময়মনসিংহ গীতিকা, মনসার ভাসান ইত্যাদি গম্ভীরার দোসর। কোনটি অগ্রজ, ও বিচার করা কঠিন। তবে গম্ভীরার এই যাত্রার ঢঙও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই ঘটেছে বলে ময়মনসিংহ গীতিকার, মনসার ভাসান ও চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি তাকে প্রভাবিত করেছে–একথা বলা যায় নিঃসন্দেহে।

এবার গম্ভীরার গানের অনুষ্ঠানের চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে।

১২। ১৪। ১৬ ফুটের মতো অংশ গোল করে ছেড়ে দিয়ে দর্শকেরা মাটিতে বসে। সামনের দিকে স্বভাবতঃই শিশু-বালক-বালিকারা থাকে। সেই ছেড়ে দেওয়া অংশে অনুষ্ঠান হয়। ওপরে সামিয়ানা বা অন্য কোনো আচ্ছাদন [ইদানীংকালে ত্রিপল জাতীয় জিনিস ব্যবহৃত হয়] দেওয়া হয়। একটু দুরে গ্রিণরুম বা সাজঘর থাকে কোন বাড়িতে বা অস্থায়ী ঘেরা জায়গায়। খালি অংশটির একপাশে থাকে বাদক বা গায়কেরা। এখানকার বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে আছে হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা, বাঁশী ও জুড়ি। আদিযুগে কেবলমাত্র ছিল ঢোল ও কাঁশি। তার পরবর্তী পর্যায়ে ঢোলের সঙ্গে হারমোনিয়াম. ডুগী-তবলা ও মন্দিরা এসেছে।

একটা গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠানের কয়েকটি অংশ আছে। যেমন : মুখপাদ, বন্দনা, ডুয়েট বা দ্বৈত, চারইয়ার, পালাবন্দি গান, খবর বা রিপোর্ট।

মুখপাদে চরিত্রগুলি এক একটি গান করে এসে তাদের পরিচয় দেয়।

এটির আছে দুটি অংশ। প্রথমটিকে বলে 'ধুয়া' ও দ্বিতীয়টিকে বলে 'চিতানি'। ধুয়ার আড়াই ফের গান। 'চিতানি' অংশে আছে দুই-ফের গান। তেহাই–অর্থাৎ মান পর্যন্ত সব গান-ই হয়, অর্থাৎ ২/২$\frac{১}{২}$/৩ সব ফেরাই হয়। তবলারও বিভিন্ন বোল বর্তমান।

গম্ভীরা গানের অনুষঙ্গ হিসেবে আদিযুগে ছিল ঢোলক। মুখপাদের তিনজন ব্যক্তি শুদ্ধ একতালে গায়। চতুর্থ জন পরে দাদরায় গায়। ধিন্, ধিন গাগ, ধা তিন নাগ্, তার সঙ্গে রেলা ও তারপর তেহাই।

'মুখপাদের' পর বন্দনা, সেখানে খেমটা সুর বর্তমান।

বোল : ধেটে ধেনে তেনে
তেটে ধেনে তেনে

রেলা : ধাগে তেনে ঘেনে
নাকো তেনে কেনে
তাকো তেনে ঘেনে
নাগো ধেনে ঘেনে

৩ বার তেহাই :
ধা তেনে ঘেনে
নাগো ধেনে ঘেনে।

চারইয়ারী শুদ্ধ একতালা, খেমটা ও দাদরায়:
ধিন্ ধিন্ ধা, ধাগে তিন্ না
কত্ তিন্ ধাগে, তেটে ধিন্ তেটে

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ধনকৃষ্ণ অধিকারীর দল জংলা, একতারা ও দাদরায় বাজাতো:

ধা তেটে ধিন্, ধাগে তেটে তেটে
তা তেটে ধিন্ তা ধিন্ তা ধিন্ ধা

গম্ভীরা গানে শিবকে উপস্থিত করে অর্থাৎ শিব সাজিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে গানের প্রচলন কিন্তু খুব বেশি দিনের নয়। ইংরেজবাজারের বিখ্যাত গম্ভীরা গায়ক বিশ্বনাথ পণ্ডিতের মতে প্রায় আট-নয় দশক আগেই এর প্রচলন। প্রচলনের কারণও খুব চিত্তাকর্ষক।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বাংলার গৌরব স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একবার মালদহে আসবার কথা ছিল। স্থানীয় বিখ্যাত গম্ভীরা লেখক ও গায়ক মোহাম্মদ সুফী আশুতোষ অর্থাৎ শিবের [শিব বা মহাদেবের অপর নাম] সম্মুখে গম্ভীরা গাইবেন ঠিক করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একজন পাত্রকে শিব সাজিয়ে আসরে হাজির করেন। কিন্তু অনিবার্যকারণ বশত স্যার আশুতোষ মালদহে না এসে তাঁর এক প্রতিনিধি আসেন। মোহাম্মদ সূফী তবুও শিবকে উপস্থিত করে যে গান গেয়েছিলেন, তার কিয়দংশ স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করেছিলেন শ্রী পণ্ডিত :

হে দ্যাখ্, হো দ্যাখ্ কারে ডাকতে
কেডা এল ভাইরে–
ইনি কি স্যার আশুতোষ? হাইকোর্টের জজ
গায়ে মাথা কেন ছাইরে?[১]

এ-চিত্র চিত্তাকর্ষক হওয়ায় পরবর্তীকালে সব গম্ভীরায় শিব উপস্থিত হতে থাকেন। তখন তিনি স্যার আশুতোষ নন, তিনি সর্বকর্মের হোতা–পরবর্তী পর্যায়ে তিনি সরকারের প্রতিনিধি। সুতরাং শিবের চরিত্রকে গম্ভীরা গানে উপস্থিত করা ও তাকে জনপ্রিয় করে তোলার মূলে সূফী মাস্টারের অবদান অনস্বীকার্য। শিব এখন সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের [feudal] প্রতিভূ। সুতরাং রূপকার্থে শিবের এই বিশিষ্ট ব্যবহার অন্য কোন লোকনাট্যের মধ্যে দেখা না যাওয়ায় গম্ভীরা কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির অনন্য বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

গম্ভীরা গানে প্রথমে ঢোলক ও জুড়ি কেবল মাত্র ছিল সম্বল। আনুমানিক বছর আশি আগে থেকে গোপাল দাস [দাস গোপাল নামে পরিচিত], হরিমোহন কুণ্ডু, শরৎদাস ও

মোহাম্মদ সূফীর আমলে হারমোনিয়াম ও ডুগি-তবলার প্রচলন হয়। বাঁশীর প্রবেশ হাল আমলের অর্থাৎ প্রায় বছর চল্লিশ আগে থেকে।

এবার গানের আসরের দিকে তাকানো যাক। গম্ভীরা ঘরের অর্থাৎ পূজাগৃহের দিকে মুখ করে গায়কেরা ও পাত্র-পাত্রীরা থাকে। পাত্র-পাত্রীদের দক্ষিণদিকে থাকে যন্ত্র-সঙ্গীতশিল্পী ও দোহারকের দল। তাদের অবস্থানের চিত্রটি সাধারণত যেভাবে থাকে তার একটা চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে।

গম্ভীরা ঘর না থাকলে অন্যত্র যেখানে গম্ভীরা গান হয়, সেখানেও ঐ একই কাঠামোয় আসর বসে।

যন্ত্র-সঙ্গীত শিল্পী থাকে :

১.	হারমোনিয়াম	:	১ জন
২.	জুড়ি	:	২। ৩ জন
৩.	ডুগি-তবলা	:	১ জন
৪.	দোহার	:	২ থেকে ৬।৭ জন পর্যন্ত
৫.	বাঁশী	:	১ জন

এইবার গম্ভীরা গানের আসরের চিত্র তুলে ধরা যাক।

পূ
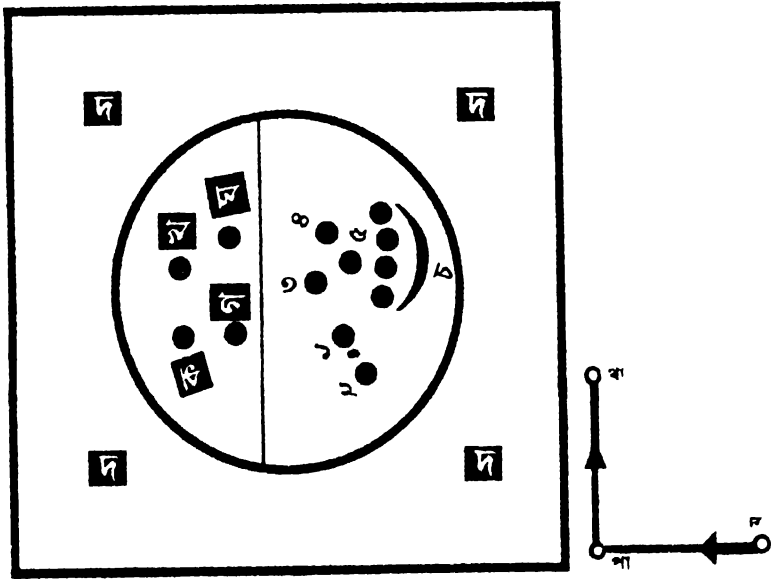
সাংকেতিক চিহ্ন

পূ- গম্ভীরা পূজা ঘর দ- দর্শক

হারমোনিয়াম-১; বাঁশী-২; জুড়ি-৩,৪; ডুগি-৫; দোহার-চ থা-থান; পা-পাত্র-পাত্রী/শিল্পী; য-যন্ত্রসঙ্গীত-শিল্পীবৃন্দ।

বন্দনা-অংশে থাকে-১মহাদেব

২চারজন পাত্র [একজন সাধারণ নাগরিক বা উচিত বক্তা]

বৃত্তাকারে থাকে দর্শকেরা। যেখানে গম্ভীরা মণ্ডপ নেই, সেখানে অন্যান্য চিত্র একই রকমের।

বন্দনা অংশে মহাদেব সেজে একজন আসে। পরিধানে বাঘছাল, ডান হাতে ত্রিশূল, মাথায় জটা ও বাঁহাতে ডম্বরু। তাঁকে উদ্দেশ করে অন্য কয়েকটা চরিত্র বক্তব্য রাখে। মহাদেব এখানে রূপকার্থে উপস্থিত হন। প্রথম যুগে তিনি 'ফিউডাল লর্ড' আগেই বলেছি। এখন তিনি সরকার। তাঁকে দেশের নানা দুর্দ্দশা সম্পর্কে অবহিত করা ও তার প্রতিকারের জন্য আবেদনই সংলাপের মুখ্য বিষয়বস্তু। এখানে উভয় পক্ষের রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক উক্তি-প্রত্যুক্তি চলে। অন্য চরিত্রগুলির গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি পরণে ধূতি [মালকোঁচা করে], কপালে চূণের টিপ, মাথায় ও হাতের কব্জিতে ছেঁড়া ন্যাকড়া বা দড়ি বাঁধা থাকে– এর অর্থ দারিদ্র্য-পীড়িত জনগণ। রূপকের অর্থ–সরকারের দরবারে সাধারণ মানুষের ফরিয়াদ। কিছুক্ষণ সংলাপ চলার পর শিব প্রতিকারের আশ্বাস দিয়ে হন অন্তর্হিত।

শিবকে উপলক্ষ করে গান শুরু হল :

কি করলি হে দশা দৈন্য
দেশের লোক পায় না অন্ন
হায় কি রে পস্তানার কথা
শায়েস্তা খাঁর আমলে শিব হে।
তখন গরীব দুঃখী আছিল সুখী
টাকায় আটমনের ভাও চাউল হে
কুণ্ঠে [=কোথায়] গেল সে সুখের দিন
হনু দিনে দিনে দীনের অধীন শিব হে।
এখন আট সেরেরও ভাও জুটে না,
দু বেলা প্যাটে ভাত জুটে না,
তোর নন্দী ভিরিঙ্গী বুড়হ্যা দামড়া
কি দিয়ে পূজবো, কহেক হামরা, শিব হে।....
বছর বছর আসিস কেন
দ্যাশচ্ লক্ষ্মীছাড়া শস্যশূন্য.........

যদিও শিব-বন্দনাই গম্ভীরার মুখ্য বন্দনা তবুও অন্তত একজন গম্ভীরা কবির গানে কার্তিক-বন্দনা বর্তমান। বাংলা ১৩৪৪ সালে গোপাল দাস বন্দনা গাইলেন :

লম্বা কোঁচা জুতা ফোতা [=চাদর]
ছাই মাখা যার বাপরে।
নবাবীতে বাদশাদীতে
গণসার কাটা কাপরে [=গরিবের বিলাসিতা বা ঢঙ]

যার ঘর গৃহস্থী সব ফাঁকা
সেজেছে দেখ, কাঙাল বাঁকা
যার মা তারা, পাঁঠা প্যারা [=মহিষ শাবক]
খেয়ে করলো সাফ্‌রে।
লম্বা কোঁচা.........

শিব-বন্দনার পর নানা বিষয়বস্তু নিয়ে গান হয় তৈরি। এক একটা অনুষ্ঠানে অন্তত চার থেকে পাঁচ/ছয়টি বিষয় বস্তু থাকে। সময় লাগে আড়াই ঘণ্টা থেকে তিন ঘণ্টা। বিভিন্ন সমস্যা থাকে ঐ সব বিষয়বস্তুতে, যেমন ভাষা সমস্যা, ইংরেজী শিক্ষার কুফল, দেশের রাজনৈতিক দলাদলি ইত্যাদি। হাল আমলের সামাজিক, রাজনৈতিক, দেশীয় ও আন্তর্দেশীয় রাজনীতির কথাও ধরা পড়ে এই সব বিষয়বস্তুতে।

বন্দনার পরবর্তী সব অনুষ্ঠানসূচিতে অভিনেতাদের মধ্যে একজন একেবারে ছিন্নবস্ত্রে থাকে। সে দরিদ্র জনসাধারণের প্রতিনিধি। তার বক্তব্য সবচেয়ে কৌতুকপূর্ণ, কিন্তু নিষ্ঠুর সত্যের মোড়কে ঢাকা। হাস্যরসের মাধ্যমে বক্তব্য পরিস্ফুট করে কুশী-লবেরা, কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে লুকিয়ে থাকে কঠিন সত্য। কথাগুলি লোকদের ভাবায়।

গম্ভীরা গানে শিববন্দনা ও অন্যান্য গানগুলি লেখ্য, কিন্তু অন্যান্য সংলাপ যা মূলগানকে ব্যাখ্যা করে তা পাত্ররা তৎক্ষণাৎ [Extempore] তৈরি করে অনুষ্ঠানে। এখানেই তাদের কৃতিত্ব।

এক একটা বিষয়বস্তু হয়ে গেলে শিল্পীদের বেশভূষার পরিবর্তন ও মঞ্চ পরিবর্তনের [হয়ত বা একখানা চেয়ার বা টেবিল] প্রয়োজন ঘটলে এ সময়ের জন্য [৫ থেকে ১০ মিনিট] একটা শিশু বা বালিকা শিল্পী প্রদীপ, আগুন ইত্যাদির খেলা দেখায়। নেচে নেচে [খেমটা] গানও করে। সে গানের ঢঙের সঙ্গে মূল গম্ভীরা গানের সুরের কোনও সম্পর্ক নেই। সেই সময় যন্ত্র-শিল্পীরা বাজাতে থাকে বাদ্যযন্ত্র। ইদানীংকালে এগুলো উঠে যাচ্ছে। দর্শক-শ্রোতাদের বিশ্রামের জন্যও এই বিরতির [Relief] প্রয়োজন। এটি গম্ভীরা গায়ক মোহাম্মদ মেরাজউদ্দিন, ধরণীধর সাহা ও শিল্পী হরিবোলা থেকে প্রচলিত।

গম্ভীরা গানে মহিলা শিল্পীর প্রবেশ ঘটেনি এখনও, যদিও এখনকার শহরের যাত্রায় ঢুকে পড়েছে। পুরুষশিল্পীরা মহিলা চরিত্রের বেশ ধারণ করে। এদিক থেকে গম্ভীরা এখনও সাবেক ঢঙে চলে আসছে। 'ডুয়েট' বা দ্বৈত বিষয়বস্তুতে একজন পুরুষ ও একজন নারী চরিত্র সাধারণত থাকেই।

গম্ভীরা গানে 'চার-ইয়ারী' বর্তমান। চার ইয়ার বা বন্ধু, অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে এখানকার পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা চার। বৈঠকী ঢঙে চলে সংলাপ ও গান। এখানকার বোল একতাল। সূফী মাস্টারের আমলে ধনকৃষ্ণ অধিকারী এ বোল বাজাতেন।

গম্ভীরার ডুয়েট [Duet] ও চার-ইয়ারী অংশে নাট্যের ভাগ গানের চেয়ে বেশি। বলা বাহুল্য এটি লোকনাট্য। এর নাট্যিক চরিত্র আলোচনার ব্যাপারে নাটক সম্পর্কে সামান্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

নাটকের প্রধান অঙ্গ চারটি– কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা-সমাবেশ ও সংলাপ। লোকনাট্যেরও তাই। কেবল দৃশ্যপট সেখানে নেই। এই বৈশিষ্ট্য মূল যাত্রার [ইদানীং

কালের অপেরাধর্মী যাত্রার নয়]। যাত্রার সঙ্গে পার্থক্য এখানেই। তাছাড়া নাটকের মধ্যে যে গতি [Tempo] বা action যাত্রায় বর্তমান—তার বাহুল্য বীরও রৌদ্ররসের বাড়াবাড়ির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। সেই সঙ্গে থাকে আবেগপূর্ণ সুদীর্ঘ সংলাপ বা বক্তৃতা, আর থাকে স্থূল হাস্যরস পরিবেশনের জন্য ভাঁড়ামির চেষ্টা।

যাত্রার সঙ্গে গম্ভীরার দৃশ্যপটের অভাবের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু অমিল হলো তার সুদীর্ঘ বক্তৃতা ও রৌদ্ররস পরিবেশনের চেষ্টা ভাঁড়ামো [Baffoonary] এখানেও লক্ষণীয় নয়, এখানকার রসিকতা সার্কাস বা যাত্রার ভাঁড়ামো নয়। অঙ্গ-ভঙ্গি [Gesticulation] ও বক্তব্যের [সংলাপ] মাধ্যমে রঙ্গরসিকতা এত তীব্র যে সত্য কথাটি রসিকতার শর্করার মোড়কে পরিবেশিত হয়। পরে চাবুকের মতো তা গায়ে লাগে।

ভূমিতে গম্ভীরার পাত্র-পাত্রীরা অভিনয়ের মাধ্যমে বিষয়-অনুগ সেই পরিবেশকে ফুটিয়ে তোলে। গম্ভীরা গানের মধ্যে বিষয়বস্তু অনুযায়ী পাত্র-পাত্রী থাকে। সাধারণত দুই বা চার জন। দুজন হলে হয় 'ডুয়েট' [Duet], চার জন হ'লে হয় 'চারইয়ারী'। পালাবন্দি গম্ভীরার গান ছাড়া অন্য কোথাও পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা চারের অধিক হয় না। এর মধ্যে একজন সাধারণ জনগণের প্রতিনিধি বা স্পষ্টবক্তা বা উচিত বক্তার ভূমিকা গ্রহণ করে। এ ভূমিকাটি গ্রহণ করে দলের সর্বাপেক্ষা দক্ষ অভিনেতা। তার বক্তব্য ও রঙ্গ-পরিহাসেই গম্ভীরার নাট্যিকভাবটি পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয়। কাহিনীর মধ্যে গতি বা Tempo বর্তমান। দর্শক-শ্রোতাদের দৃষ্টি ঐ সাধারণ বক্তারই দিকে। সম্পূর্ণ বক্তব্যটি পরিস্ফুটনে তার ভূমিকাই মুখ্য। তার সাফল্য ও ব্যর্থতার উপরে নির্ভর করে অনুষ্ঠানের মান। গম্ভীরা গান আদি যুগে কেবলমাত্র গানই ছিল, সুতরাং লোকসঙ্গীত হিসেবেই কেবলমাত্র গম্ভীরার মূল্যমান হতো নিরূপিত। কিন্তু ইদানিং কালে পাত্র-পাত্রীদের সংলাপও চলে, তারই মধ্যে গান।

তাই তাকে সাধারণত 'লোকনাট্য' বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু চরিত্রের বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব চরিত্রই যেমন নাটকের চরিত্র এবং তা বিভিন্ন ঘটনার নিবিড় সমাবেশের [logical sequence] মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়, গম্ভীরায় তেমন থাকে না। তাই একে লোকনাট্য সম্ভব' বলাই বোধ করি অধিকতর সঙ্গত। তাছাড়া নাটকের ক্রমপরিণতি যেমন পঞ্চসন্ধির [Exposition, Rising action, Climax, Falling action, Catastrophe] চিত্র ফ্রেটাগের পদ্ধতিতে Pyramidal হলেও গম্ভীরার ডুয়েট ও চারইয়ারীতে তা এমন চিত্রে উপস্থাপিত হতে পারে :
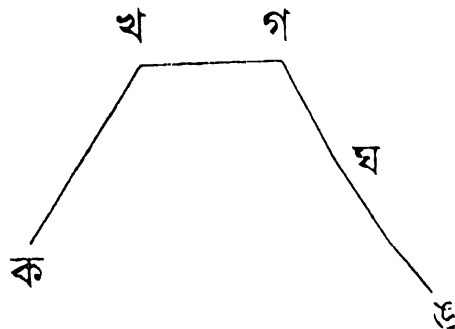
এখানে : ক - মুখ [Exposition], খ- প্রতিমুখ [Rising action], গ– গর্ভ [Climax], ঘ-বিমর্ষ [Falling action], ঙ– উপসংহৃতি [Catastrophe]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গম্ভীরা গানে এমন বহু শব্দ ব্যবহৃত যা কেবলমাত্র মালদহ অঞ্চলেরই ভাষা অর্থাৎ তা জেলার বিশিষ্ট বিভাষা। সুতরাং মালদহের চৌহদ্দীর বাইরের মানুষের পক্ষে সেই শব্দগুলির রসাবেদন পরিপূর্ণভাবে অনুভব করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই বাধা থাকলেও অন্য এলাকাতেও বিষয়বস্তু ও তার সামগ্রিক রসসৃষ্টির মূল্যে তার আবেদনও কম নয়। নাটকীয়তায়, রঙ্গে ও ব্যঙ্গে গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠান হৃদয়ের গভীরে পৌছায়। গম্ভীরা কবি-শিল্পীরা নিজেরাই কেবলমাত্র ভাবেন না, সাধারণ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ-নিচ, গ্রাম্য-শহুরে, ধনী-নির্ধন সকলকেই ভাবান।

সাধারণত গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই হয় তৈরি। এখানে সকল দল ও মতের ত্রুটিগুলি হয় সমালোচিত। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তু অনুপ্রবিষ্ট হয়। লোকশিক্ষা দান ও সমাজচেতনার উদ্বোধন এই গানের উদ্দেশ্য। তবুও পৃথক ভাবে দু'জন মুসলিম গম্ভীরা গান রচয়িতার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হয়। তাঁরা হলেন– মোহাম্মদ সুফী রহমান [সূফী মাস্টার] ও মোহাম্মদ সোলেমান [সোলেমান ডাক্তার]। ধর্মের বন্ধন থেকে পরিপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষেত্রে গম্ভীরা গানের উপস্থিতি তাঁদেরই পদচিহ্ন লক্ষ্য করে।

আদিতে অর্থাৎ গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে সমাজের বা গ্রামের কোনও ব্যক্তিবিশেষের [প্রভাবশালী ব্যক্তিই বিশেষভাবে উল্লেখ্য] ত্রুটি-বিচ্যুতি চিত্রিত হতো। কারণ সাধারণ গ্রামবাসী সে সমস্ত ঘটনা থেকে মজা পেতো। দূরবর্তী কোনও ঘটনা বা বৃহত্তর সমাজ অথবা রাষ্ট্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি কখনই তেমন মনকে আকর্ষণ করতে পারে না, তাই এইসব ক্ষুদ্র ঘটনা, স্থানীয় লোকায়ত জীবনে অধিকতর আকর্ষণীয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়বস্তুও গানে জায়গা করে নেয়। এ ধারার প্রবর্তক উক্ত মুসলিম রচয়িতাগণ। কারণ হিন্দুর ধর্মীয় সীমানার বাইরে তাঁদের যেতে অসুবিধে হয় নি। ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টির অধিকারী তাঁরা ছিলেন বলে এটি প্রবর্তন করতে তাঁদের সুবিধে হয়েছিল। এই ধারাই আজ বেগবতী হয়ে গম্ভীরা গান সর্বভারতীয় লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে বিলম্ব করেনি।

গম্ভীরা গান শেষ হয় একটা সর্বজনগ্রাহ্য সমাধানের মধ্য দিয়ে। সংলাপগুলি পৃথক লেখা হয় না তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এটা কতকটা কবিগানের মতো। উপস্থিত বুদ্ধির উপর নির্ভর করে তৈরি করে পাত্র-পাত্রীরা। দলপতি বা অধিকারীর পরামর্শমতো বা নির্দেশমতো, কখনও বা নিজেরা আগে-ভাগে আলোচনা করে নিয়ে গানের আসরেই নিজস্ব উপস্থিত বুদ্ধি অনুযায়ী সংলাপ তৈরি ও রঙ্গরস পরিবেশন করে পাত্রেরা। এতে শিল্পীদের নিজস্ব প্রতিভার বিকাশও ঘটে সন্দেহ নেই। বিশেষ ব্যঙ্গ-কৌতুকে যিনি সুনাম অর্জন করেন, তাঁর নামেই প্রধানত দলের নাম প্রচারিত হয়। যেমন ইংরেজবাজারের মটর বা চলিত কথায় 'মট্রার গান' বা 'নিরুর গান', অথচ রচয়িতা হয়ত দেবনাথ রায় ওরফে

হাবলা বা গোপীনাথ শেঠ। যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী বা মটরবাবুর ম্যানারিজম [Mannarism] ও সংলাপে [Pun, Fun, Wit, Mockery, ও Satire] আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই সাগ্রহে গ্রহণ করে বলে তাঁর অনুষ্ঠান ব্যাপক আকর্ষণের ব্যাপার।

গম্ভীরা গানের আবেদন শেষ পর্যন্ত দর্শক-শ্রোতাদের কাছে কেমন ভাবে পৌঁছায়, তা পরের পৃষ্ঠার ছকের মধ্য দিয়ে দেখানো যেতে পারে :
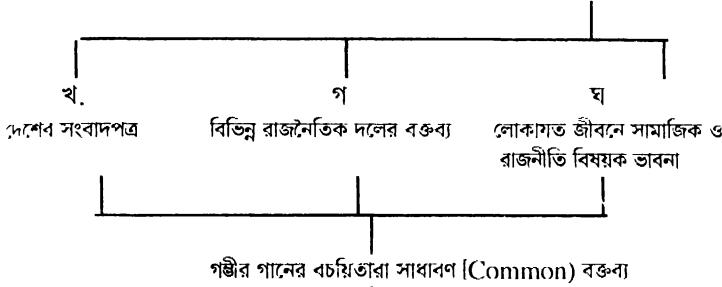
গানের মূলসুর + শিল্পী বা পাত্র-পাত্রীর রস-রসিকতাযুক্ত উদাহরণ সমন্বয়ে সংলাপ যা তাৎক্ষণিক সৃষ্ট (ক্ষীণ কাঠামো আগে-ভাগে অবশ্য সৃষ্ট হয়}= মূল গান + সংলাপ + স্থানীয় বিশিষ্ট শব্দসম্ভার + পদবিন্যাস + উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য + স্থানীয় লোকায়ত উদাহরণ + উপমা + রস-রসিকতা

উপরিউক্ত ছকটি গাণিতিক সূত্রে ব্যাখ্যা করা যায় এমনভাবে যদি :

১. অংশকে $\frac{dA}{dx}$ ও খ, গ, ঘ কে B,C,D ধরি

তবে (x)

$$\frac{dA}{dx} = \frac{d}{dx}(B+C+D)$$

$$f'(x). = \frac{d}{dx}(b) + \frac{d}{dx}(C) + \frac{d}{dx}(D)$$

আবার দেখা যায়, $A \propto B + C + D$
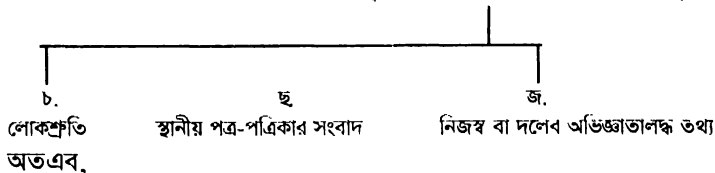
অতএব,

গম্ভীরা গান {গৌণ}– সংলাপ, ব্যাখ্যা, উদাহরণ রস-রসিকতা {মুখ্য}
অতএব, গম্ভীরা গান [গৌণ] –সংলাপ, ব্যাখ্যা, উদাহরণ + রস-রসিকতা [মুখ্য]
এবার একটি মডেলের মাধ্যমে গম্ভীরা গানের সৃষ্টিকে তুলে ধরা যেতে পারে :
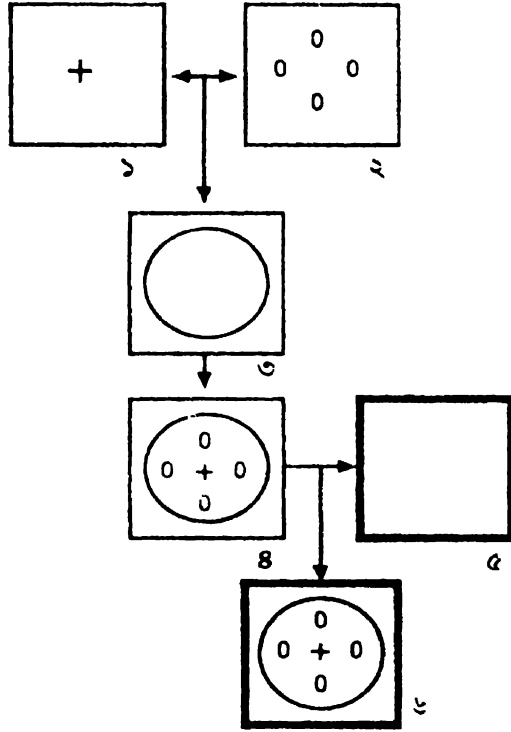
১. বাইরের জগতের তথ্য ২. লোকজীবনের ভাব-ভাবনা
৩. রচয়িতার নিজস্ব চিন্তার জগৎ ৪. ১, ২, ৩-এর যোগফল
৫. পাত্র ও পাত্রী [ছদ্মবেশে]র সংলাপ-অভিনয়
৬. ১, ২, ৩,৪,৫ এর যোগফল সম্পূর্ণ লোকনাট্য বা প্রকৃতার্থে 'লোকনাট্য সম্ভব'

গম্ভীরা গান আজ দ্রুত অবক্ষয়ের পথে। সারা মালদহ জেলায় মাত্র দুটি দলই এখন প্রথম শ্রেণীর। অন্য যেগুলি আছে তার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া ভার।

আজও খ্যাতনামা গম্ভীরা দলগুলি বিশেষ কোন দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গান রচনার প্ররোচনায় রাজি হয় না। ফলত সমালোচনা যে রাজনৈতিকদলের বিরুদ্ধে তীব্র হয়, তারা প্রথমে অর্থ দ্বারা প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। কোনও কোনও স্থানে ইদানীংকালে দৈহিক নির্যাতনের খবরও মিলেছে। কিন্তু মটর বা নিরুবাবুর দল সমস্ত ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে গেয়েছে এবং তাতে অধিকতর লোকপ্রিয় হয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ব্যক্তিগত কেচ্ছা [individual misdeeds] বা স্থানীয় কোনও প্রতিষ্ঠানের ক্রটি-বিচ্যুতি গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত, আজ সেগুলি বেশ কিছুটা স্তিমিত। বৃহত্তর ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যাপক সামাজিক বা রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করে শিল্পীরা দেখে কৌতুকের দৃষ্টিতে সমগ্র ব্যাপারটি, অনেকটা 'কমলাকান্তে'র মতো।

গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠানের–খবর বা রিপোর্ট [Report] একটা বিশেষ অঞ্চল বা শহরের [যে স্থানে এই অনুষ্ঠান হয়] নতুন খবরাখবর। ক্রটি-বিচ্যুতি অবশ্যই এখানে মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় যেটি মাত্র দুটি চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়। সমাজের অন্যায়, দুর্নীতি মানুষকে অবহিত করার একটি বিশেষ মূল্যবান মাধ্যম এটি। পূর্ববর্তী বৎসরের পর্যালোচনা এর মধ্যে ধরা দেয়।

আদির গম্ভীরা গান প্রকৃতপক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে লোকসমাজ কর্তৃক বর্ষবিবরণী পর্যালোচনা। এটি ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জাতির একটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। আরব, মিশরি, প্রভৃতি জাতির মধ্যে বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এইভাবে পূর্ববর্তী বৎসরের বিবরণী-পর্যালোচনাকে মনে করিয়ে দেয়।

বিভিন্ন সুরে গাওয়া হয় এই গম্ভীরা গান। মিলে মিশে গেছে বিভিন্ন সুর। কিন্তু তবুও একটা বিশিষ্ট সুর তৈরি সে করে নিয়েছে। ঝাঁপতাল, একতাল, খেমটা, ত্রিতাল, কাহারবা, দাদরা, জংলা [বোলহীন মিশ্র সুর] এখানে বর্তমান। ইদানীংকালে হাল আমলের হিন্দী ও আধুনিক বাংলা গানের সুরও মাঝে মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তাতে দল নিন্দনীয় হচ্ছে, কারণ তা মূল গম্ভীরা গানের নির্দ্ধারিত সুরের ব্যতিক্রম মাত্র।

আলকাপ্, রামপ্রসাদী, বাউল, কীর্তনের সংমিশ্রণে গম্ভীরা সঙ্গীতের উদ্ভব। এর সঙ্গে ভাওয়াইয়ার অন্তর্গত 'ক্ষীরোল' ও 'চটকার'ও প্রভাব আছে। আসলে গম্ভীরার প্রতিষ্ঠিত সুরে [বন্দনা বাদে, যেহেতু নানান রীতিতে বন্দনা গানের খবর মেলে] নানান সুরের বোলের সমন্বয় ঘটেছে। তবে আলকাপের প্রতিষ্ঠিত সুরের প্রভাবই তার উপরে সর্বাধিক এই তথ্য মিলেছে আইহো নিবাসী প্রয়াত গম্ভীরা-কবি সতীশ গুপ্ত ও ইংরেজ বাজারের বর্ষীয়ান কবি-শিল্পী অধুনা প্রয়াত বিশ্বনাথ পণ্ডিতের নিকট থেকে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে গম্ভীরার আঙ্গিক প্রকরণ ও সুর ভাবনায় নিম্নলিখিত রূপটি উপস্থিত করা যায় বলে আমাদের বিশ্বাস :

৮. ক. গম্ভীরা আঙ্গিক ও সুর
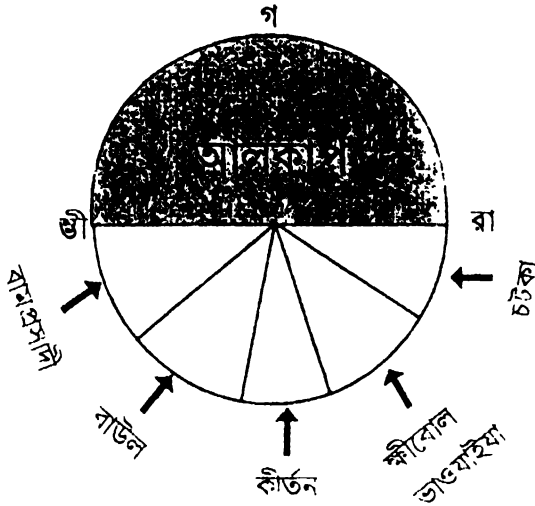
মাত্র সাত আট দশক আগে এই বিশিষ্ট সুরের জন্ম। তার আগে গম্ভীরায় কেবল শিবকে উদ্দেশ্য করে গান গাওয়া হতো। তাতে সুরের কোনও বৈচিত্র্য ছিল না। উনিশ শতকের একেবারে শেষে ও বিশ শতকের প্রথম দু তিন দশকে এক একটি গম্ভীরা পূজার থানে বহু দল মিলিত হতো। গান হয়ত সমস্ত রাত ও পরের দিনের প্রথম অর্ধ পর্যন্ত চলত। যে দলের যে সুরটি উপভোগ্য হতো, সেটি অন্যদল গ্রহণ করে গান গাইত পরবর্তী সময়ে। এখানে স্মরণীয় যে আগে সুর, পরে শব্দ বা কবিতার অংশ। ইংরেজবাজার থানার অমৃতি গ্রামের লোহারাম খলিফার এ সুর সংযোজনার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা বর্তমান। লোহারামের সুরজ্ঞান ছিল অসাধারণ, তারই সঙ্গে ছিল সুরেলা গলা। তিনি মুখ্যত ছিলেন আলকাপ গায়ক। এক সময় ছিল যখন লোহারামের সুর হয়েছিল ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তার গানের সুরই যে পরিপূর্ণ ভাবে গম্ভীরায় এসেছে, তা নয়, অনেকেরই এসেছে, তবে লোহারামের অবদান বেশি একথা মানতেই হবে।

এ ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করলে ভাঁলো হয়। লোহারামের গান বা হয়ত অখ্যাত এক দলের এক টপ্‌পা জাতীয় গানের সুর সুন্দর হলো। গ্রহণ করলো সেই সুর আরও অনেক অনেক দল। এমন ভাবেই বিশ শতকের প্রথম দু-তিন দশকের মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠিত সুর জন্ম নিল। আসলে আলকাপের সুরের উপরে ভিত্তি করেই মূলসুর জন্ম নিয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় তো বটেই, মালদহ জেলায় বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে অর্থাৎ কালিয়াচক, সুজাপুর, মানিকচক ও ইংরেজবাজার থানায় বেশ কয়েকটা বিখ্যাত আলকাপ দল আছে। আলকাপের জন্মও বর্তমান গম্ভীরার সুরের পূর্বে। তাই আলকাপের সুর গম্ভীরা গ্রহণ করেছে। গম্ভীরার আলকাপে যায় নি। সাক্ষী

অশীতিপর বিখ্যাত গম্ভীরা কবি প্রয়াত সতীশ গুপ্ত ও গম্ভীরার ইতিহাসবেত্তা সদ্য প্রয়াত বর্ষীয়ান কবি সুকণ্ঠ বিশ্বনাথ পণ্ডিত।

গম্ভীরা গান সাধারণত কীর্তন, জারি প্রভৃতি গোষ্ঠীসঙ্গীতের অন্তর্গত। এ গানে লাভ-লোকশিক্ষা। অশিক্ষিত নিরক্ষর জনসাধারণ অনেক শিক্ষালাভ করে এর মাধ্যমে। যত সহজে এ গান ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দিতে পারে, সে রকম কোনও মাধ্যম আছে কিনা সন্দেহ। নেতাজী সুভাস চন্দ্র তাই সুর-সাধক দিলীপকুমার রায়কে মালদহে গিয়ে গম্ভীরা গান-নাচ দেখতে চিঠি দিয়েছিলেন।

এ গানের গায়ক সম্পর্কে বলা চলে যে তথাকথিত অভিজাত গায়কেরা উদাসীন বলে প্রতিভাবান গায়ক এখানে মুষ্টিমেয়। ভালো কুশী-লবও বিরল। সমগ্র মালদহ জেলায় মাত্র দুজন সেই বিরল প্রতিভাবান অভিনেতা–তাঁরা হলেন প্রয়াত মটর ও তাঁরই হাতে গড়া শিষ্য নিরু। আইহোর কবি প্রয়াত ইন্দ্রদমন শেঠ দুঃখ করে বলেছিলেন বছর পঁয়ত্রিশ আগে–'গায়কের অভাব গান গাওয়ান হয় না। খাতার গান খাতায় লেখা থাকে। নতুন নতুন গায়কের জন্ম না হলে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত গম্ভীরা গান গাওয়ানোই হবে না।'

মালদার গম্ভীরা গানের প্রতিনিধিত্বমূলক রচয়িতাদের নিয়ে একটা পর্ব বিভাগ করা যায়। তবে এই পর্ব-বিভাগ অবশ্যই স্থিতিস্থাপকতা বলা বাহুল্য।

১	২	৩	৪	৫	৬
← (১৯০০)	১৯০০–১৯২০	১৯২০–১৯৪৭	১৯৪৭–১৯৬০	১৯৬০–১৯৮০	১৯৮০ → →
অজ্ঞাত	* হরিমোহন কুন্ডু * বামনবিহারী গোস্বামী	* সতীশগুপ্ত * মোহম্মদ সূফি রহমান * কিশোরী পণ্ডিত * ঠাকুরদাস দাস * ধরণীধর সাহা * শরৎ দাস * গোবিন্দ শেঠ	* মোহম্মদ সোলেমান * তারণ দাস * গোপীনাথ শেঠ * গোষ্ঠ নানিজ্যা * গোপাল দাস * বিশ্বনাথ পণ্ডিত	* গোপীনাথ শেঠ * দেবনাথ রায় (হাবল) * ডা. দেবপ্রসাদ সাটিয়ার * ইন্দ্রদমন শেঠ * সুধাকর দাস * দুকড়ি চৌধুরী	* ডা. দেবপ্রসাদ সাটিয়ার * দুকড়ি চৌধুরী * বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্ব কটি আবার বিষয়বস্তু অনুযায়ী এমনভাবে বিন্যস্ত করা যায় :

১	২	৩	৪	৫	৬
* স্থানীয় খবর / রিপোর্ট (কৃষি ও জন-জীবন)	* আধ্যাত্মিক [++++]	* আধ্যাত্মিক [+] *পারিবারিক [+] * সামাজিক [+] *রাজনৈতিক [++]	*পারিবারিক [+] * সামাজিক [++] * রাজনৈতিক [+++]	* সামাজিক [++] * রাজনৈতিক [++++]	* সামাজিক [+] * রাজনৈতিক [++++]

সুতরাং খবর বা রিপোর্ট ⟶ আধ্যাত্মিক ⟶
সামাজিক - পারিবারিক ⟶ রাজনৈতিক বিষয়বস্তুতে তার
উত্তরণটি মূলত চারটি স্তরে এমনভাবে —
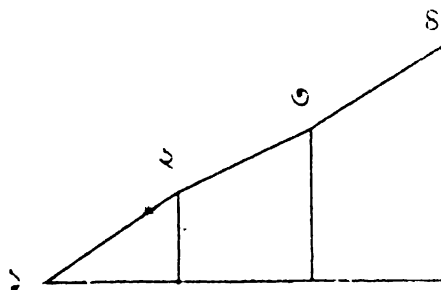
বৈষ্ণব পদাবলী যেমন পাঠে নয়, গানে পাওয়া যায় অনাবিল আনন্দ, তেমনি গম্ভীরা গান তখনি হয়ে ওঠে নিটোল হৃদয়গ্রাহী যখন গীত-বাদ্য-সংলাপের রস-রসিকতায় তা লোকনাট্য-সম্ভব হয়ে প্রকাশ পায়। শুধু মাত্র পাঠে তার ভগ্নাংশও আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়। গানে শুধুমাত্র একটা ইঙ্গিত থাকে, যা Sketch ধর্মী।

গম্ভীরা গানে অশ্লীলতা এসে পড়েছে বলে যে অভিযোগ অনেকে করেন, এ-কথা অসত্য। নগরকেন্দ্রিক গুম্ফস্ফুরিত হাস্যকে এখানে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু মেঠো হাসি উপস্থিত সকল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মুখে লেগে থাকে। দু-চারটি শব্দ বা সম্বোধন গ্রাম্য হতে পারে, কিন্তু তা কখনই অশ্লীল নয়।

গানের পরিবেশেরও একটা মুল্য বর্তমান। গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষ ধুলোপায়ে সাধারণ সুখ-দুঃখ, সমাজনীতি, লোকাচার, দেশাচারের কাহিনী এর মধ্যে পেয়ে থাকে, যা হয়ত নন্দনতত্ত্বের তৌলে নগরের তথাকথিত সভ্য মানুষের [Sophisticated] নিকট বিশেষ মূল্যবান নয়। মালদহ জেলার বাইরে যে গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তার আবেদন রসজ্ঞ মানুষ গ্রহণ করলেও পরিপূর্ণ রসগ্রহণের জন্য তার লোকায়ত শব্দ ও রস-রসিকতার জন্মভূমিতে যাওয়া প্রয়োজন।

---

১. ঘোষ প্রদ্যোত : মধুপর্ণী, উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, পৃ. – ১৩৬৩৭
২. ঘোষ প্রদ্যোত : গম্ভীরা : লোকসঙ্গীত ও উৎসব। একাল ও সেকাল, ১৯৬৯, পৃ–২৩
৩. ঐ : পৃ–২৪
৪. ঐ : পৃ.-২৫

লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা পুনর্বিচার পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ১৪১০

গম্ভীরা সংগীত

শচীকান্ত দাস

সংস্কৃতির অন্যতম শাখা সাহিত্য। বাংলার লোকসাহিত্যকে বিশেষজ্ঞগণ ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন–ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, কথা, লোকগীতিকা ও লোকসংগীত। এসবের মধ্যে সাহিত্যগুণে, সুরবৈচিত্র্যে ও জনপ্রিয়তায় লোকসংগীতের স্থান সমুচ্চ। অঞ্চলভেদে লোকসংগীতের ভাষা, কথা, সুর, মেজাজ সব কিছুই আলাদা স্বতন্ত্রতার দাবি রাখে। তাই শ্রেণীগত লোকসংগীত নিজের নিজের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। জেলাগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন লোকসংগীত আছে। মালদহ জেলাতেও একাধিক লোকসংগীতের মধ্যে গম্ভীরা লোকসংগীতের ব্যাপক প্রচলন আছে এবং এ জেলায় গম্ভীরা লোকসংগীত বর্তমানে উৎসবে পরিণত হয়েছে। গম্ভীরা সংগীতের উত্তরবঙ্গ অঞ্চল সীমানা প্রধানত অবিভক্ত মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রংপুর, রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা নিয়ে। মালদহের গম্ভীরা সংগীত আঞ্চলিক সংগীত হলেও এটা একটা অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। এই অনুষ্ঠান হচ্ছে শিবের গাজন। আদ্য অর্থাৎ শিবের গম্ভীরা উপলক্ষে অনুষ্ঠান হয় বলে এর নাম এই অঞ্চলে 'আদ্যের গম্ভীরা' বলে পরিচিতি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে মালদহের এই গম্ভীরা লোকসংগীতকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়ে ছিলেন বলেই আজ মালদহের গম্ভীরা, লোকউৎসবে পরিণত হয়েছে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর মান্দালয় (ব্রহ্মদেশ) জেল থেকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র তাঁর বন্ধু সংগীতজ্ঞ দিলীপ কুমার রায়কে চিঠি দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি মালদহে গিয়ে গম্ভীরার নাচ, গান দেখ এবং মালদহের জন্য কিছু কর।'

উত্তরবঙ্গের লোকগীতির মধ্যে মালদহ অঞ্চলে এক বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সংগীতের ব্যাপক প্রচলন আছে। তা আঞ্চলিক সংগীত হলেও গম্ভীরা সংগীত বলে পরিচিত। এই সংগীত গম্ভীরা অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত এবং ধর্মীয় উৎসজাত। আদ্য বা শিবের গম্ভীরা উপলক্ষে এই সংগীত গাওয়া হয় এবং গম্ভীরা উৎসবানুষ্ঠানে মুখোশেরও নৃত্য হয়।

"শিবমনের কথা দুটা বলিব
এনে জড় জগতে, ঘুরাও নানা পথে
কোথা গেলে দেখা পাব।'

* * * *

দেবতার তুষ্টি বিধানের জন্য পূজা-অর্জনা উপচারাদি, দান, নাচ, গান করা একান্তই প্রয়োজন এক্ষেত্রেই গম্ভীরা উৎসবানুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ গম্ভীরা সংগীত। লোকজীবন মুখ্যত কৃষি-নির্ভর। মালদহের গম্ভীরা কৃষিভিত্তিক সংগীত। শিবমঙ্গলে শিবকে চাষি শিব এবং লৌকিক শিবকে পৌরাণিক শিবের সঙ্গে অন্বিত ও উন্নীত করে শিষ্ট সাহিত্যে দেবাদিদেবের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। শিব ধর্মঠাকুরের রূপান্তর কিনা বা

ধর্মঠাকুর বৌদ্ধধর্মের বিকৃত অঙ্গ কিনা তার বিস্তৃত আলোচনা গম্ভীরা সংগীত আলোচনায় অপরিহার্য নয়। গম্ভীরাতে একমাত্র বন্দনীয় হচ্ছে শিব। এই শিব ভগবান হলেও গম্ভীরায় সাধারণ মানুষের কাছে আসেন অতি আপনজন কৃষক বা মোড়ল রূপে। তাই খুঁজে পাওয়া যায় একশ বছর আগের শিব প্রসঙ্গে শিববন্দনা গান। এই বন্দনা গানে উঠেছে কৃষিকর্মের কথা। মালদহ, দিনাজপুর এলাকা পৌন্ড্রবর্ধন ভুক্তির অংশ বিশেষ বরেন্দ্রভূমি। এই এলাকায় বসবাসকারী পৌন্ড্র, পৌন্ড্র ক্ষত্রিয়, কোচ রাজবংশী প্রভৃতি জনগোষ্ঠী উন্নত ধরনের বস্ত্র উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই নিম্নে উল্লিখিত সংগীতের সঙ্গে এই কথাগুলির যথেষ্ট মিল আছে।

'বৈশাখ মাসে শিবঠাকুর কার্পাস বুনিলেন
বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ
আষাঢ় মাসে শিবঠাকুর বুনিলেন কার্পাস'। ইত্যাদি।

কথিত আছে শিব ভক্ত বানরাজা কর্তৃক বানপূজা প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হয়। এই বানপূজার রূপান্তর বা নামান্তর হচ্ছে শিবপূজা বা গম্ভীরা পূজা ও উৎসব। এ বিষয়ে একটি গল্পও আছে। মালদহ জেলায় বরিন্দ এলাকার প্রবীণদের মুখে এর বিস্তৃত বিবরণ শোনা যায়। গম্ভীরা পূজা ও উৎসবানুষ্ঠানে এখনও চড়ক ও চড়কের মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দেশ বিভাগের পর বিভিন্ন ভাষাভাষী ও সম্প্রদায়ের মানুষ এ জেলায় আসার পর একসঙ্গে বসবাসের ফলে সামাজিক সাংস্কৃতিক মিলন মিশ্রণ ঘটেছে। এমনকি মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা গম্ভীরা সংগীতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যেমন মহ: সুফি, মেরাজুদ্দিন, সমীর খলিফা, আব্দুল মাজিদ ও সোলেমান ডাক্তার প্রমুখ গম্ভীরা শিল্পীরা।

ইংরেজ আমলে গম্ভীরা গানের ওপর সরকারি দৃষ্টি ছিল। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে মালদহ জেলা সমাহর্তা জনপ্রিয় গম্ভীরা শিল্পী গোবিন্দলাল শেঠ ও ধরণীধর সাহার গানের অংশ বিশেষ নাকি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। মালদহের গম্ভীরা হচ্ছে নাচ, গান ও অভিনয়ের উৎসব। এই কারণে সব ধর্মের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে থাকে। গম্ভীরা গান এই উৎসবের প্রাণ। একসময় গম্ভীরা গানের গায়ক হিসাবে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে লালমহম্মদ, আকবর খলিফা, মহ: সুফী, সোলেমান ডাক্তার প্রমুখ কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্বদেশপ্রেমীরা ইংরেজ বিরোধী গান রচনা করে প্রচার করাতে ইংরেজদের আমলারা সন্ত্রস্ত হত, ঠিক তেমনি আজও নানারকম অনাচারের বিরুদ্ধে গম্ভীরা কবিরা কিছু কিছু গম্ভীরা সংগীত রচনা করলেও বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তা অনেক সময় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তাই গম্ভীরা কবিরা আর আগের মতো আর সাহস পায় না।

পরবর্তীকালে গম্ভীরা গানের সুগায়ক হিসাবে নাম করেছেন বিশ্বনাথ পণ্ডিত। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক লোকসংস্কৃতির অবদান স্বরূপ মালদহ জেলায় তিনি সর্বপ্রথম লালন পুরস্কারে ভূষিত হন। গম্ভীরা সংগীতের প্রবাদপুরুষ হিসাবে মটরাও (যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী) মালদহে বিশেষভাবে সুনাম অর্জন করেন। শুধু গায়ক হিসাবে নয়, তিনি ছিলেন একজন দক্ষ কৌতুক ও শিল্পী সৃষ্টিকারী অভিনেতা। মালদহের আপামর জনসাধারণের মন জয় করে তিনি রসসম্রাট মটরবাবু বলে খ্যাতি লাভ করেন।

স্বনামধন্য লোকসংস্কৃতিবিদ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মালদহে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২৯ এপ্রিল (১৩৮৬ বঙ্গাব্দের ১৫ বৈশাখ) আসবেন বলে একবার অগ্রিম মটরবাবুকে চিঠি দেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল মটরবাবু চিঠি পাবেন কিনা। মালদহের স্টেশনে সেই নির্দিষ্ট দিনে এসে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় রিকশাওয়ালাকে বলেছেন, গম্ভীরা গায়ক মটরবাবুর বাড়ি যাব। রিকশাওয়ালা তাঁকে এককথায় মটরবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিলে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হন। তখন মটরবাবুর বয়স ছিল মাত্র ৬৮ বছর। একনাগাড়ে ৪৫ বছর গম্ভীরা সংগীত গেয়ে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। মটরবাবুর বাড়ির সামনে একটি কালীর বেদী আছে এবং সেই বেদীর পেছন দিকে একটি কালীর মুখোশ টাঙ্গানো আছে। মটরবাবু শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে তার বাড়ির এই কালীর মুখোশ বা মুখার গল্প সে সময় শুনিয়েছেন। যে গল্প মটরবাবু তাঁর বাবা গণেশ চন্দ্র চৌধুরীর কাছে শুনেছিলেন। প্রায় একশো বছর আগে মটরবাবুর ঠাকুরদা বিশ্বনাথ চৌধুরী মহানন্দা নদীতে স্নান করার সময় নদীতে ভাসমান অবস্থায় এই মুখাটি পান এবং যত্ন করে বাড়িতে সেই কালীর মুখা আনলে দেবী তাঁকে রাতে স্বপ্নে দেখা দেন এবং বলেন যে তাঁর আরও দু-টি বোন আছে। সে সময় খোঁজ করে তাঁর ঠাকুরদা জানতে পারেন যে পুরাতন মালদহে ওই রকম আরও দু-টি কালীর মুখা আছে। বিষয়টি জানতে পেরে প্রতি বছর কালীপূজার সময় তাঁর ঠাকুরদা সেই বাড়িতে মুখা নিয়ে গিয়ে পূজা ও ছাগ বলি দেওয়াতেন। মটরবাবুর ঠাকুরদার পাওয়া সেই নিম কাঠের মুখোশটি এখনও পৌষানুক্রমে তাঁর বাড়ির সামনের কালীর বেদীর পূজামণ্ডপে পূজা করা হয়। জনৈক কালীর ভক্ত সেই সময় ওই কালীর মুখোশ পরে নাচতেন। অনুসন্ধানসাপেক্ষে জানা যায় যে মটরবাবুর ঠাকুরদার পাওয়া কালীমাতার দুই বোন পুরাতন মালদহে আছে বলে একটি প্রবাদ এখনও প্রচলিত আছে। একটি বোন তুঁতবাড়ির স্বর্ণকালী এবং আর একটি বোন কুট্টিপাড়ার বুড়াকালী। 'পুরাতন মালদহের গম্ভীরার শিল্পী গোষ্ঠীর' দল পরিচালক অরুণ বসাকের কাছে আমি এই তথ্য জানতে পারি। তবে এটা কতটা সত্য তা বলা কঠিন।

মটরবাবু বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এ গল্পটিও করেছেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মালদহের ভূমিপুত্র বিনয়কুমার সরকার সাধারণ মানুষের পাশে বসে মটরার গান শুনতেন এবং গর্ব করে বলতেন, 'মালদহ আমার জন্মভূমি, মালদহ গম্ভীরা গানের দেশ।'

শুধু তাই নয়, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে গান করার জন্য ১৯৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দে মটরবাবুকে মালদহ আদালতে ইংরেজ হাকিমের সামনে দাঁড় করিয়ে বলা হয়েছিল, স্বদেশী গান তিনি যেন আর না করেন। এধরনের বিশেষ বিশেষ গল্পগুলি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে মটরবাবু শুনিয়েছেন। জীবিতকালে মটরবাবু নির্মল দাস (নিরুদা) নামে একজন যোগ্য শিষ্য তৈরি করেছেন। যে শিল্পী মালদহের গম্ভীরার জগতে মহিলা চরিত্রের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করে বেশ সুনাম করেছেন। দুঃখের বিষয় এ শিল্পী সদ্য প্রয়াত হয়েছেন।

তাছাড়া সদ্য প্রয়াত মালদহের ভূমিপুত্র ডা. দেবপ্রসাদ সাটিয়ার চিকিৎসা পেশায় ও কথা সুর ও গায়ক শিল্পী হিসাবে মালদহের গম্ভীরা জগতে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন।

ডিগ্রিধারী ডাক্তার হয়েও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পরম পিতার আদেশ মেনে ফিজ না নিয়ে যেমন চিকিৎসা কার্য চালিয়ে গেছেন, ঠিক তেমনি গম্ভীরা আবহাওয়ায় পুরাতন মালদহে জন্মগ্রহণ করে মালদহের ক্ষয়িষ্ণু গম্ভীরার শিল্প ও সংস্কৃতিকে যতদূর সম্ভব রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠাবস্থায় তাঁর প্রথম গম্ভীরা সংগীত রচনা। পরবর্তীকালে মেডিকেল কলেজে ছাত্রাবস্থায় নিজেই গম্ভীরা সংগীত রচনা করে ও সংগীত পরিবেশন করে সকলকে এমন মুগ্ধ করেছেন যে, শেষ পর্যন্ত হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী ও ভূপেন হাজারিকার মতো স্বনামধন্য বিখ্যাত ও সংগীতশিল্পীরাও তাঁর গুণগান করতে কোনো দ্বিধা বোধ করেননি। তাঁর নিজের রচনা ও সুরের আটটি গানের সংকলনে 'নানাহে' গম্ভীরা গানের ক্যাসেটটি মালদহের মাটির সুরে গম্ভীরা সংগীতের অজস্র সম্ভার নিয়ে নানান ফুলের মালা গেঁথে শিল্পীমনের খোরাককে জাগিয়ে রেখেছে। তাই মালদহের গুণগ্রাহীদের কাছে এবং গম্ভীরা সংগীতের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

নিয়তির নির্মম পরিহাসে একের পর এক মালদহের স্বনামধন্য গম্ভীরা সংগীত রচয়িতা ও গায়ক শিল্পীরা প্রয়াত হতে চলেছেন। তাই তো মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে আইহোর গম্ভীরা কবি ইন্দ্রদমন শেঠ দুঃখ করে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, 'ভবিষ্যতে নূতন গায়কের জন্ম না হলে গায়কের অভবে হয়তো গম্ভীরা গান আর গাওয়ানোই হবে না।' মালদহের আনুষ্ঠানিক গম্ভীরা গান কয়েকটি অংশে বিভক্ত। যেমন মুখপাদ, শিববন্দনা, ডুয়েট বা দ্বৈত, চারইয়ারি, টনটিং, টপ্পা ঠুংরী, রিপোর্ট বা সালতামামি ও পালা গান। প্রাচীন গম্ভীরার লোকসংগীত লোকসংস্কৃতির ধারাকে বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামের লোকসংগীত বা আঞ্চলিক সংগীত আছে। লোকসংগীতের ভঙ্গির একটা স্বতন্ত্র মাধুর্য্য আছে। সেই উচ্চারণজনিত ভঙ্গির সামান্যতম বিকৃতি ঘটলেই রসহানি ঘটবে। ভঙ্গির সঙ্গে সুরের অলংকার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এই অলংকারগুলি আপনা থেকেই গায়ক-গায়িকাদের কণ্ঠে এসে যায়। শাস্ত্রীয় সংগীতের মতো রেওয়াজ করে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। মুলত এই সংগীতের দু-টি প্রকৃতি আছে–একটি ধর্মীয় (Religious) এবং অপরটি ধর্মনিরপেক্ষ (Secular)। বিভিন্ন দেশের লোকসংগীত বা আঞ্চলিক সংগীত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিচিতি লাভ করেছে। যেমন গম্ভীরা লোকসংগীত, গম্ভীরা, গাজন, সাহীযাত্রা, গামীরা কিংবা অন্য কোনো নামকরণে। লঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, মিশর ও অন্য স্থানেও গম্ভীরা সদৃশ উৎসব উদযাপনের ইতিহাসের বিবরণ পাওয়া যায়। অতীতে গম্ভীরা সংগীতে ব্যবহৃত হতো কেবলমাত্র ঢোলক ও জুরির।

পরবর্তীকালে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যেমন :

হারমোনিয়াম–১ জন
জুড়ি–২/৩ জন
ডুগি তবলা–১ জন
দোহার–২ থেকে ৫/৬ জন
বাঁশী–১ জন

মুখপাদ

শিববন্দনার আগে সাধারণত মুখপাদ হয়। মুখপাদে চরিত্রগুলি এক-একটি গান করে এসে তাদের পরিচয় দেয়। মুখপাদের দু-টি অংশ–প্রথম অংশকে বলে ধুয়া; দ্বিতীয় অংশকে বলে চিতানী। ধুয়াগান আড়াই ফেরের, চিতানী গান দুফেরের।

(কথা, সুর ও গায়ক শিল্পী পুরাটুলীর নানাহে গম্ভীরা দলের পরিচালক তপন হালদার, সহযোগী শিল্পী প্রবোধ দাস ও সুকুমার দাস, সহযোগিতায় প্রশান্ত শেঠ।)

১

হায় কি হল রে ও ওকি করবার, কি করি উপায়
পুলিশ এল, দোকান ভাঙলো, সংসার চালানো দায়।

২

আমি লোডশেডিং অফিসার, সাথে আছে দুজন হেল্পার
লোডশেডিং একই সঙ্গে থাকি তিনজনায়।

৩

হরির কৃপায় সংসার চালায়

-

হামি করি ছাতা পার্টি, বর্তমানে সবচেয়ে খাঁটি
যেদিকে জলের ছাঁট, ঘুরাই ছাতার বাঁট
এটায় হামার রাজনীতি।

শিববন্দনা

গম্ভীরা শৈবধারার লৌকিক উৎসব বলে গম্ভীরা সংগীতের প্রধান অংশটি শিববন্দনা দিয়ে শুরু। লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখায় বন্দনাসূচক পদে সরস্বতী ও অন্যান্য দেবতার কথা থাকে। কিন্তু মূলত গম্ভীরা সংগীতে একমাত্র বন্দনীয় দেবতা শিব। শিব ভগবান হলেও গম্ভীরায় আসেন সকলের আপনজন কৃষকরূপে বা মোড়লরূপে এবং নানাবিধ প্রশ্নে জর্জরিত হন। শিববন্দনার মধ্য দিয়েই গম্ভীরা গানের লিরিক আবেদন সর্বাধিক পরিস্ফুট। শিব হে– এই কথাটির সুর মালদহের গম্ভীরা গানের শাশ্বত ধ্রুবপদ। শিববন্দনার শুরুতে পূজামণ্ডপে একজন শিব সেজে সারা অঙ্গে ছাই মেখে ডান হাতে ত্রিশূল এবং বাম হাতে ডম্বুর ও মাথায় জটা ও গলায় সাপ জড়িয়ে গম্ভীরা পূজামণ্ডপের উৎসবানুষ্ঠানে উপস্থিত হন। সঙ্গে সঙ্গে আরও দু-তিন জন বিভিন্ন বেশ ধারণ করে হাজির হয়। এই তিনজনের মধ্যে একজন উচিত বক্তা পরনে মালকোচা ধুতি পরে এবং দুহাতের কব্জিতে ছেঁড়া ন্যাকড়া বেঁধে দেশের গরিব দুঃখীদের মনের কথা বা রাজনৈতিক বিষয়ক উচিত কথা শিবের কাছে উপস্থাপন করলে শিব সেই উচিত বাক্যের যথোপযুক্ত সদুত্তর বের করে উপস্থিত জনসমক্ষে প্রতিকারের আশ্বাস দিয়ে পূজামণ্ডপ থেকে অন্তর্হিত হন। এখানে '১৩৮১-৮২ বঙ্গাব্দের পুরানো ধানতলা গম্ভীরা দলের একটি গানের নমুনা সংকলন করা হলো যে সময় দেশের রাজনীতিতে দেখা দিয়েছিল ভীষণ অরাজকতা এবং ইন্দিরা গান্ধী বাক্‌স্বাধীনতা হরণ করার চেষ্টা করেছিলেন।

শিববন্দনা

সুধাকর দাস

(গায়ক: শ্রীদামচন্দ্রদাস, যশোদানন্দন দাস, ঠাকুরদাস দাস, উমাকান্ত দাস ও রাধাবিনোদ দাস।)

ধুয়া

তোমার দেখ্যা অনাচার অন্যায় ব্যাপার
নারায়ণ আবার জ্যাগেছে, দৌড়া আইনু হে তোমার কাছে
জীবকে কর উদ্ধার, যুগে যুগে অবতার–
পৃথিবীতে আবির্ভাব হয়্যাছে।

১

৭২-এ আসন পেলি ভালবাসার জোরে হে
সেই ভালবাসার মুখে লাথি (নানা হে)
দিলি আচ্ছা করে হে
লঙ্কায় গিয়্যা রাবণ বনলি, নিজে মজ্যা কুল মজালি
লিয়্যা পাপের বোঝা ঘাড়ে, দোষ দিচ্ছিস যারে তারে।
২৭০ বছর করলি শাসন, যখন তখন তুই করিস আস্ফালন (হে নানা)
সোনার লঙ্কার রাবণ রাজা, সংবংশেতে পেল সাজা
রামায়ণে প্রমাণ রয়্যাছে।

২

গরীবি হাটাও শ্লোগান তোমায় কেবল ফাঁকা আওয়াজ
গরীব হটেছে ধীরে ধীরে (নানা হে)
দেখতে কি পাও না আজ ওহে, দ্রব্য মূল্য আকাশ ছোঁয়া
বাজারে গিয়্যা দেখছি ধুয়া, ভ্যাজাল খ্যায়ে ঢেকুর চুঁয়া
গায়ে উঠ্যা গেল সব ধোঁয়া
ঔষধ খ্যায়া মানুষ মরে, কখনও কি দেখেছিস এ সংসারে (হে নানা)
এক খুনে আছে আইন, শত খুনে পায় জামিন
(তোদের) কুটুমতালি বুঝি আছে
গনতন্ত্রের ধারক তোরা বলিস গলার জোরে
গণতন্ত্রের টুটি টিপিস (নানা হে)

পরকে ফ্যাসিস্ট করেছে, সঙ্গে আছে পুলিশ বাহিনী,
মাস্তান চামচা অক্ষৌহিণী।
এদের ইঞ্জিন চালু রাখতে, চালান পাপের বোঝা ঢাকতে
যদুবংশের ফ্যাংকোস্টাইন্, কামড়াকামড়িতে হবি বিলীন (হে নানা)
যুবশক্তির সর্বনাশ, ক্ষমিবেনা ইতিহাস
ধিকি ধিকি জনরোষ ধুয়াছে।

ডুয়েট বা দ্বৈত

এ পর্যায়ে সাধারণত দু-টি চরিত্র থাকে। যাত্রায় অভিনয় করে পুরুষ ও মহিলা। কিন্তু গম্ভীরা সংগীতে পুরুষ স্বয়ং পুরুষের ভূমিকায় এবং স্ত্রীর ভূমিকায় পুরুষ স্ত্রী সেজে অভিনয় করে। দীর্ঘদিন এর কোনো পরিবর্তন দেখা না গেলেও পরবর্তীকালে দেখা গেছে।

এখানে ডুয়েট চরিত্রে স্বামী-স্ত্রীর একটি গম্ভীরা গানের নমুনা দেওয়া হলো। গম্ভীরা লোকসংগীত যেমন মালদহের মানুষের গর্ব, ঠিক তেমনি গম্ভীরা সংগীতে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও ঘৃণা করা মানুষের অভাবও নেই এই মালদায়। একশ্রেণীর শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষ তাদের জন্মগত অপরিপক্ক শিক্ষায় পরিপুষ্ট হয়ে গম্ভীরা সংগীতকে সমালোচনা করে হীনমানসিকতার পরিচয় দেয় এই ডুয়েট বা দ্বৈত গম্ভীরা সংগীতটি এরই একটি প্রতিচ্ছবি। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে শিল্পী। স্বামী গম্ভীরা শিল্পী আর স্ত্রী হচ্ছে আধুনিক অর্কেস্ট্রা শিল্পী। উভয় শিল্পীর নিজ নিজ সংগীতের প্রতি চরম ভালোবাসা। বর্তমান বাজারে অর্কেস্ট্রা বা এলিট সম্প্রদায়ের গানবাজনা যে লোকসংস্কৃতির দ্বারা সমৃদ্ধ তা অনেক বোদ্ধাও বোঝে না এবং স্বীকারও করে না। এই ডুয়েট গানটির বাস্তবায়িত রূপ গম্ভীরা সংগীতের এক নতুন আঙ্গিকের পরিচয় দেয়।

ডুয়েট বা দ্বৈত (স্বামী ও স্ত্রী)
(পুরাতন মালদহের 'লুব্ধক একটি সাংস্কৃতিক প্রয়াস গম্ভীরা দলের পরিচালক
বরিশঙ্কর ঘোষ এই সংগীতের কথা, সুর ও গায়ক শিল্পী)

১। **স্বামী :** আধুনিক যুগের নারী তোদের সেলাম, তোদের সেলাম,
তোরা মোদের পেয়ে সোজা, চাপিয়ে বোঝা করছিস গোলাম।
তোদের চাপে পুরুষ মোরা আধমরা হয়ে গেলাম।

২। স্ত্রী : হয়ে আধুনিকতার স্বামী থাকছ ওল্ড ফ্যাশান
মদ মাতালের সঙ্গে গাইছ গম্ভীরা গান
যার নাই কোনো সম্মান।
দেখ গাইছি আমি পপ ভাঙরা আর ডিস্কো বিটে
জনগণ মাতছে উঠে দিচ্ছে সম্মান, করছে সেলাম।

৩। স্বামী : দুদিনের বৈরাগী হয়ে ভাতকে বলিস অন্ন
তোদের ভাঙরা ডিসকো বেঁচে আছে লোকগীতির জন্য

তোরা সব হয়েছিস বন্য।
কবিগুরু আর সুভাষ চ্যাখে এ্যার সাঁস্, কর্য্যাছে নাম
মালদাকে দিয়েছে সম্মান, রেশম, গম্ভীরা আর ফজলী আম।

৪। স্ত্রী : এতই যখন গম্ভীরাকে নিয়ে করছ সাধনা
ইয়ং চাপ্‌রা কেন আর এগিয়ে আসে না।
তোমার কথা কিছু বুঝতে পারলাম না
অন্য দেশে লোকসংস্কৃতির আছে তরিজুত
গম্ভীরা নিয়ে কেউ ভাবে না সবাই শুধু রাজনীতির গোলাম।

চারইয়ারি

পালাবন্দি গম্ভীরা গান ব্যতিরেকে আর কোথাও চারজন শিল্পীর প্রয়োজন হয় না। এই চারজনের মধ্যে একজন দক্ষ অভিনেতা ও উচিত বক্তা। সে জনগণের প্রতিনিধি হয়ে স্পষ্ট বক্তার ভূমিকা গ্রহণ করে ও গম্ভীরা সংগীতের বক্তব্যের আসল রূপ ব্যাখ্যা করে এবং জনগণের মধ্যে উন্মাদনার সাড়া জাগিয়ে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। গম্ভীরা গানের চারইয়ারী অংশটির একটি ঐতিহ্যবাহী তাৎপর্য আছে। চারজন ইয়ার বন্ধুর সাহচর্যে রচিত বিচিত্র কৌতুকোচ্ছল রঙ্গচিত্র এটি। এর সন্ধান পাওয়া যায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা নাটকে, দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে 'চারইয়ারী পালা' প্রমুখ গ্রন্থে। বীরবলের চারইয়ারীর কথা আধুনিক দৃষ্টান্ত। চার বন্ধুর কল্পনা মনে হয় আরও প্রাচীন। রূপকথার রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র ও সদাগর পুত্র-এর মধ্যে প্রাচীন সূত্রটি পাওয়া যায়। এভাবে প্রাচীন নাট্য বা কাহিনী উপস্থাপনার রীতি গম্ভীরা সংগীত ছাড়া অন্য কোনো লোকসাহিত্যে বড়ো একটা দেখা যায় না। এটিও গম্ভীরার প্রাচীন কৌলিন্যের নিদর্শন।

তারাপদ সরকারের মটর স্মৃতি গম্ভীরা দলের পরিচালক সাহাপুরের তারাপদ সরকারের (মণ্ডল) একটি গম্ভীরা সংগীতের নমুনা এখানে সংকলন করা হলো।

চারইয়ারি

তারাপদ সরকার (মণ্ডল)

(কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের ওপর গম্ভীরা সংগীত)

১

বাজপেয়ী

ভারতের অংশ কাশ্মীরে, উগ্রপন্থিরা প্রবেশ করে,
নিরীহ মানুষ মারে। তারা যদি না যায় সরে
পাকিস্তানের সঙ্গে আর কোন কথা নয়।

২

জর্জ বুশ

পৃথিবী থেকে জঙ্গি আমি খতম করতে চাই

৩

মুশারফ

ভারত শান্তির তরে দিক কাশ্মীর ছেড়ে

৪

বক্তা

যাকে ধরে ভাই মরণজ্বরে, জ্বরের ধুনে ল্যাপ কাঁথা ছিড়ে
ওঝার বাপ্‌কী করবে যদি মাথায় তাল ছোবল মারে।

১

বাজপেয়ী

প্রতিবেশী ভাই বলে, থাকব দুদেশ মিলে জুলে
ভারত হতে বাস্ আমি পাঠাই লাহোরে।

২

জর্জ বুশ

আফগান যেন লাদেনকে দেয়, আমার হাতে তুলে

৩

মুশারফ

ভারত হক না ছাড়ে নিব গায়ের জোরে

৪

বক্তা

কুকুরের লেজ সোজা কি হয় সোয়া মন তেলে
ছুঁচোর গায়ের গন্ধ কি যায়, গোলাপ আতর ঢেলে।
অঙ্কুরেতে চলে হাতি, ঢেঁকি চলে মারলে লাথি
গো-গর্ধব লাঠির প্রহারে, কুকুর জব্দ হয় মুগুরে
এখনও সময় আছে, নেনা বেছে
চনটিং ভারত নির্দেশিত পথ, তা না হলে খারাপ তোর বরাত।

টনটিংকে গ্রাম্য ভাষায় কুচ্চা বলে। এই শব্দটি কুৎসার অপভ্রংশ। কুচ্চা আসলে নিন্দাসূচক শব্দ হলেও কেউ যদি প্রশংসাসূচক কাজ কর্মের ব্যাপারে জড়িত থাকে তাহলে টনটিং গানের মাধ্যমে প্রশংসিত হয়। আবার কেউ নিন্দাসূচক কাজ করলে তাকেও নিন্দাসূচক গানের মাধ্যমেই টনটিং করা হয়। এখানে টনটিং পর্যায়ে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ভারতীয় নাগরিকের মুশারফের উদ্দেশ্যে ফুলবাড়ি গম্ভীরা দলের পরিচালক অসীম রায়ের রচিত একটি গম্ভীরা সংগীতের সংকলন করা হলো।

টনটিং

অসীম রায়

খোদা তুমি মেহেরবান যে আল্লা সেই ভগবান
বিভেদ করিস না আর ভারত পাকিস্তান।
গুলিগোলা চালিয়ে ভারতকে করলি অপমান
তোরা করিস হালাকান।

১

ভারতের বিরুদ্ধে কত দিলি যে ভাষণ
আগে নিজের দেশকে সামলা করে তুই শাসন
সীমান্তে গুলি চালাবি, কাশ্মীরকে দখল কর‍্যা আনবি
কাশ্মীর ছিল কি তোদের বাপের জন্মস্থান।

২

ভারতকে তোরা দুর্বল করিস না
আরে কারগিল থ্যাকা হটিয়েলে সেনা
কুবুদ্ধি করে গেলি চীনে, হুংকার দিচ্ছে মার্কিনে
তোদের কূটনৈতিক চাল হয়্যাছে প্রমাণ।

৩

তোদের ফুরিয়ে এ্যালো দিন, ঘনিয়ে বসেছে দুর্দিন,
লাগিস না ভারতের সাথে, মরবি তোরা বোমার আঘাতে
সেই আঘাতে দখল করব পাকিস্তান
খোদা তুমি মেহেরবান।

টপ্পা-ঠুংরী

টপ্পা-ঠুংরী হালকা চালের গান। এতে যে ধ্রুপদী সংগীতের ঢং, তা প্রত্যাশিত গম্ভীরায় থাকে না। তরল প্রণয় কাহিনী বা শ্রুতি সুখকর সরস নিন্দা-কুৎসাই এর মূল অবলম্বন এবং মোটা রেখায় তা বর্ণিত হয়। দেবী বিষয়ক, সখী সংবাদ, বিরহ ও খেউর, কবিগানের এই চতুরঙ্গের মধ্যে খেউরের আদলে গম্ভীরার টপ্পা-ঠুংরী রচিত।

টুপ্পা-ঠুংরী
বীরেন্দ্রনাথ বর্মন

(কথা, সুর ও গায়ক শিল্পী জোতের প্রয়াত বীরেন্দ্রনাথ বর্মন। সে আমার বিদ্যালয় জীবনের বন্ধু। জোত গম্ভীরানুষ্ঠানে সে নিজেই তার সহযোগী সুনীল দাসকে নিয়ে বড়ো তামাশার দিনে এই গম্ভীরা সংগীতটি গাইত।)

১। আর একনা কথা শুন্যা যাও ভোলা–
তুমি আসছো দৌড়া ষাড়ে চড়্যা (দাদারে)
একদিনেতে কলা খাও ভোলা।

২। পিন্যা ডোরাকাটা বাঘের ছাল
মাথায় ব্যান্যাছো জটার জাল
তোমার গলার সাপ্‌টা, আলাদ ভ্যাপ্‌টা (দাদারে)
বড়ো তামশায় রঙ লাগাও ভোলা। আর একনা...

৩। পড়্যাদুই হুলুম মুখার তালে
ভীমরতি ধর্যাছে কালে কালে
তুমি খসম্‌ ম্যাখ্যা ভাকম ধর্যা (দাদাররে)
মুখেতে ভ্যাক্‌ ভ্যাকম্‌ বাজাও ভোলা। আর একনা ....

৪। তোমার কত্ত যে কুভ্‌রা যত মণ্ডামিঠাই প্যাড়া
তুমি মা জহরার ভোগের প্রসাদ (দাদারে)
পাত্তা চ্যাটা চুটটা খাও ভোলা। আর একনা....

৫। অ্যালো ভীষণ কলিকাল, গম্ভীরার হায়রে একি হাল
তোমার বেশতো মজা-টানা গাঁজা (দাদারে)
সদুলাপুরের মোশাল বেড়াও ভোলা। আর একনা ...

৬। ভাষাভূষির বাঁচাও অন্ধকার
শিক্ষা দাও লেখা আর পড়ায়
আর জন্ম বাড়ন্ত কর খান্ত (দাদারে)
এদেরকে সুমতি দাও ভোলা।

৭। শোন ভোলা মহেশ্বর, উঠিয়া ত্রিশুলটা ধর
বলি ওহে হর উপায় কর একবার
গুরুজনের মান বাঁচাও ভোলা। আর একনা....

রিপোর্ট বা সালতামামী

সংবৎসরের সংঘটিত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সরস আলেখ্য এই রিপোর্ট। বন্দনা ও চারইয়ারিতে সূক্ষ্মভাবে সমস্যার ইঙ্গিত থাকে কিন্তু সালতামামী অংশে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা, ভালো-মন্দ উভয় দিকেই বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে বিস্তৃত করা হয়। ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে এই অংশ প্রভূত মূল্যবান।

রিপোর্ট বা সালতামামী

তপন হালদার

(সহযোগী শিল্পী প্রবোধ দাস ও সুকুমার দাস, সহযোগিতায় প্রশান্ত শেঠ)

নানা আর কুলিয়ে উঠতে পারি না–না–না
যা পড়েছে দিন-কাল সবই অকাল
তেল কিনতে নূন জুটে না–না–না

১। বক রকম গানের নেশায়
মজে গেছে সার দেশটায়
অনুষ্ঠান পূজা প্যান্ডেলে
মাইকে একই গানে চলে
এই গানের ইশারায় ডাকে
প্রেমিকার আছে এমন বহুজনা–না–না

২। নিরক্ষরতার অন্ধকার, ঘুচাবে মোদের সরকার,
রাত করে যাচ্চে বুড়াবুড়ি, ছাত্রকে মাস্টার খাওয়াচ্ছে বিড়ি
আর পড়া না পারলে বৌ কান মল্‌লে
মুখ দেখানো যাবে না–না–না

৩। এক্সেচেঞ্জের অসীম দয়ায়, মারা মানুষ চাকুরির কল পায়
বারো বছর কার্ড হল না রেণু
অফিস থেকে পাঠালো ইনটারভিউ
এসব দেখেশুনে মনে হচ্ছে, জীবন বুঝি রাখবো না–না–না

৪। শহরে সাট্টার ভর নেমেছে, মাইয়াদের ভালই হয়েছে
ছোরার টার্গেট নিয়ে সদায় ব্যস্ত
ছুরির দিকে তাকায় না–না
এ পর্যন্ত বলে হলাম শান্ত
ত্রুটি মার্জনা মাপ করবেন, না–না

পালা গান

মুখ্যত সমকালীন কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে পালা রচিত হয়। পূর্বে অঞ্চলের বা গ্রামের কোনো বিষয় নিয়ে পালা রচিত হতো, এখন তা সর্বভারতীয় সমস্যা বর্ণনায় বিস্তৃত হয়েছে। কোনো বাঁধা সংলাপ থাকে না। চরিত্রোচিত বিশেষ সাজসজ্জা বা মেক-আপ করে গম্ভীরার আসরে ভাবানুযায়ী সংলাপ নিজেরাই বানিয়ে বলে অভিনেতারা। সরস, বুদ্ধি, সাহস, দক্ষতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব–এসব গুণ গম্ভীরা অভিনেতাদের স্বাভাবিক সম্পদ। নাচে বা স্ত্রীর ভূমিকায় এখনও পুরুষেরাই অংশগ্রহণ করে। গম্ভীরা গানে পালাকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে গাওয়া চলে, যেমন বন্দনা,

চারইয়ারি, টপ্পা-ঠুংরী এবং রিপোর্ট। আলকাপের পালা গানের জনপ্রিয়তার জন্য পরবর্তীকালে গম্ভীরা গানে পালা গানকে যুক্ত করা হয়েছে।

আলকাপ দলের গঠন, উত্থান, পতন সবই হয় এক খলিফাকে কেন্দ্র করে। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য খলিফা হচ্ছে মালদহের রঘু খলিফা, হাফ খলিফা, সফর্দি খলিফা, মহীলাল, দুঃখু খলিফা, সোহরাব খলিফা, মুর্শিদাবাদের মহতাব খলিফা, কাসেম মিঞা, গোপাল দাস খলিফা ও সুধীর দাস খলিফা প্রমুখ। নানা পর্যায়ের আলকাপ গান আছে। তার মধ্যে একটি আলকাপ গানের নমুনা এখানে দেওয়া হলো।

'পান দিলাম, সুপারি দিলাম তুমি যাবার কালে
পরাণ বান্ধিয়া দিলাম পরাণের জালে
জল শীতল, বাতাস শীতল, শীতল নারীর মন
তবু কেন জ্বলে মরে আমার যৌবন।
দূর দেশে চাকরি কর বিদেশে গিয়া
চিঠি দেও না, পত্র দেও না মরি জ্বলিয়া।
পান দিলাম, সুপারি দিলাম তুমি যাবার কালে
পরাণ বান্ধিয়া দিলাম, পরাণেরি জালে।'

সূত্র সহায়তা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলার লোকসাহিত্য গ্রন্থ।
২। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গের লোকজীবনে লোকসংস্কৃতি গ্রন্থ।
৩। ড. হরিপদ চক্রবর্তীর মালদহের গম্ভীরা ও আলকাপ (মধুপর্ণী শারদীয়া ১৩৯২)।
৪। ড. প্রদ্যোত ঘোষের লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা গ্রন্থ।

গম্ভীরার অতীত ও বর্তমান বইওয়ালা, কলকাতা ২০০৭

গম্ভীরা গান

ড. মোমেন চৌধুরী

আমি আর লিচু। আলকাপ আর গম্ভীরা–এছাড়া রাজশাহীকে কল্পনাই করা যায় না। আলকাপ ছাড়া আর তিনটি এখনো তাদের আকর্ষণীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আলকাপের একটা সুসময় ছিল। রুচি বদলের ফলে তার আগের সেই দাপট নেই। গম্ভীরা লোকসংগীতের অন্তর্গত। তার আচারগত দিকটি রাজশাহী ও নবাবগঞ্জে অনুপস্থিত। মূলত নবাবগঞ্জ এক সময় মালদহের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সেই কারণে মালদহ গম্ভীরার উৎপত্তি স্থল ও লালনভূমি হিসাবে স্বীকৃত।

আমরা গম্ভীরার যে পরিচয়টুকু এখন পেয়ে থাকি, তা হলো গম্ভীরা 'বর্ষ বিবরণী গীত'। এর আচারগত দিক বাদ দিলে এই দাঁড়ায়। 'গম্ভীরা' শব্দের উৎপত্তি, এর আনুষ্ঠানিক রূপ কখন থেকে শুরু হলো–এ সব বিষয় সম্পর্কে একটি ধারণা নেয়া যেতে পারে।

'গম্ভীরা' শব্দ গঠিত হয়েছে সংস্কৃত 'গম' ধাতুর সঙ্গে 'ঈর' প্রত্যয় যোগে। এর অর্থ 'শিব বিষয়ক বন্দনা'। শিবের আর এক নাম 'গম্ভীর'। মালদহে 'গম্ভীরা' বা গম্ভীরা নন্দ–শিবের নাম হিসেবে পরিচিত। এখানে ব্যক্তির নামের পরে 'ইয়া' অথবা 'আ' কারের বহুল প্রচলন আছে বলে শ্রীসাধনকুমার রক্ষিতের "লোকগীতি গম্ভীরা" প্রবন্ধ থেকে জানা যায়। কিন্তু গম্ভীরার সংস্কৃতে রূপান্তরের আগে 'গামীর' ও 'গামারা'–এই দু'টি শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। এই দুটির কোনো একটি শব্দ থেকে 'গম্ভীরা' শব্দের বর্তমান রূপ লাভ করেছে বলে বিশেষজ্ঞদের মত। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ প্রয়াত ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, "উত্তর বাংলার লোক-সংস্কৃতির উপকরণ সাধারণত : উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে প্রসার লাভ করিয়াছে। লৌকিক শিব ধর্মের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিলে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং গম্ভীরা শব্দটিই ক্রমে সংস্কৃত প্রভাবের বশবর্তী হইয়া গম্ভীরায় পরিণত হইয়া থাকিবে, গম্ভীর হইতে গম্ভীরার উৎপত্তি হয় নাই, তাহা সত্য। যে কোনো বিষয় লইয়া গম্ভীরা গান রচিত হইতে পারে। চৈত্র সংক্রান্তির সময় কয়েক দিন এই গান হয়। একটি শিবমূর্তি স্থাপন করিবার রীতি আছে। তবে গানে তাহাকে উদ্দেশ্য করা হয় না।" উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে বিশেষত কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় কোচ ও রাজবংশীদের মধ্যে 'গম্ভীরা' নামের এক ধরনের লোকসঙ্গীতের প্রচলন দেখা যায়।৩ অপর মতটি ড. প্রদ্যোৎ ঘোষের। তিনি অনুমান করেছেন 'গামারী' শব্দ থেকে গম্ভীরা এসেছে। তিনি মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্য থেকে শব্দটি উদ্ধার করে এর সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, তা হলো, "রাজবংশীরা ধর্ম ঠাকুরের যে পূজা করে (সূর্য পূজা) তাতে গামার কাঠের যে পিঁড়ি বা দোলা ব্যবহৃত হয়, অনেক সময় সেই পিঁড়িকেই ধর্ম বলে পূজা করা হতো। সুতরাং সেই কারণে, গম্ভার

বা গামার থেকে 'গম্ভীরা'র উদ্ভব হয়েছে বলে অনুমান করা যেতে পারে।[৪] তরুণ গবেষক তাসাদ্দক আহমদ এই মত সমর্থন করেন বলে মনে হয়।[৫] একটি বিষয় লক্ষণীয়, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং ড. প্রদ্যোৎ ঘোষ উভয়ে রাজবংশীদের ভেতর থেকেই গম্ভীরা শব্দের উৎস নির্ণয়ের প্রয়াস করেছেন। শিব এবং ধর্মের বিষয়টি উভয় ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে এসেছে। আমরা মনে করি, 'গামীর' থেকেই 'গম্ভীরা' শব্দ এসেছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'গম্ভীরা' শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, যার সঙ্গে শিবের সম্পর্কটি অনুপস্থিত। "আদ্যের গম্ভীরা"–সম্পর্কযুক্ত হলেও কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ তা স্বীকার করেন নি। চৈতন্য চরিতামৃতে যে 'গম্ভীরা'র ব্যবহার দেখা যায়, তার অর্থ কক্ষ বা প্রকোষ্ঠ। মন্দির ও মণ্ডপ অর্থেও গম্ভীরার ব্যবহার আছে। সুতরাং গম্ভীরা শব্দের ব্যবহার বহু আগে থেকে প্রচলিত থাকলেও বর্তমান অর্থে প্রযোজ্য নয়।

'গম্ভীরা' কত আগে থেকে চলে আসছে, এ সম্পর্কে সবাই একমত নন। সুকুমার রায়ের মতে, "সেন রাজাদের প্রধান অবলম্বন ছিল শিবধর্ম। গম্ভীরা গানের উৎপত্তি সেন রাজাদের সময়ে। সপ্তদশ শতকে কাশ্মীরের কবি-ঐতিহাসিক কল্হন তাঁর গ্রন্থ রাজতরঙ্গিনীতে গৌড় দেশে গম্ভীরার অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন। সেই সময় থেকে শিবের প্রভাব নানাভাবেই বিস্তৃত হয়। পরবর্তীকালে যখন কৃষ্ণ দেবতারূপে প্রধান হয়ে দাঁড়ান, শিব খানিকটা পিছিয়ে যান। কিন্তু গম্ভীরা, গাজন প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি তখন থেকেই চাষী জীবনের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচারিত।"[৬] আতাউর রহমান মনে করেন, "পুরাকালে প্রাচীন গৌড় ভূমিতে পূর্ণবংশের বহু লোক বাস করতেন। তাঁরা প্রত্যেকেই শিব পূজা করতেন। শশাঙ্ক, হর্ষবর্ধন, পালবংশের রাজগণ ও সেন বংশের রাজগণ সকলেই শিব পূজা করতেন। গুপ্ত যুগে যদিও কেউ কেউ মাঝে মাঝে ব্রহ্মার পূজা করেছেন তথাপি শিব ও বিষ্ণু পূজাই ছিল প্রধান। তখনকার দিনে হিন্দু রাজগণের বিশ্বাস ছিল–

যাঁরা করেন শিবের পূজা
তাঁদের পুত্র হয় রাজা।

সুতরাং শিবপূজার সময় মন্দিরে মহাদেব বসে থাকতেন স্তিমিত নয়নে। আর তাঁকে উপলক্ষ করে পূজা অন্তে গাওয়া হতো এই গম্ভীরা গান।"[৭] সাধনকুমার রক্ষিত লিখেছেন, "কারো কারো মতে, গম্ভীরা বৌদ্ধ সংস্কৃতির অংশবিশেষ। তিব্বত দেশ থেকে মালদহে আসে... এবং পাল আমলে শৈব ধর্মের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটে গম্ভীরার সৃষ্টি হয়। তখন এটাকে বলা হতো 'আদ্যের গম্ভীরা' ['আদ্য অর্থ শিব। 'আদ্যের গম্ভীরা' অর্থাৎ 'শিবের গম্ভীরা']। 'আদ্যের গম্ভীরার প্রথম গবেষক এবং লেখক হরিদাস পণ্ডিতের ভাষায়–'রামাই, আদ্যা বা দুর্গাদেবীকে জবা ফুলের মালা গলায় দিয়ে তাঁহার সম্মুখে ছাগাদি বলি প্রদান করিয়াছে। সুতরাং রামাই পণ্ডিতের সময় পাল রাজশাসনে বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজা হিন্দু শিবপূজায় পরিণত হইয়া গিয়াছিল। ... তখন হইতে ধর্মের গাজন ও আদ্যের গম্ভীরা বা আধুনিককালের গম্ভীরার সৃষ্টি হইল।' কোন কোন গবেষক মনে করেন, চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ পৌণ্ড্রবর্ধন এসেছিলেন নদী পথে, তাঁর সেকালের বিবরণী থেকে মালদহের গম্ভীরার অন্যতম অংশ মুখোশ নৃত্যের সাদৃশ্য ধরা পড়ে। তবে কি হর্ষবর্ধনের আমলে গম্ভীরার প্রচলন ছিল?"[৮] এইসব উদ্ধৃতি থেকে আমরা এর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে একটি

সিদ্ধান্তে আসতে পারি। গম্ভীরায় ধর্ম ও আচারগত ক্রিয়াদি পালিত হতো। শৈবদের উপাস্য দেবতা ছিলেন শিব। কোচ ও রাজবংশীরা ধর্মেরও পূজা করতেন। শিব ও ধর্ম-এর মিশ্ররূপ–গম্ভীরা। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় শিবের গম্ভীরা নাম আমরা কেবল রাঢ় ও গৌড় অঞ্চলের কয়েকটি সীমিত স্থানে পাই। অন্যত্র এই নাম পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে গভীর গবেষণা হলে সঠিক উত্তর পাওয়া যেতে পারে। আর একটি বিষয় সুকুমার রায়-এর উদ্ধৃতাংশে পাওয়া যায়, চাষীদের ভেতরে গম্ভীরা, গাজনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর প্রচার। গম্ভীরা মূলত এইসব চাষিদেরই উৎসব। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শিবের কোচনীপাড়ায় যাতায়াত এবং চাষাবাদের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

গম্ভীরার একটি ধর্মীয় দিক আছে, যা মালদহে আজো উদ্‌যাপিত হয়। কেবল লৌকিক দিকটিই পালিত হয় নবাবগঞ্জ তথা রাজশাহী অঞ্চলে। "চৈত্র মাসের পাঁচদিন থাকতে গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়। আষাঢ় মাস পর্যন্ত গম্ভীরা গান গাওয়া হতো বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন মণ্ডপে মণ্ডপে। সেদিন ঐ গ্রামের দূরদেশী আত্মীয়স্বজনরা পর্যন্ত নিমন্ত্রিত হতেন। চৈত্র মাসের অনুষ্ঠানের সময় বাড়িতে দুর্গা পূজার মতো নতুন খাবার-দাবার এবং ছেলেমেয়েদের নতুনজামা-কাপড় তৈরি করা হতো। এ ব্যাপারে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরাও পিছিয়ে থাকতেন না। মণ্ডপ তথা গম্ভীরা বেলোয়ারি ঝাড় দেওয়ালগির, আয়না-লণ্ঠন,রঙিন কাগজের মালা, শোলা দিয়ে বিভিন্ন ফুল-পাখি মাটির তৈরি পরী দিয়ে সাজানো হতো। কারু কাজ করা চাঁদোয়ার নিচে সদ্য পুকুর থেকে তোলা প্রস্ফুটিত পদ্মফুল ঝোলান হতো। তারপর 'রামকেলী' কাপড়ের উপর [এক বিশেষ ধরনের গৈরিক বস্ত্র] মাটির প্রলেপ দিয়ে তাতে ফুলপাতা, জন্তু জানোয়ারের ছবি আঁকিয়ে ঝালরের মতো টাঙ্গানো থাকতো। মণ্ডপটার চারিধার শিকের জাফরি দিয়ে ঘেরা থাকতো... তখন দলকে ৫–১০ টাকা রাহা খরচ দেওয়া হতো মাত্র। প্রয়োজন অনুসারে পোশাক থাকতো। পুরুষরাই 'কেশী' দিয়ে (পরচুলা) নারী সাজতো। ঢাক,হারমোনিয়াম, বাঁশি, করতাল, তবলা, ঢোল [হাতে বাজানো], মিরাকল এসব ব্যবহার হতো। শিবের গাজনকে উপলক্ষ করে এই উৎসব হয়ে থাকে। গম্ভীরার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পুণ্ডরিক সম্প্রদায়ের মানুষেরা। আম ও রেশম কারবারের ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা গম্ভীরার গান ও মুখোশ নৃত্য করতেন। তাঁদের মধ্য থেকেই ভালো ঢাকি কিংবা বায়েন দেখা যেতো। গম্ভীরা আনুষ্ঠানিকভাবে চারদিনের উৎসব–চারটি নামে চিহ্নিত–(১) ঘটভরা, (২) ছোট তামাশা, (৩) বড় তামাশা, (৪) বোলাই বা বোলবাহী। ঘটভরা, বড় তামাশা, ছোট তামাশা মূলত নৃত্য বিষয়ক। বোলাই বা বোলবাহী–এটাকেই আমরা 'গম্ভীরা' গান হিসেবে চিহ্নিত করি। এই গম্ভীরা গান আবার চারটি পর্যায়ে গীত হয়–(১) মুখপাত, প্রস্তাবনা বা বন্দনা, (২) দ্বৈত বা ডুয়েট গান, (৩) চার-ইয়ারী, (৪) খবর বা রিপোর্ট।"[৯]

ডক্টর পল্লব সেনগুপ্তের মতে, গম্ভীরা চৈত্র সংক্রান্তির চারদিন আগে থেকেই সচরাচর শুরু হলেও বছরের অন্যান্য সময়ও এ উৎসব পালনের খবর পাওয়া যায় কখনো কখনো। তিনি চারদিনের বর্ণনা দিয়েছেন এবং এর নৃতাত্ত্বিক দিকটিও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বর্ণনা নিম্নরূপ–

"এই উৎসবের প্রথম দিনে ঘটে জলভরার ব্যাপারটিই মুখ্য। কোনো মাতৃদেবতা এই উৎসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত না থাকায়, এই বিষয়টি যথেষ্ট কৌতুহলোদ্দীপক। পরের দিনের উৎসব 'ছোট তামাশা'য় এক পায়ে লাফিয়ে শিব-বন্দনা করার রীতিটিকে প্রাচীন জাদুক্রিয়ার জাতক বলে ধরতে পারেন। তৃতীয় দিনের 'বড় তামামা'য় মুখোশ পরে নাচই মুখ্য–তারও অবলীন উদ্দেশ্য জাদুক্রিয়া। ঐদিনের আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আচার আছে, যেমন : ফুলভাঙা; কন্টিকারী/কণ্টকী গাছ আর সিদ্ধির গাছ বুকে নিয়ে ভক্তাদের নাচের পর সেগুলি মূল ভক্তার কাছে গচ্ছিত রেখে আবার খানিক পরে মুখোশ (এমন কি মড়ার খুলিও) মুখে বেঁধে ওগুলিকে ফেরত নিয়ে আবার নাচ হয় এই আচার পালনের সময়। চতুর্থ দিনের উৎসবের শুরু মশাল নাচে–বিকট-দর্শন প্রেতিনীর সাজে উদ্দাম এই নৃত্যও প্রেতাত্মা ও জাদুতে বিশ্বাসের লব্ধফল।'মাশান' নামে এক প্রেতের অস্তিত্ব স্থায়ী অধিবাসীদের সংস্কারে আছে– এই নাচ তারই ধারানুসঙ্গবাহী অবশ্যই। ঐ দিন এর পরে, কচি বাঁশের গায়ে গর্ভমোচা, আম, বেল এবং নানারকম শস্য বেঁধে সেটিকে দেবতাজ্ঞানে পূজার পর সার্বজনীন ভোজ হয়; সেই অনুষ্ঠানের নাম আহারা বা বোলবাই। ঐ দিন সন্ধ্যায় নতুন গর্ত খুঁড়ে জলে ভরপুর করে তার মধ্যে একটি জীয়ন্ত শোলমাছ ছাড়া হতো এককালে। এখন এ প্রথা অবলুপ্তির মুখে কোনো অজ্ঞাত কারণে। গর্তের দু'দিক বোলবাইয়ের দু'টি বাঁশ গুণচিহ্নের মতো করে বেঁধে পোঁতা হতো এবং ঐ কণ্টিকারী কণ্টকী গাছ ও সিদ্ধিগাছের 'ফুল'গুলি তার ওপর রেখে ধুলোর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে, ভক্তরা আড়াআড়ি বাঁশে পা ঝুলিয়ে সাতবার দোলেন। এর নাম ছিল আগুন ঝাঁকা বা পাটভাঙা। এও. জাদুক্রিয়া অবশ্যই। আরেকটি বিলুপ্ত প্রথাও হদিস দিয়েছেন প্রদ্যোৎ ঘোষ: ঢেকি চুমানো। ঢেঁকির গায়ে সিঁদুব মাখিয়ে তার উপর একজন নারদ সেজে বসলে, সবাই মিলে নারদশুদ্ধ ঢেঁকিটিকে গম্ভীরার প্রাঙ্গণে রেখে দেন। পরদিন চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব সাঙ্গ হলে গম্ভীরা পার্বণেরও সমাপ্তি।

গম্ভীরার সমস্ত উৎসবটির মধ্যেই বহু আদিম এবং আপাত-অবোধ্য প্রথার অবশেষ প্রবলভাবেই নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয়। ঘটে জলভরা এবং গর্তে মাছ ছাড়া অবশ্যই মাতৃকাতন্ত্রের তথা উর্বরতাতন্ত্রের স্মৃতিবাহী। ঘটভর্তি জলের তাৎপর্য গর্ভবর্তী নারীর দ্যোতক; গর্তের জলে মাছ ছাড়া এক ধরনের যৌন প্রতীক। ঢেঁকির আবির্ভাবও শস্যভাবনাকেই সূচিত করে। কচি বাঁশ, গর্ভমোচা, আম, বেল, শস্য–সবই ঐ উর্বরতাতন্ত্রের সূচক। আবার কাঁটাগাছ, সিদ্ধিগাছ, মুখোশ, মড়ার খুলি, প্রেতিনী সাজা–এসব হলো আদিমকালের উত্তরাধিকার স্বরূপ ভূতপ্রেতে প্রত্যয়। এক পায়ে লাফানো, মুখোশ নাচ, বাঁশে পা ঝুলিয়ে আগুণের ওপর দোল খাওয়া–ইত্যাদি জাদুপ্রক্রিয়া কালপরম্পরায় নানা প্রত্যাশায় সন্নিবিষ্ট হযে থাকতে পারে গম্ভীরার মধ্যে। এখন বিচিত্র সব আদিমতার সঙ্গে গম্ভীরার গানের মাধ্যমে যে আধুনিক গণসংযোগী মনের সমন্বয় ঘটে এই উৎসবে, তার জন্য একে একটি অন্যরহিত লৌকিক পার্বণ বলতে পারি অবশ্যই।"[১০]

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর এই বর্ণনা ও বিশ্লেষণে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। অনুষ্ঠানটি একান্তভাবেই তাদের যারা কৃষির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

গম্ভীরা মুখোশ-নৃত্যের বিষয়টি বিস্তারিতভবে আলোচনা করেছেন ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য। মুখোশ-নৃত্য মালদহ জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আলোচনায় তিনি ছৌনাচ প্রসঙ্গটি এনেছেন। গম্ভীরার আচার-নৃত্য এটি। ডক্টর ভট্টাচার্যের বর্ণনা অনুযায়ী–

"ছৌ ও গম্ভীরা দুই-ই বাংলার বাৎসরিক লৌকিক সূর্যোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই তার তারিখ বাংলা বছরের শেষ দিন। সেদিন সাধারণত ইংরেজি মতে প্রায় প্রতি বছরই ১৩ই এপ্রিল পড়ে। উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণত এই নৃত্য পরবর্তী জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৩ তারিখ পর্যন্ত চলতে পারে। ঐ তারিখে বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী অক্ষয় তৃতীয়া নামে একটি পূণ্যতিথি থাকে। সুতরাং দেড়মাসকাল এই যাবত এই উভয় নৃত্যই চলতে পারে। এই তারিখের পরেই বাঙালি কৃষকের বীজ বপনের সময় এসে যায়। সুতরাং দেখা যাবে যে এই দু'টি অনুষ্ঠানই–ছৌ এবং গম্ভীরা-বাঙালি কৃষকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের অন্তর্নির্বিষ্ট।[১১]"

গম্ভীরা নৃত্যে যে মুখোশ পরা হয়, তা এক বিশেষ কাঠের তৈরি। যে কাঠ ধর্মের দিক থেকে পবিত্র মনে করা হয়। এগুলো ওজনে বেশ ভারী এবং নৃত্যের অনুষ্ঠান যদি দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে, তবে ততক্ষণ মুখে পরে রাখা বেশ কষ্টকর। গম্ভীরা নৃত্যে কোনো ধারাবাহিক কাহিনী নেই। ছৌ-নাচে যেমন আছে। কেবল কোনো কোনো পৌরাণিক চরিত্র যেমন কালী, নারসিংহী ইত্যাদির একক নৃত্যেরই অনুষ্ঠান হয়, নৃত্যের সঙ্গে উচ্চস্বরে ঢাক বাজতে থাকে। মনে করা হয় যে, নৃত্যকালে নৃত্যকারী তার নিজস্ব মানবিক-চেতনা হারিয়ে ফেলে এবং এক 'দিব্য' চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। এই অবস্থায় নৃত্যকারী মাঝে মাঝে উম্মাদের মতো হয়ে যায়। সেই জন্য নৃত্যের আর তাল থাকে না। যদিও ছৌ নৃত্যও আচারমূলক তথাপি তার নৃত্যকারী এমন দিব্য উম্মাদনা দ্বারা কখনো উদ্বুদ্ধ হয় না।

গম্ভীরার এই ধর্মীয় এবং আচারগত দিকের প্রথা এখনো পশ্চিমবঙ্গের মালদহে প্রচলিত। রাজশাহী ও নবাবগঞ্জে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। গম্ভীরার লোকসঙ্গীতের ধারাটিই এখানে বর্তমান। মালদহেও এর চর্চা অব্যাহত আছে। 'সালতামামী'ই এর প্রধান উদ্দেশ্য বলে শিবকে সামনে রেখে বৈশাখ মাসব্যাপী সমালোচনামূলক গম্ভীরা গান চলতো। এসব গানে 'তোলা'কে সম্বোধন করে গায়েনরা সমাজের সুখ-দুঃখের চিত্র সকলের কাছে তুলে ধরেন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে–

"মুসলমানেরা মনে করেন 'ভোলা' শিব 'ভোলানাথ' নয়। তাঁদের মতে যে লোক সব কিছু ভুলে গিয়ে কর্তব্যকর্মে অবহেলা করে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়েছে, সেই ব্যক্তিই 'ভোলা'। তাঁরা আরো বলেন, 'গম্ভীরা' হচ্ছে আগত সালে বিগত বছরের দুঃখ-দুর্দশার পুনরুক্তি বন্ধের জন্য কঠোর সমালোচনামূলক 'সালতামামীর গান'। এর নাচের অংশ আর্তব-উৎসবের অংশবিশেষরূপে পরিগণিত লোকনৃত্যের বিবর্তিতরূপ। 'গম্ভীরা' মূলে শিবের গাজন হলেও হতে পারে। এখন তা বিবর্তিত হয়ে যে-রূপ ধারণ করেছে তাতে 'শিব' 'মামদো' ভূতে পরিণত হয়েছে।"[১২]

আসলে এখন শিব-দেবতার স্থলে উপলক্ষ হয়েছে সমালোচিত ব্যক্তি। অর্থাৎ নানা নাতির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে দেশের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের

উপর ভিত্তি করে সেগুলোর অন্যায় বা দুর্নীতিকে সুনিপুণ কটাক্ষে সমালোচনা করেই এসব গান রচিত হয়। এই সহজবোধ্য ও প্রাণস্পর্শী গানগুলো সেইসব অন্যায় বা দুর্নীতি সংশোধনের লক্ষ্যে অনেকখানি কাজ করে।

অবিভক্ত মালদহের আধুনিক গম্ভীরা গানের স্রষ্টা হলেন সুফি মাস্টার। একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো। বহু আগে থেকে গম্ভীরা গানের উপলক্ষ 'শিব' হলেও হিন্দু-মুসলমানের যৌথ যোগাযোগটি বেশ ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। অবশ্য আচারগত দিকটি একান্তভাবেই হিন্দু চাষিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পূর্বে সরাসরি প্রশাসনকে আক্রমণ করা যেতো না বলেই বোধ হয় 'শিবকে' উপলক্ষ করে সমালোচনামূলক বক্তব্য গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হতো। গম্ভীরার এই অংশটিই লোকসংস্কার-মুক্ত। এই কারণেই মুসলমানদের অংশগ্রহণ কোনো বাধার সৃষ্টি করে নি। এছাড়াও এর একটি আলাদা মেজাজ আছে, স্বাদ আছে। যা অন্য কোনো লোকসঙ্গীতে লক্ষ্য করা যায় না। মুর্শিদাবাদের প্রখ্যাত আলকাপের ওস্তাদ প্রয়াত ঝাকসুর একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি আলকাপ আর গম্ভীরার ভেতর পার্থক্য নির্ণয় করেন এইভাবে–"আলকাপ হচ্ছে পরিবার লিয়ে গম্ভীরা হচ্ছে রাষ্ট্র লিয়ে।"[১৩] ঝাকসুর এই মন্তব্য যথার্থ। ডক্টর দিলীপ ঘোষের মতে,

'গাজনোৎসবজাত (তা শিবেরই হোক আর ধর্মেরই হোক) 'সঙ'ধর্মী অনুষ্ঠান থেকে সৃষ্টি হলো 'কাপ'এর। আগে গম্ভীরা উৎসবে 'কাপ' হতো। পরবর্তীকালে 'গম্ভীরা' উৎসব থেকে 'আলকাপ' এর পরোক্ষ প্রেরণায় 'গম্ভীরা' নামক লোকনাট্যের রূপ নিল। 'আলকাপ' গম্ভীরাবিযুক্ত হয়ে রসধর্মী-স্বতন্ত্র লোকনাট্যরূপে শিল্পাঙ্গিক লাভ করল।

'গম্ভীরা' পরিণত হলো রাজনৈতিক বিষয়াশ্রিত ব্যাঙ্গাত্মক প্রহসনধর্মী-লোকনাট্যে (political folk satire) আর 'আলকাপ' পরিণত হলো মূলত পারিবরিক বা গার্হস্থ্য বিষয়াশ্রিত রঙ্গমূলক প্রহসনধর্মী-লোকনাট্যে (domestic folk farce)।[১৪]'

আমাদের আলোচনায় এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, গম্ভীরার দু'টি ভাগ–একটি ধর্মীয়, অপরটি লৌকিক। প্রাচীনকাল থেকে এই প্রথম পর্যায়ে পড়ে শিবের গাজন বা আদ্যের গম্ভীরা, দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে, পালা গম্ভীরা বা গম্ভীরা গান। আমরা আগেই জেনেছি, এই গম্ভীরা গান–বর্ষ বিবরণী যার প্রধান বিষয় শিবকে সামনে রেখে নিজেদের সামাজিক ও আর্থিক দুর্দশা শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরা হতো। এই শিবকেই 'ভোলা নানা' হিসেবে সম্বোধনের মাধ্যমে ঘরের মানুষ করে নেয়া হয়। মালদহে বোলাই বা বোলবাহীর যে চারটি পর্যায় আছে প্রতিটি পর্যায় পরপর পরিবেশন করা হয়। প্রস্তাবনা পর্বে একাধিক জন আসরে এসে একে একে ভিন্ন ভিন্ন সুরে সাম্প্রতিক ঘটনার উপর গান ধরে এইভাবে–

১ম। হায় কি হলোরে, কে মরলো রে
নিহত ইন্দিরা গান্ধী ভারত কর্ণধার।

২য়। ভুপালে বিষাক্ত গ্যাসে, আড়াই হাজার মনুষ্য নাশে
অন্ধ পঙ্গু যত শত হিসাব নাহি তার। হায় কি হলোরে–

৩য়। প্রায় পাঁচশত জণ্ডিস আক্রান্ত;
শত শত হরিজন হচ্ছে নিধন।

৪র্থ। ট্রেনে-বাসে চড়া হলো দায়,
একটা দিনও এ্যাকসিডেন্ট ছাড়া নাই
যেমন ভাড়া বাড়ছে, মৃত্যু বাড়ছে,
খুন রাহাজানির অন্ত নাই।

তারপর 'শিব হে' বলে কোরাসে ডাকে। শিববেশধারী আসরে প্রবেশ করলে চারজনেই তাঁর কাছে সুর করে সকলের দুঃখ-কষ্ট, অনাচার, অত্যাচার, দুর্নীতির কথা সবিস্তারের বর্ণনা করে। বন্দনা বলতে সেটাই। চার-ইয়ারী এরপর শুরু হয়। চার ইয়ার বা বন্ধুর শ্লেষ-ব্যঙ্গ কৌতুকের মধ্য দিয়ে অপ্রিয় সত্যের অবতারণা। এর মধ্যে একজন স্পষ্টবাদী থাকে। যে কোনো বিষয় নিয়ে চার-ইয়ারী তৈরি হয়। পুরো গানকে তিন-চার ঘন্টায় পৌঁছানোর জন্য এক এক আসরে ৩/৪টি 'চার-ইয়ারী' বিভিন্ন বিষয়ের উপর হয়ে থাকে। একেবারে চলতি ঘটনাও এর বিষয় হতে বাধা নেই। চার-ইয়ারীর নমুনা–

বরকত। মালদার উন্নয়ন ছিল জীবনপণ
পশ্চিমবঙ্গের চক্র-পাতাল-ট্রেন।
মানেকা। নির্বাচনে দেখালো কংগ্রেস
রিগিংএ তাদের ব্রেন।
প্রণব। বামফ্রন্টের শাসন এবার
চায় না জনগণ।
জনৈক বাঙালি। বরকত=প্রণব দুই এক্সমন্ত্রী
লহ নমস্কার
মানেকার সঞ্জয়-মঞ্চ (যত)
বিরোধী দল আর
দেখলাম নির্বাচনে এবার
মুখ দেখানো হলো যে ভার!
কত মহা নেতা চিৎপাত,
রাজীব করলো কিস্তিমাৎ
দলাদলি করে গেল কবরে
ভবিষ্যতের আশা অতি ক্ষীণ–
গলাবাজী করে চলে না চিরদিন।

বুঝতে অসুবিধা হয় না, স্পষ্টবাদী উচিত বক্তা আর কেউ নয় 'জনৈক বাঙালি'। সবশেষে রিপোর্ট বা খবর। এখানে সমাজের শীর্ষস্থানে আসীন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় থাকেন, তাঁদের কুকীর্তির কাহিনী বিবৃত হয়।[১৫]

রাজশাহী ও মালদহে প্রথম দু'টি স্তরে প্রস্তাবনা-বন্দনা এবং দ্বৈত বা ডুয়েট গম্ভীরা গান হয়ে থাকে। বর্তমানে শিব-বন্দনার পরিবর্তে যুগোপযোগী ও বিষয়ভিত্তিক বন্দনা গাওয়া হয়। যেমন গণতন্ত্রের উত্তরণ সম্পর্কে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ১৯৯১ সালে উদীচী শিল্পগোষ্ঠীর প্রযোজনায় গম্ভীরা গানের বন্দনা গাওয়া হয়–

কাঁদবি কতকাল, মা তোর কি জঞ্জাল॥
মাগো তোর অর্ডারে যুদ্ধ হলো
কত রক্ত দিয়ে স্বাধীন হলো
কত নেতা আইল গ্যালো
মোরা হইনু শুধু-নাজেহাল।
মাগো, মনে করি পেলাম স্বাধীন
কিন্তু মোরা বিশ্বের অধীন
আবার মরবো যেদিন হবো স্বাধীন
তোর স্বাধীনের কিবা ফল॥

এরপর ডুয়েট বা দ্বৈত। নানা-নাতির চরিত্রে গীত সংলাপের মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এখানো নানার ভূমিকাই বেশি। নানা বয়স্ক মানুষ। তার অভিজ্ঞতা অনেক। ইতিহাসের অনেক ঘটনা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান। নাতির বয়স কম। বাস্তবতা সম্পর্কে তার জ্ঞানই সীমিত। তাই নানা-নাতির ঐতিহ্য, বর্তমান অবক্ষয়, শাসক গোষ্ঠীর তথা সমাজের ভুল-ত্রুটি, সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি পর্যালোচনা ও গঠনমূলক আলোচনা করে নাতিকে আগামী দিনের জন্য সচেতন করে তোলেন। ঘুঙুর পায়ে নাচের তালে তালে নানা-নাতির বাক্-চাতুরি, উপস্থিত-বুদ্ধি ও অঙ্গ-ভঙ্গি দর্শক ও শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।[১৬]

এইগম্ভীরার ভেতরেই লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য এবং লোকনাট্যের অপূর্ব সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। একে পালা গম্ভীরা নামে অভিহিত করার কারণ আছে। একই আকারে একাধিক দৃশ্য বা বিষয় উপস্থাপনা চলে পালাক্রমে। তারপর গম্ভীরা গানের শেষ হয় নাতিকে উপদেশের মধ্য দিয়ে দর্শকের মনে সমাজের দোষক্রটি সম্পর্কে নতুন অনুভূতি জাগিয়ে একটা সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান দিয়ে।

শিব কিভাবে নানা হলেন এ সম্পর্কে সাধনকুমার রক্ষিতের ব্যাখ্যাটি নিম্নরূপ–

"শিব–ভোলা, মহেশ্বর, পঞ্চানন, কখনো কখনো 'নানা' হয়ে ঘরের লোক হয়ে যায়। হাসি-ঠাট্টা করার মানসেই শিবকে 'দাদু ' ঠাউরে বিহারের প্রভাবে মালদহবাসী অনেকেই দাদুকে 'নানা' বলে। যেন লৌকিক সম্বোধন। কিংবা মুসলমান সঙ্গীত রচয়িতাদের হিন্দু দেব দেবীর গুণকীর্তন বা তাঁদের নাম শরিয়ত বিরোধী ভেবে কিংবা তাঁরাও দাদুকে 'নানা' বলেন সেইজন্য গম্ভীরা গানে 'নানা'র প্রচলন দেখা দিয়েছে। ঠিক কবে থেকে তার সঠিক পরিসংখ্যান নাই।"[১৭]

শিব 'নানা' হয়ে উঠেছেন মুসলিমদের অংশ গ্রহণের পর থেকে। আধুনিক গম্ভীরার রূপকার সুফি মাস্টার এ ব্যাপারে সম্ভবত অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর আরো একটি কীর্তির কথা জানা যায়: হাইকোর্টের জজ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মালদহ আসবেন জেনে তাঁর চিত্ত-বিনোদনের জন্য সে সময়ের গম্ভীরা গানের প্রখ্যাত শিল্পী ও গীতিকার মোহাম্মদ সুফির গান শোনানোর উদ্যোগ নেন উদ্যোক্তারা। কিন্তু স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে কোনো কারণেই হোক মালদহ আসতে পারেন নি। তাই দেখে সুফি মাস্টার একজনকে শিব সাজিয়ে আসরে এনে নিম্নোক্ত গান শুরু করেন–

দ্যাখ্ হে দ্যাখ্, কারে ডাকতে
কেটা এ্যালো ভাইরে–
ইনি কি সার আশুতোষ?
হাইকোর্টের জজ?
গায়ে তেবে মাখা কেন ছাইরে॥...

তিনি সেদিন যে রূপক বা প্রতীক ব্যবহার করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। তখন থেকেই নাকি সঙ সেজে শিব আসতে শুরু করেন আসরে।[১৮]

মালদহে মটর বাবু ওরফে যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী, গোপীনাথ ঘোষ, দুকড়িলাল চৌধুরী গম্ভীরা গান রচিয়তাদের মধ্যে খ্যাতিমান এবং গায়কদের মধ্যে স্বনামধন্য বিশ্বনাথ পণ্ডিত ও নির্মলকুমার দাস। যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে এই গানকে সজীব করে তোলেন সেই সমস্ত গীতিকার ও গায়কদের নাম–কৃষ্ণ দাস, মাধাই গোঁসাই, ধনকৃষ্ণ অধিকারী, হরিমোহন কুণ্ডু, বামনবিহারী গোস্তামী, শরৎচন্দ্র দাস, ডাক্তার সতীশচন্দ্র গুপ্ত, ইন্দ্রদমন শেঠ, মিরাজউদ্দীন, মোহাম্মদ সুফি, মোহাম্মদ সোলায়মান, সগীর খলিফা, গোবিন্দ শেঠ প্রমুখ। এঁরা কেউ আর এখন জীবিত নেই। মোহাম্মদ সুফির গম্ভীরা গান শুনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রশংসা করেছিলেন। আর শুভেচ্ছা পেয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর কাছ থেকে। মোহাম্মদ সুফি দেশ বিভাগের পর রাজশাহীর নবাবগঞ্জে চলে আসেন এবং গম্ভীরা গানকে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নেন। কঠোর সমালোচনা পাকিস্তান আমলে সহ্য করা হতো না বলে গম্ভীরা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই গানের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন সমাজ ও দেশের স্বার্থে এবং এই গানকে তিনি উৎসাহিত করেন। বঙ্গবন্ধু নিজেও গম্ভীরা গানের দ্বারা আক্রান্ত হলেও আত্মসংশোধনের স্বার্থে বন্ধ করেন নি।

গম্ভীরা গানকে 'সালতামামী' যেমন বলা যায়, তেমনি তা সমাজ ও ব্যক্তির দোষত্রুটির সম্পর্কে চাবুকের ভূমিকা-পালন করে।

গম্ভীরা অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ-নির্ভর করে দলনেতার অভিনয়ের সাফল্যের উপর। যেমন –কুতুবুল আলমের দল (নবাবগঞ্জ) অভিনয় সাফল্যের কারণে গম্ভীরাকে জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এছাড়া আরো দুটি দলের নাম জানা যায়–বীরেন ঘোষের দল (নবাবগঞ্জ) এবং আবদুল লতিফ সর্দারের দল (ভোলাহাট)।

তথ্য নির্দেশিকা

১. লোকগীতি 'গম্ভীরা' : সাধনকুমার রক্ষিত, গণকণ্ঠ বিশেষসংখ্যা : লোকসংস্কৃতি সংখ্যা : মুর্শিদাবাদ, প্রাণরঞ্জন চৌধুরী সম্পাদিত, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পৃ. ৩৩১

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

৪. নবাবগঞ্জ জেলার লোকসঙ্গীত: গম্ভীরা , তাসাদ্দক আহমদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। আষাঢ়, ১৪০১ (জুন ১৯৯৪)। পৃ. ৪৭-৪৮

৫. প্রাগুক্ত
৬. লোকসংগীত জেজ্ঞাসা : সুকুমার রায়, –কে. এল. এম., কলিকতা, ১৯৮৩, পৃ. ৫৫
৭. গম্ভীরা : আতাউর রহমান, বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলণ ৫৩: লোকসংগীত বিষয়ক প্রবন্ধ : শামসুজ্জামান খান ও মোমেন চৌধুরী সম্পাদিত। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। আষাঢ় ১৩৯৯ (জুন ১৯৯২), পৃ. ৫৯
৮. সাধনকুমার রক্ষিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩০
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১–৩৩২
১০. পূজা-পার্বণের উৎসকথা : পল্লব সেনগুপ্ত , পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বি. সং ৯ মে ১৯৯০ পৃ. ১৬৫-১৬৬
১১. বাংলার লোক-সংস্কৃতি: আশুতোষ ভট্টাচার্য, নয়াদিল্লি, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২; তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯১ পৃ. ১১৮
১২. বাংলা নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ। ডক্টর মুহম্মদ এনামূল হক। বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। বৈশাখ ১৪০০ (এপ্রিল ১৯৯৩), পৃ. ৪১
১৩. বাংলার লোকনাট্য : আলকাপ, ডক্টর দিলীপ ঘোষ, পুথিপত্র, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ২

গম্ভীরা গান

পুলকেন্দু সিংহ

গম্ভীরা। মালদহের গম্ভীরা। চৈত্র মাসের গাজন উপলক্ষ করে যে উৎসব ও সঙ্গীতের আয়োজন হয়, মুখোস নৃত্য হয় সাধারণভাবে তাকে গম্ভীরা বলা হয়ে থাকে। মালদহ জেলাতেই গম্ভীরা উৎসব কেন্দ্রীভূত। গম্ভীরা শিবোৎসব, গম্ভীরা লোক-উৎসব। গম্ভীরা আবার লোক-সঙ্গীতও।

আজকালকার গম্ভীরা গানে যাত্রার ঢঙ্ দেখা যায়। গম্ভীরার আসর গ্রামের যাত্রা আসরের মতোই। যাত্রার মতোই আসরের খালি অংশটুকু বাদ দিয়ে দর্শকের কোল ঘেঁসে বসে দোহারেরা, বাদকেরা। যাত্রার আঙ্গিকের সঙ্গে গম্ভীরার কিছুটা সাদৃশ্য আছে—তবে সবটা নয়। গম্ভীরা গানে কয়েকটি অংশ থাকে। বন্দনা, ঠুংরি, চারইয়ারী, রিপোর্ট ইতাদি। বন্দনা অংশে মহাদেব সেজে একজন আসরে প্রবেশ করেন। তিনি যেন সরকারের প্রতিনিধি, রাষ্ট্রনিয়ন্তা। অন্য চরিত্রেরা আসে সাধারণ গরিব গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষের ভূমিকায়। তাদের পোশাক থাকে মলিন ও ছিন্ন, যেন দরিদ্র কৃষকের প্রতীক, দারিদ্রপীড়িত জনগণের প্রতীক। সরকারের দরবারে দরিদ্র মানুষের হয়ে নালিশ জানায় তারা। অনুযোগ করে শোষকের উদ্দেশ্যে। শেষে প্রতিকারের আশ্বাস নিয়ে আশ্বস্ত হন।

এরপর নানা বিষয় নিয়ে চলে গম্ভীরা গান। এক একটি আসরে কমপক্ষে ৫/৬ টি বিষয়বস্তু থাকে। ২/৩ ঘণ্টা সময় লাগে পরিবেশনে। সমসাময়িক যে কোনও সমস্যা বিষয়ভূত হতে পারে। রাজনীতি, দুর্নীতি, সমাজনীতি, কৃষি, শিক্ষা ইত্যাদি তাবৎ বিষয় নিয়ে গম্ভীরা গান হয়। শ্লেষ, ব্যঙ্গ, মূকাভিনয়, কৌতুকনৃত্য, গান, সংলাপ, অভিনয়, বৃন্দবাদন, একক ও সমবেত গান সব কিছুই যুক্ত হয়েছে গম্ভীরা গানে।

অভিনেতাদের একজন আসরে আসবে ছিন্নবস্ত্রে—সে দরিদ্র জনগণের প্রতিনিধি। তার বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও স্পষ্ট কিন্তু কৌতুক ও হ্যাসারসের মোড়কে ঢাকা। হাস্যরসের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপিত করে পাত্র-পাত্রীরা, কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে লুকিয়ে থাকে সমাজ-জীবনের কত নির্মম সত্য যা মানুষের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। গ্রামের অশিক্ষিত মানুষেরাও একই সঙ্গে মনোরঞ্জনের উপকরণ এবং সাধারণ জ্ঞান ও শিক্ষার সুযোগ পান গম্ভীরা গানে।

এখনো গম্ভীরা গানে মহিলা-শিল্পীরা অংশ নেন না। গম্ভীরার মতো মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমানের গাজনের গান, বোলানেও মহিলা-শিল্পীরা অংশ নেন না। গাজনের সময় পরিবেশিত পুরুলিয়ার বিখ্যাত ছৌনৃত্যেও মহিলারা অংশ নিতে পারেন না। গম্ভীরা গানে পুরুষ শিল্পীরা মহিলা-চরিত্রের বেশ গ্রহণ করে চারইয়ারী অংশে চারজন শিল্পী বক্তব্য রাখে।

'চারইয়ারী' অংশে বৈঠক ঢঙে সংলাপ চলে। গম্ভীরা গানে দলমতনিরপেক্ষভাবে সকল অন্যায় ও অবিচারের কঠোর সমালোচনা করা হয়ে থাকে। গম্ভীরা গানের শেষ অংশে থাকে 'খবর' বা 'রিপোর্ট'। একটি বিশেষ এলাকার জনগণের নতুন খবর রিপোর্ট অংশে পরিবেশিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন সূরে গম্ভীরা গান গাওয়া হয়ে থাকে। গানগুলিতে ঝাঁপতাল, একতাল, খেমটা, কীর্তন, জারি, সারি, বাউল, রামপ্রসাদী প্রভৃতি গানের সুর থাকে। গম্ভীরা গানের বক্তব্য গ্রাম্য সুরে মালদহের নিজস্ব গ্রাম্য ভাষায় এমনভাবে পরিবেশণ করা হয় যে তা থেকে গ্রামীণ মানুষেরা বহুবিধ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তাই মালদহের গম্ভীরা নিছক একটি গান নয়, এটি একটি লোক-উৎসব ও লোকরঞ্জন এবং লোক-শিক্ষার একটি জনপ্রিয় মাধ্যম।

গম্ভীরা গানে যদিও আপাতদৃষ্টিতে ধর্মের সঙ্গে একটি সংযোগ থাকে তবে সে ধর্ম লোক-ধর্ম। তাই লোক-সমাজের গানই গম্ভীরার গান। গ্রামের সাধারণ মানুষই গম্ভীরা গানের রচয়িতা, পরিচালক, শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষক এবং রসগ্রাহী শ্রোতা।

গম্ভীরাতে নির্ভেজাল প্রেমের গান থাকে না। গম্ভীরা গান জীবনের গান—জীবন-যন্ত্রণার গান—মাটির মানুষের কত না আশা, আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা ও সংগ্রামের গান। ধর্ম, সমাজ, পারিবারিক ঘটনা, রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং সাধারণ মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, কুশাসন, কুসংস্কার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে রচিত গম্ভীরার গান নিরক্ষর গ্রাম্য জীবনে—বিভিন্ন চিন্তাধারার বিচিত্র প্রকাশ।

কৃষিদেব শিবের পূজাকে কেন্দ্র করে গম্ভীরা উৎসব. সুতরাং গম্ভীরা গানে কৃষি যে প্রাধান্য পাবে এটা স্বাভাবিক। কালক্রমে জলবন্দনা থেকে কৃষিতত্ত্ব হয়ে বর্তমান বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজ ও রাজনীতির বৃহত্তম ক্ষেত্রে ইহা প্রবেশ করেছে। কৃষিজীবী মানুষের সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্খা এককালে হয়ত গম্ভীরা গানে প্রধান অংশ রূপে থাকতো—এখনো থাকে, তবে তার সঙ্গে আরো অনেক বিষয় যুক্ত হয়েছে।

বর্তমানে যাত্রার মতোই গম্ভীরা গানও যে কোনো দিন যে কোনো স্থানে হতে পারে। মালদহে 'বারমাস' গম্ভীরা গান পরিবেশনের উপযোগী বেশ কয়েকটি দল গড়ে উঠেছে—তার মধ্যে মটরার দল, নিরুর দলই বিখ্যাত। পূর্বে কিন্তু গম্ভীরা উৎসবের সময়েই কেবলমাত্র গম্ভীরা গান হতে পারত। তার জন্য নির্দিষ্ট সময় ও স্থান থাকত। গম্ভীরা তথা গাজন উৎসবের সময় গম্ভীরা-মণ্ডপে গম্ভীরা গান হতো। উৎসব ও গান একাত্ম ছিল। মালদহের ভোলাহাট কুতুবপুর, ধানতলা, মহেশপুর, সাহাপুর, মঙ্গলবাড়ী, প্রভৃতি অনেক গ্রামই গম্ভীরা উৎসবের জন্য বিখ্যাত ছিল। ভোলাহাট বর্তমানে বাংলাদেশে।

সেকালে পদ্মফুল, ঘিয়ের প্রদীপ, মশাল, কাগজের ফুল, মালা, পাখি, মাটির পরী, পুতুল প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে গম্ভীরা-মণ্ডপ সাজান হতো। মাথায় থাকত চাঁদোয়া। আর টাঙ্গান থাকত অনেক ছবি ও পট। সুতরাং গম্ভীরা উৎসবের সঙ্গে লোকনৃত্য, লোক-সঙ্গীত, লোক-বাদ্য ও লোক-নাট্যের সঙ্গে লোক-শিল্পেরও সংমিশ্রণ থাকত। তাই এই উৎসব গ্রামীণ সংস্কৃতির আশ্চর্য মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠত। এখন গম্ভীরা-মণ্ডপের সে জৌলুস আর চোখে পড়ে না। সেকালে মালদহের প্রতি গ্রামেই দলপতি 'মণ্ডল' নামে অভিহিত হতেন। তাদের অধীনে থাকত এক একটি মণ্ডপ। সে সব মণ্ডপের খরচ স্থানীয়

জমিদারের দানে চলত। জনসাধারণও চাঁদা দিত। বর্তমানে মণ্ডলের অধীন মণ্ডপ-প্রথা যেমন নাই–তেমনি নাই জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা।

গম্ভীরা উৎসবে কৃষি একাত্ম হয়ে আছে। যেমন, 'ঘটভরা' অনুষ্ঠান। ঘটভরা, ফুলভাঙ্গা, মশাল নাচা, আহাঢ়া, বোলাই, ঢেকি-মঙ্গলা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ সংস্কার আদিম যাদুবিশ্বাস, কৃষিজীবন ও জেলেদের জীবনের নানা ধারণা–এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। রাঢ় অঞ্চলের ধর্মরাজ পূজার অনুষ্ঠানেও এই ধরনের আচার অনুষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়।

লোকজীবনের সঙ্গে এই গান অবিচ্ছিন্ন থাকায় এই গানে গ্রামীণ জীবনের সহজ সরল প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে–যা নগর-জীবন থেকে অবশ্যই স্বতন্ত্র ধরনের।

এককালে ধর্মকে কেন্দ্র করে গম্ভীরা গানের জন্ম হলেও ইহা পূর্বেকার রীতি অতিক্রম করে অনায়াসে বৃহত্তর সমাজ-চৈতন্যের প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ প্রান্তরে প্রবেশলাভ করেছে। এ গানে আছে মালদহের বন, বাদাড়, নদী, নালা আর মাঠ, প্রান্তরের, জলা-জঙ্গলের সোঁদা গন্ধ। তাই এ গানে সাধারণ গ্রাম্য মানুষের এত প্রাণের আকর্ষণ। স্বল্প-শিক্ষিত গ্রাম্য কবিদের সৃজনশীল প্রতিভার যাদু স্পর্শ আছে এ গানে। সাহিত্য-মূল্য হয়তো তেমন থাকে না–কিন্তু সেই অভাব হৃদয়ের আন্তরিক আবেগ ও উত্তাপে পূরণ হয়ে যায়।

গ্রামের সাধারণ মানুষেরা অধিকাংশ নিরক্ষর। তারা দেশের হালচাল, খবরাখবর সংবাদ-পত্র মাধ্যমে গ্রহণ করতে অক্ষম। কিন্তু যারা আগ্রহী, তাদের সেই আগ্রহকে পরিপুষ্ট করেছে তাদের উপযোগী লোকনাট্যের আঙ্গিকে পরিবেশিত গম্ভীরা গান। গম্ভীরার শিল্পীরা লোক শিক্ষা প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। মালদহের হাটখোলার বিশু পণ্ডিতের দলের গম্ভীরা পরিবেশিত হয়। তারই অংশ শিব-বন্দনা। এই বন্দনা-গানটি আমি মালদহ থেকে এই গানের রচয়িতা শ্রী উপেন্দ্রনাথ দাস-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি।

শিব-বন্দনা

১। মোদের বান্ধাহ যেগুলি ভুলি কেমনে ভুলতে পারি না–
হে নানা ছাইড়া দে ঢং হাজার পাখনা।
আছ জেগে কি যোগে রোগে কি ভোগে কেছু বুঝতে পারি না,
কথা শুন খুইল্যা কানের ঢ্যাকনা।
চাষীদের ডাকে সাড়া দেলে হে দরদী তাই
লোনে, বীজে যার রক্ষা করছ চাষীজাতি হে–
জঙ্গল কাইট্যা করছ আবাদ ঘুচাইবে হায় খাদ্যের অভাব
ভাত জুটাতে সরকারী ডিপার্টমেন্ট রয়েছে ফিসারী
ফলাইছ ফসল তবু প্যাটের আগুন নেভেনা কেনে?
চাও তুমি তিন চোখ খুলে নহিলে আমরা বাঁচবনা–হে নানা
দাস উপেনের এতই বাসনা।

এ গানে কোনও অস্পষ্টতা নাই। সবই সাধারণ মানুষের বোধগম্য, মালদহের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত ভাষায় রচিত। সাধারণ মানুষের মনের কথা, তাদের নিজের ভাষাতেই

গানের ভঙ্গিতে অবিকল প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ মানুষ বলি বলি করে বলতে পারছিল না। তাই লোককবি উপেন দাস সাধারণ মানুষের মনের কথাই ব্যক্ত করেছেন "প্যাটের আগুন নেভে না কেনে"

গম্ভীরার সাধারণ লোককবি যে প্রশ্ন রেখেছেন তার উত্তর দেবার দায় নিশ্চয় আমাদের অনেকের।

গম্ভীরা : একটি বিশ্লেষণ

পুলকেন্দু সিংহ

অনেকে বলেন শিল্পের জন্য শিল্প। সে রকম শিল্প আছে–শিল্পীও আছেন কিন্তু শিল্প তো সমাজ অগ্রগতির নান্দনিক হাতিয়ার। তাই শিল্প কখনো সমাজ নিরপেক্ষ হ'তে পারে না। সমাজ সংসার নিয়েই শিল্পের কারবার। শিল্পের ফর্ম যাই হোক না কেন–চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক অনেক কিছুই হ'তে পারে। এক্ষেত্রে লোকনাট্য গম্ভীরা, যা মালদহের লোকসমাজের জন্য লোকসমাজকর্তৃক সৃষ্ট। লোকনাট্য গম্ভীরা লোক-উৎসব গম্ভীরার অন্যতম অংশ। ভীষণ রকম সমাজ সচেতন। শুধু সমাজ সচেতন বললে কিছুই বলা হ'ল না, গম্ভীরা হচ্ছে লোক সমাজের চৈতন্যের বার্তাবাহী। সুদীর্ঘ কাল ধরে লোক-উৎসবকে অবলম্বন ক'রে লোক শিক্ষা ও লোক-রঞ্জনের যা দায়-দায়িত্ব লোক শিল্পীরা গ্রহণ করেছেন তা অনন্য সাধারণ শিল্প প্রীতিরই নিদর্শন। মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অনুরাগই এই ধরনের শিল্প-বোধের জন্ম দেয়– লালন করে। যা মালদহের গম্ভীরা শিল্পীদের মধ্যে বর্তমান।

আর একটি লোকনাট্যের ফর্ম যা মালদহে কিছু আছে, আছে অন্য জেলাতেও তবে সংলগ্ন মুর্শিদাবাদ জেলায়–এই লোকনাট্য আলকাপ একটি স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছে, কিন্তু সামাজিক দায়-দায়িত্ববোধ আলকাপ শিল্পীদের তেমন ভাবে স্পর্শ করেনি অথচ করলে হয়তো ভালই হ'ত।

আলকাপের সঙ্গে গম্ভীরার পার্থক্য আমরা অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করব। তার আগে মালদহের গম্ভীরা গানের সমাজ সচেতন ভূমিকার কথা কিছু আলোচনা করে নেওয়া ভালো।

লোক-উৎসব গম্ভীরা যা বাংলার অন্যতম বৃহৎ লোক-উৎসব গাজন-উৎসবের অঙ্গীভূত। সেই প্রাচীন উৎসবের বিপুল সমারোহ আজকের বিবর্তিত সমাজে ও সময়ে লক্ষ্য করা না গেলেও তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তবে উৎসবের সমারোহ যেমন পাল্টেছে বা কমেছে তেমনি গম্ভীরা গানের বা নাটকের সমারোহ কিন্তু বেড়েছে। গম্ভীরা উৎসবই গম্ভীরা গান তথা গম্ভীরা লোকনাট্যের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত জীবন্ত ও সচেতনভাবে বেঁচে আছে। বেঁচে আছে রসেবসে, রঙ্গ-রসিকতা আর তীব্র শ্লেষের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অবয়বে। তবে এই বেঁচে থাকা এই মাথা উঁচু করে থাকা সহজভাবে হয়নি, এজন্যও গম্ভীরা শিল্পীদের দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে পায়ের নিচে মাটি ধ'রে রাখতে হয়েছে। সামাজিক দায়িত্ববোধই তাদের নিজেদের অস্তিত্বকে বার-বার নাড়া দিয়ে গিয়েছে। সমাজ চেতনা তথা লোক-সমাজের সঙ্গে একাত্মতা তাদের টিকিয়ে রেখেছে। পূর্বে চৈত্র-সংক্রান্তির আগের চারদিন ধ'রে চলত গম্ভীরা উৎসব। এখন কোথাও কোথাও এ উৎসব চলে চারদিন ধরেই। কোথাও কমে দু/তিন বা একদিন হয়েছে। প্রথম দিনকে বলে

ঘটভরা। দ্বিতীয় দিন ছোট তামাশা। তৃতীয় দিন বড় তামাশা। চতুর্থ দিন আহারা বা বোলাই। গাম্ভীরা হচ্ছেন শিব। শিবকে অবলম্বন করেই যত ধর্মকৃত্য নৃত্য-সঙ্গীত-বাদ্য-অভিনয়। এ শিব কি বৈদিক শিব? মোটেই না। এ শিব লোক-সমাজের নিজস্ব শিব। তাদের নৈমিত্তিক জীবন-যাত্রা থেকে বেরিয়ে আসা ছাই-ভস্ম মাখা ব্যাঘ্র ছাল পরা ত্রিশূল ডম্বরুধারী গাঁজা খাওয়া কানে ধুতরা ফুল গোঁজা লৌকিক শিব। গাঁজা তো সাধারণ্যে খায়-গ্রাম-বাংলার বুনো ফুল ধুতরা, ডম্বরু বাদ্য তো লোক-সমাজের বাদ্য, ত্রিশুল তো সাধারণের ব্যবহারের অস্ত্র। ভস্ম মাখা, বাঘ-ছাল পরা তো আদিম সমাজের আচারবাহী। তাকে ঘিরে যত কথা, ব্যথা বেদনা, সুখ-দুঃখ। চাষের কথা-কৃষির কথা-বৃষ্টির কথা-সংসারের কথা-সমাজের কথা। এমনি ক'রে বাড়তে-বাড়তে এখন তো গম্ভীরা গানে রাজনীতি, সমাজনীতি, বিশ্ব-রাজনীতি সব কিছু একত্রীভূত হয়ে গিয়েছে।

বাংলার অন্যান্য প্রান্তের মতো গাজন-উৎসবে অংশ নেয় সমাজের অধিকাংশ ব্রাত্য শ্রেণীভুক্ত মানুষেরা। মালদহে গম্ভীরা উৎসবে প্রধানত অংশ নেয়-স্থানীয় অন্ত্যজ মানুষজন, রাজবংশী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, জেলে, মালো, চাঁই ও অন্যান্য স্থানীয় ব্রাত্য জনেরা। গম্ভীরা পূজা, উৎসব, সঙ্গীত, নৃত্যে প্রধানত এঁরাই অংশ নিত, আজো নিয়ে থাকে। গম্ভীরা গানে মুখানাচ বা মুখোশনাচ এর একটি স্থান আছে। মুখে কিছু মেখে বা মুখোশ দিয়ে এ নাচ হয়। কিন্তু পৌরাণিক বিষয় যেমন থাকে তেমনি সামাজিক ও লৌকিক বিষয়ও এ নাচে এসে যায়-যা স্থানীয় লোকশিল্পীদের নিজস্ব সৃজনশীলতার প্রকাশ। পৌরাণিক বিষয়ের বাইরে সাধারণত স্থানীয় লোকায়ত সমাজের বিভিন্ন উপকরণ এ নৃত্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এ নৃত্যকে পরিপুষ্টি দান করেছে: তবে সর্বত্র এ নাচ দৃষ্ট হয় না। এ নৃত্যের শিল্পীরা সাধারণত গ্রামীণ মানুষ, বাদ্যযন্ত্রও লৌকিক ঢাক, কাঁসি ইত্যাদি। এ নৃত্যের ফর্ম লৌকিক নৃত্যভুক্ত। গম্ভীরা নৃত্যধারা গম্ভীরা লোকনাট্য বা গানের মতো উৎসব বিচ্ছিন্ন ভাবে স্বতন্ত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করেনি। এখনো এ নৃত্য মূলত গম্ভীরা উৎসবের লোকাচারের অঙ্গীভূত হয়েই বিলুপ্তির জন্য দিন গুনছে।

যেসব স্থান এককালে গম্ভীরা উৎসবের জন্য বিখ্যাত হ'য়ে উঠেছিল সেসব স্থানে নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটেনি। মালদহ জেলার অনগ্রসর ভোলাহাট, আইহো, মহদীপুর কুতুবপুর, সাহাপুর প্রভৃতি স্থানের গ্রামীণ পরিবেশে এ গানের উৎস ও বিকাশ ঘটেছে। লৌকিক উপকরণ দিয়েই গম্ভীরা মণ্ডপ সাজাবার রেওয়াজ ছিল। এক সময় গম্ভীরা উৎসব, মণ্ডপ, অনুষ্ঠানে কিছু কিছু জমিদারি পৃষ্ঠপোষকতা থাকলেও পরিশেষে এই উৎসবের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রাম্য-সমাজেরই মধ্যে বর্তায়।

গম্ভীরা উৎসবের যেসব অনুষ্ঠান আছে সেগুলি বাংলার অন্যান্য জেলাতে শিবের গাজনে চৈত্র মাসে বা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, বর্ধমানের ধর্মরাজের গাজনে দৃষ্ট হয়। এগুলি লৌকিক তন্ত্রাচার তথা লোক ধর্মবিশ্বাস সংস্কার ঐন্দ্রজালিকা বিশ্বাস বৌদ্ধ তন্ত্রাচার প্রভৃতির স্মৃতিবাহী। যেমন ফুলভাঙা অনুষ্ঠান যা গম্ভীরাতে আছে তদ-অনুরূপ অনুষ্ঠান শিব ও ধর্মরাজের গাজনের আচার অনুষ্ঠানেও দৃষ্ট হয়। মুর্শিদাবাদ বীরভূমের ধর্মরাজ পূজার অন্যতম বিশিষ্ট অঙ্গ ঘোড়া নাচ যা গম্ভীরা উৎসবের মধ্যেও আছে। বান-নৃত্য গম্ভীরা উৎসবের অঙ্গ বিশেষ। এই বাণ-নৃত্য সমগ্র বাংলাদেশে চৈত্রের

গাজনে বা ধর্মরাজ পূজানুষ্ঠানে দৃষ্ট হয়। কেবলমাত্র ব্রাত্য জনেরাই এসব কৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নিয়ে থাকে। গাজন উৎসবে নৃত্যে ঢাকিদের বা ঢুলিদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে যা গম্ভীরা উৎসবেও আছে। ঢাকের লহরা ও বোল লোক-বাদ্য অনুষ্ঠানের সমৃদ্ধ উপস্থিতি লৌকিক উৎসবের চরিত্রকে অটুট রেখেছে।

গম্ভীরা উৎসবের মশান নৃত্যের অনুরূপ বীভৎস নৃত্য মুর্শিদাবাদের কান্দীর রুদ্র দেবের উৎসবে অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার গম্ভীরা উৎসব মূলত গাজন, শিবের গাজন, যা তামাম বাংলাদেশে শেষ চৈত্রে অনুষ্ঠিত হয়। এবং ভিন্ন ভিন্ন অংশে এই উপলক্ষে যে সব লৌকিক নৃত্য, সঙ্গীত, নাটক পরিবেশিত হয় তার নাম ও চরিত্র অঞ্চল ভেদে ভিন্নতর রূপ নিয়েছে। যেমন পুরুলিয়াতে ছৌ, মুর্শিদাবাদে বোলান, মালদহে গম্ভীরা। গাজনের গানের আঞ্চলিক রূপভেদ মাত্র। সর্বত্র গ্রামীণ সাধারণ মানুষরা এসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যার ব্যতিক্রম ঘটেনি গম্ভীরা উৎসব ও গানে।

কিন্তু ছৌ-একটি স্বতন্ত্র লোক নৃত্যের ধারা হিসেবে এখন বিশ্বখ্যাত। মুর্শিদাবাদের বোলান গান আঞ্চলিক লোক সঙ্গীত হিসেবেই টিকে আছে–কিন্তু গম্ভীরা গান মালদহের জল হাওয়া, পরিবেশে, সমাজসচেতন শিল্প মাধ্যম হিসেবে যে গৌরব জনক ভূমিকা গ্রহণ করেছে গাজনের গানের অন্য সব আঞ্চলিক ফর্মে তা দৃষ্ট হয় না। এইখানেই গম্ভীরা গান বা লোক-নাট্যের বড় বৈশিষ্ট্য বড় গৌরব।

গম্ভীরা গানের আসর, রচয়িতা, শিল্পী, শ্রোতা, বিষয়, এমন কি ভাষাতেও সাধারণ লোকসমাজের প্রভাব দৃষ্ট হয়। মালদহের স্বল্প শিক্ষিত গ্রাম্য লোক-শিল্পীরা গম্ভীরা গানের রচয়িতা, তারাই শিল্পী–তাদের মুখের চলতি গ্রাম্য ভাষাই মালদহের গম্ভীরা গানের ভাষা মাধ্যম। গম্ভীরা গান ধর্মের বন্ধন ছেড়ে সমাজ বন্ধনের বৃহত্তর প্রাঙ্গণে নিজের ঘর বেঁধেছে। এ বড় কম কথা নয়।

দীর্ঘকাল ধরে মাল:দহের অতিসাধারণ দরিদ্র গ্রামীণ মানুষ গম্ভীরা গানের পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে। তাদের বোধগম্য ভাষাতেই গান/নাটক পরিবেশিত হয়। লৌকিক সুরই গম্ভীরা গানের প্রধান সুর। স্বল্প-শিক্ষিত গ্রাম্য কবিয়াল গম্ভীরা গান রচনার মধ্য দিয়ে তাদের সৃজনীপ্রতিভার ও কবিত্ব শক্তি বিকাশের সুযোগ ক'রে নিয়েছেন। গ্রামের অতি সাধারণ মানুষের সহজাত শিল্পবোধই গম্ভীরা শিল্পীদের প্রধান অবলম্বন যা আর পাঁচটা লোকায়ত সঙ্গীত ও নাটকের শিল্পীদের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

ইদানিং যাত্রার ঢঙে (ঢং-এ) গম্ভীরা পরিবেশিত হয়। অদূরে থাকে সাজঘর। দর্শকের মাঝখানে ফাঁকা অংশে বসে গম্ভীরার আসর, আসরকে ঘিরে থাকে বাদ্যকার দোহারদের দল–এরকম দেখা যায় আলকাপ/কৃষ্ণযাত্রাতেও।

গম্ভীরা গানে থাকে কয়েকটি পর্যায়–বন্দনা, ঠুংরি, চার ইয়ারী, রিপোর্ট ইত্যাদি। সংলাপ তাৎক্ষণিক। যা লোক-নাট্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য আলকাপ ও অন্যান্য লোকনাট্যে পরিবেশিত হয়। গম্ভীরা গানে মহিলা শিল্পীরা অংশ নেন না–পুরুষেরাই মহিলা সাজেন। এটা আলকাপে দৃষ্ট হয়, দৃষ্ট হয় অন্যান্য লোকনাট্যের ক্ষেত্রে তবে ইদানিং সর্বত্র মহিলা শিল্পীরা প্রবিষ্ট হচ্ছেন। বহু পূর্বে জাপানে সামন্ত-তান্ত্রিক রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে উন্নত নাট্য-শৈলী কাবুকীর উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল তার মধ্যে জাপানের সমৃদ্ধতর

উচ্চ শিল্পনৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায়। আমাদের লোক-নাট্যের পোশাকে মঞ্চসজ্জায় (মঞ্চসজ্জা মূলত থাকেই না) এরকম উন্নততর শিল্প-নৈপুণ্য মোটেই আশা করা যায় না–তবে কাবুকীর সঙ্গে গম্ভীরা আলকাপের একটা মিল আছে সেটা হ'চ্ছে পুরুষেরাই মহিলা সাজেন। এককালে জাপানে 'কাবুকী' শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা মহিলার অভিনয় করতেন তাঁরা মঞ্চের বাইরে সামাজিক জীবনে মেয়েলী সাজ-পোশাক, রঙে-ঢঙে কথাবার্তা, চলা-ফেরা করতেন। সাধারণত তাঁরা দেখতে খুব সুন্দর (সুন্দরী?) হতেন। এদের পেছনে অনেকে ঘুর-ঘুর করত। এরকমটা আলকাপের 'ছোকরা'দের ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়–যারা অভিনয়ের বাইরে রঙে-ঢঙে কথা-বার্তায় মেয়েলী।

বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে গম্ভীরা ও আলকাপে বেশ ফারাক। গম্ভীরা গানে সমসাময়িক স্থানীক, দেশজ এমনকি আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে সর্বজনগ্রাহ্য ভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে স্থানীয় প্রচলিত লৌকিক গম্ভীরার উপস্থাপনা। আলকাপে বিষয় নির্বাচন করা হয় প্রধানত প্রচলিত লোক-কাহিনী, প্রেম-পিরিত, কখনো সমসাময়িক স্থানীক গ্রাম্য বা পারিবারিক ঘটনা নিয়ে। গম্ভীরা গানে হরেক সুরের আমদানী–আলকাপেও তাই। তবে আলকাপে ভীষণ ভাবে স্থুল রসের আধিক্য যা আধুনিক হিন্দী বাংলায় সিনেমার সস্তা প্রেম-পিরিত গান-নাচ রঙ্গ-রসের নকলিপনা মাত্র। এ নকলিপনার অভ্যাস গম্ভীরাতে এখনো প্রবেশ করেনি বলেই গম্ভীরা এখনো সমাজ সচেতন ভূমিকায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে–যে ভূমিকা আলকাপে আশা করা যায় না। আবার আলকাপের সাম্প্রতিক বিবর্তিত 'ফর্ম' পঞ্চরসের কথা আপাতত থাক। সেটি মুলত যাত্রা–আলকাপের মিশেল–সিনেমার সুরভঙ্গীকে নকল ক'রে সস্তায় গ্রামীণ জনসাধারণের স্থূল রস-চেতনাকে উদ্দীপ্ত করার ব্যবসাদারী প্রয়াস মাত্র। জঙ্গীপুরের বেশ কয়েকটি পেশাদারী পঞ্চরসের দল আছে যা তামাম বাংলাদেশে, বিহারে, নেপালে, উত্তরবাংলায় পঞ্চরস পরিবেশন করে রীতিমতো ব্যবসাদারী সাফল্য অর্জন করছে। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ/জঙ্গীপুরকে পঞ্চরসের চিৎপুর বলা যেতে পারে। গম্ভীরার ক্ষেত্রে এরকম পদস্খলন বা ব্যবসাদারী সাফল্য আশা করা যায় না। কারণ, গম্ভীরা তার সামাজিক দায়িত্ববোধে এখনো একনিষ্ঠ।

গম্ভীরা গানে বাদ্য, নৃত্য, পোশাক, সংলাপ, অভিনয়, মুকাভিনয়, গান সবকিছুই আছে। গম্ভীরার গতি তাৎক্ষণিক সংলাপে। এ বৈশিষ্ট্য আলকাপেও আছে, আছে অন্যান্য দেশজ লোকনাট্যে। গম্ভীরা লোক-শিক্ষা ও লোক-রঞ্জনের বিশিষ্ট মাধ্যম। এরকম লোকরঞ্জন ও লোক-শিক্ষার মাধ্যম আমাদের কবিগান যা মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান ও অন্যত্র বেশ সমৃদ্ধ। কিছুদিন আগে মেদিনীপুরের কবিগানের আর একটি স্থানীয় 'ফর্ম' দেখার সুযোগ হলো–তাকে বলা হচ্ছে 'গাছ-কবি'। মহিলা কবিয়াল প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লাদিয়ে সঙ্গীত সহযোগে যুক্তিতর্ক বিস্তার করে এ কবিগান পরিবেশন করে না, এ কবিগানের ঝোঁক অনেকটা স্থূলতার দিকে যা মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য স্থানের সমৃদ্ধ কবিগানে নাই–এমন কবিগান সাধারণত সমাজ সচেতন শিল্পবোধ সম্পন্ন হয়ে থাকে যা আমরা গোমানী-লম্বোদর জুটির কাছে দীর্ঘকাল পেয়েছি। গম্ভীরা কবিগান আলকাপে সঙ্গীত রচয়িতাদের একটি নেপথ্য ভূমিকা থাকে। এসব সঙ্গীত রচয়িতারা গ্রামের স্বল্প-শিক্ষিত লোক-কবিরা হয়ে থাকেন। মুর্শিদাবাদের কবিগানের বিখ্যাত সঙ্গীত

রচয়িতা ছিলেন পোড়াডাঙ্গা গ্রামের হরিনারায়ণ দে, হরিমাখন দে (তাঁরা কবিগানও করতেন)। আলকাপেও এরকম অনেক সঙ্গীত রচয়িতা আছেন। গম্ভীরা গানের সুবিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে সতীশ সরকার, ইন্দ্রদমন শেঠ, উপেন্দ্র কর্মকার, ভূপেন্দ্র সাহা, বিনয় গুপ্ত, গোপীনাথ শেঠ, দেবনাথ রায়, বিশ্বনাথ পণ্ডিত, দুকুড়িলাল চৌধুরী, মৃত্যুঞ্জয় হালদার, তারাপদ লাহিড়ী-র নাম স্মরণে আসছে। প্রাচীন আরো অনেক সুবিখ্যাত গম্ভীরা রচয়িতাদের কথাও জানা যায়। (দ্রষ্টব্য:–ড. প্রদ্যোৎ ঘোষের গম্ভীরা লোক-সঙ্গীত ও উৎসব–সেকাল ও একাল)। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় মূল অভিনেতা বা শিল্পীরাই দক্ষ রচয়িতা হতে পারেন–তাতে তাৎক্ষণিক সংলাপ পরিবেশনায় কোনও অসুবিধা হয় না। এরকমটি কবিগান আলকাপ ও গম্ভীরাতে অনেক দেখা গিয়েছে। কবিগানের সঙ্গে আলকাপ/গম্ভীরার এই মিলটুকু থাকলেও গম্ভীরা আলকাপের সঙ্গে কবিগানের উপস্থাপনার কোনও তুলনাই চলে না। কারণ, কবিগানকে লোক-নাট্য বলা চলে না। কিন্তু গম্ভীরা আলকাপ স্পষ্টই লোক-নাট্য, যদিও এ দু'টির চরিত্র ও চালচলন ভিন্নরূপ। গম্ভীরা যদি গ্রামের গরিব ঘরের চরিত্রবতী কুমারী হন–যে আটপৌরে শাড়ি পরে থাকে অন্তরে তার কৌমার্যের তেজ তবে আলকাপ হচ্ছে গরিব ঘরেরই বাজারের সস্তা দামে কেনা ঠিকাদারী শাড়ি পরে ঠুনকো কাচের চুড়ি পরে সেজেগুজে চপল ভঙ্গীতে হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়ানো মেয়ের মতো। তবে স্মরণ করা দরকার মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের সুবিখ্যাত আলকাপ শিল্পী ঝাকসু পর্যন্ত আলকাপে স্থূলতা থাকলেও কিছু কিছু সামাজিক বিষয় থাকত। আর ব্যবসাদারী সাফল্যের জন্য এই ফর্মকে তখনো ইদানিংকালের পঞ্চরসের ফর্মে ঠেলে দেওয়া হয়নি। ইদানিং আলকাপের প্রধান ধারা গ্রাম্য শীর্ণকায় নদীর মতো শুকিয়ে গিয়ে স্রোতস্বিনী শাখা নদীর মতো পঞ্চরসরূপে আলকাপের মূল ধারা হিসেবে প্রবল বেগে বয়ে চলছে। সে কথা থাক। ১৯৭৪ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে আমি মটরবাবুর দলের সঙ্গে মলদহে ব্যাপক ঘুরি। সে সময় তাঁর দলের সঙ্গে আমি মালদহে মথুরাপুরে যাই এবং তাঁর গান শুনি। ৪–২–৭৪ খ্রিঃ তারিখে মালদহ মথুরাপুরে অনুষ্ঠিত তাঁর গম্ভীরা পরিবেশনার একটি পদ্ধতি তুলে ধরছি : স্থান–মথুরাপুর। সময়–রাত্রি ৮টা। দর্শক–স্থানীয় পুরুষ, নারী, যুবক, হিন্দু-মুসলিম মিশ্র ভাষাভাষী।
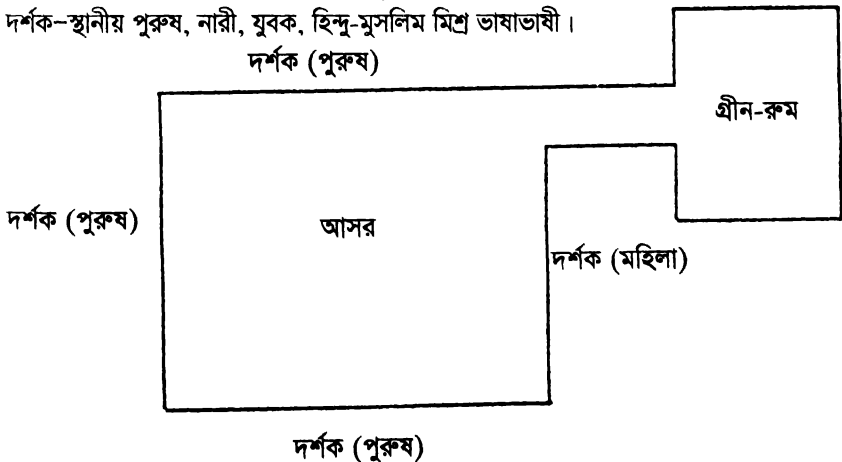
প্রথমে কনসার্ট। যাত্রা আলকাপের মতো। তবে আলকাপের কনসার্ট খুব দ্রুত তালে বাজে। গম্ভীরার কনসার্টে যাত্রার কাছাকাছি, কিছুটা সংযত ও বাদ্য ভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। মঞ্চে ৩জন নাগরিকের প্রবেশ। সংলাপ–তাৎক্ষণিক, কিছুপরে উচিত বক্তা। তার পরে শিব। বিষয় গরীবি হটাও। সম্ভবত মটরবাবু উচিত-বক্তারূপে মঞ্চে নেমেছিলেন। মোটামুটি এইরূপ ঃ–

প্রথম দৃশ্য ঃ
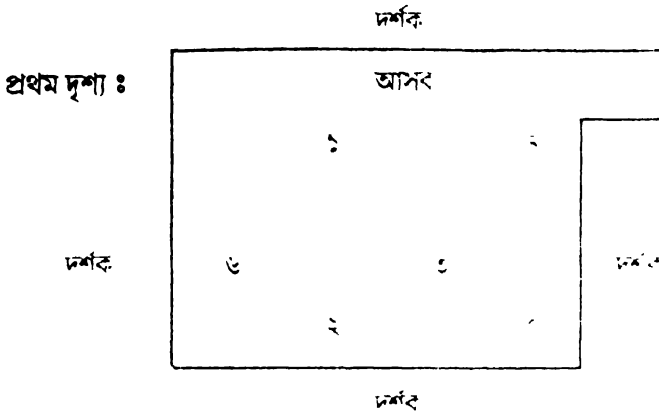
১। শিব ২। নাগরিক ৩। নাগরিক ৪। নাগরিক ৫ : উচিত বক্তা ৬। কনসার্ট-এর দল–হারমোনিয়াম, জুড়ি, বিউগল্, তবলা। ঢোলক। বিষয়–গরীবি হটাও।

২য় দৃশ্য ঃ সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। গণিখান চৌধুরী। M.L.A.–গৌতম চক্রবর্তী। মটরবাবু–উচিত বক্তা।

৩য় দৃশ্য ঃ–গার্ড। ইন্দিরা গান্ধী। ভুট্টো। ভুট্টো কন্যা বেনজির।

৪র্থ দৃশ্য ঃ–দারোগা। সেপাই। নাগরিক। জমিদার। জমিদার কন্যা।

৫ম দৃশ্য ঃ–প্রেমিক। প্রেমিকা। ছেলের বাবা। মেয়ের বাবা।

৬ষ্ঠ দৃশ্য ঃ–রিপোর্ট–১ম ব্যক্তি, ২য় ব্যক্তি। পঞ্চমদৃশ্যে বিষয় গ্রাম্য সামাজিক ঘটনা উপস্থাপিত হয়। যুবক সাজেন্ন অনিল চৌধুরী। যুবতী সাজেন হরেন দাস (পুরুষ)। যুবকের পিতার ভূমিকায় আসরে নামেন মটর বাবু। মাতার ভূমিকায় তারাপদ সরকার (পুরুষ)।

পেন্টার–নিজেরা। পেন্ট–জিঙ্ক অক্সাইড। বোরোলিন ক্রিম। মিনা। মেটে সিঁদুর। পিউরি। চুমকি। ইত্যাদি।

সঙ্গত-হারমোনিয়াম–সুভাস রায়

বাঁয়া-তবলা–রুদ্রনারায়ণ দাস

মন্দিরা/জুড়ি–শরৎ কর্মকার/অনিল দাস–এঁরা দোহারিও করেন। কর্ণেট– নীরেন দাস। ম্যানেজার–রবীন্দ্রনাথ দাস। সময় ৩ ঘণ্টা। দৃশ্য বদলের সময় যাত্রার মতো কনসার্ট বাজে। ড্রেস ম্যানেজার–ভোলানাথ মণ্ডল।

গম্ভীরার দল–মটরবাবুর দল। যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী (মটরবাবু) মূল ও প্রধান অভিনেতা। রাত্রি ১২টার আগে গম্ভীরা শেষ হলো। বেশ শীত পড়েছে তখন।

সেদিনকার আসরে যাঁরা যে ভূমিকা নিয়েছিলেন–

১। শিব-দুকড়ি চৌধুরী।

২। গায়ক/উচিতবক্তা/নাগরিক–মটরবাবু

৩। বন্দনার গায়ক–তারাপদ সরকার

৪। নাগরিক–বীরেন্দ্রনাথ

৫। নাগরিক–অনিল চৌধুরী

৬। নাগরিক–শরৎ কর্মকার

৭। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়–অনিল চৌধুরী

৮। বরকত গণিখান চৌধুরী–দুকড়ি চৌধুরী } চার ইয়ারী

৯। এম. এল, এ. গৌতম চক্রবর্তী–বীরেন দাস

১০। উচিত বক্তা–মটরবাবু

১১। ভুট্টো–অনিল চৌধুরী

১২। ইন্দিরা গান্ধী–বীরেন দাস

১৩। ভুট্টো-কন্যা–হরেন দাস

১৪। নবুমামা–দুকড়ি চৌধুরী

১৫। গ্র্যাজুয়েট বেকার যুবক

১৬। ১ম জন –বীরেন দাস

১৭। ২য় জন–শরৎ কর্মকার

১৮। ৩য় জন–তারাপদ সরকার

১৯। দারোগা–বীরেন দাস

২০। সিপাই–অনিল চৌধুরী

২১। নির্দোষ যুবক–অনিল দাস

২২। উচিতবক্তা–মটরবাবু/দুকড়ি চৌধুরী/ তারাপদ সরকার

প্রসঙ্গত উল্লিখিত শিল্পী তারাপদ সরকার গম্ভীরার মতো আলকাপেরও শিল্পী। তাঁর নিজের আলকাপের দল আছে। অর্থাৎ আলকাপ/গম্ভীরা দুই লোক-নাট্যের 'ফর্ম' এত কাছাকাছি যে একই দক্ষতা উভয় লোক-নাট্যে সমভাবে প্রয়োগ করা যায়।

মথুরাপুরে পরিবেশিত চার-ইয়ারীর গানের রচয়িতা ছিলেন দুকড়ি চৌধুরী। তিনি মটরবাবুর দলে ঐদিন অভিনয়ও করেন। তাঁর রচিত চার-ইয়ারী সেদিন যা পরিবেশিত হয়–

১। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়–

আমি পশ্চিম বাংলার অভিশপ্ত সিংহাসনে,

বসেছি জন-সমর্থনে

নিয়েছি বাংলার শাসন ভার।
বিদ্যুৎ ও সেচমন্ত্রী (গণিখান চৌধুরী)–
সুজাপুরে জয়-জয়াকার।
৩। পশ্চিমবঙ্গের এম. এল. এ (গৌতম চক্রবর্তী)–
সব্বাইকে টেক্কা মেরে
জিতেছি হরিশ্চন্দ্রপুরে।
৪। উচিত-বক্তা (মটরবাবু)–
তোরা বাহান্ন পাতির তিন টেক্কা
আরকে আছে–দিতে তোদের ঠেক্‌কা
তোরা কপাল জোরে গেলি উতরে
মেরে পাশার চালে ছক্‌কা।
১। আমি পশ্চিমবঙ্গের ধারাপাতের বিধান পালটে দেব
যা পারেনি প্রফুল্ল-ফুল্ল-অতুল্ল....
২। খোদার দোহায় নিজ ক্ষমতায়
সরাবো কচুরী-পানা।
৩। তোমাদের পেলে করুণা
আর আমি কি! চাই না!
৪। ও আমার বাংলাদেশের ময়নারে
তোদের মতো কেউ তো হয়নারে,
বিধবা মেয়ে পরলে গয়না
প্রতিবেশী সয়নারে।
১। আমি অন্যায় আচরণ করে পরিবর্জন
পশ্চিমবঙ্গে লাগাবো চমক
এই প্রতিজ্ঞা আমার।
২। যতদিন আছে ক্ষমতা–করবো যা-তা
ভাবনা কি আমার।
৩। একেই বলে গণতন্ত্র যুগ-যুগান্ত
৪। সাম্য-শান্তির খাসতি কথা
এই কি গণতন্ত্র হে,
দুর্নীতি আর শোষণ নীতির
আত্মঘাতী যন্ত্র হে।
প্লানের পাখায় ঝাঁকায়-ঝাঁকায়
গৌরী সেনের টাকা উড়ায়,
শাসক-সেবক সমান তালে তারা
খোঁজে বখরা দাবীর আখড়া,
তোদের ফুটা হাঁড়ির দোকানদারী

বেশিদিন আর টিকবে না
বাংলার লোককে বোকা ভাবিস না।

মুর্শিদাবাদের আলকাপে 'ছব্‌কা' গানের নমুনা :

তোকে করি মানা ভালো হবে না ছেলে পড়ালে
ছেলে পড়ালে শেষে পড়বি মুশকিলে
ছেলে ইংলিশ পড়বে সকলের মধ্যে খাবে
ধর্ম কেমনে রবে?
স্ত্রী–তোমার কথা শুনবো না
ছেলে মুর্খ রাখব না
সকলে দেবে গঞ্জনা।

স্বামী–আমার হাল বাহা বাচ্চা
করি হালের ব্যবসা,
পড়ালে হবি ফতা ভাসা।
শালী বুঝনা–বুঝলে হাল বাইতে দেনা।

গম্ভীরাতে যেমন ডুয়েট আলকাপে তেমনি ছব্‌কা। আবার মুর্শিদাবাদের গাজনের সময় বোলান নাচটাতেও এ রকম স্ত্রী–পুরুষের বোল কাটাকাটি দেখা যায়। এ ধরনের বোল কাটাকাটি কবি-গানের শেষে কবিয়ালরাও করে থাকেন। তবে বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার ভঙ্গি কিছুটা আলদা-আলদা।

পরিশেষে গম্ভীরা গানের সঙ্গে আলকাপের কিছু তুলনা করা যাক : –

	বিষয়	গম্ভীরা	আলকাপ
১।	ফর্ম–	লোক-নাট্য	লোক-নাট্য
২।	উপলক্ষ–	গাজন (গম্ভীরা) উৎসব	নির্দিষ্ট উপলক্ষ নাই।
৩।	ক্ষেত্র–	মালদহ	মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম, বর্ধমান ও পশ্চিম বঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে অন্যত্র।
৪।	উৎস–	চৈত্রের গাজন, শিবের গাজন	বিবর্তিত হ'য়ে মালদহ ও মুর্শিদাবাদে, এই ফর্মে রূপান্তরিত যা অন্যত্র দৃষ্ট হয়।

৫।	উৎসব-	গম্ভীরা, চৈত্রের গাজন, নৃত্য-গীত-উৎসব, ব্রত-সঙ্গীত, নাটক, মুকাভিনয়, মুখোসনাচ, ধর্মীয় কৃত্যাদি হয়।	কোনও নির্দিষ্ট উৎসব নাই। তবে বিভিন্ন উৎসবে ও মেলায় বাংলা, বিহার ও নেপালে জনপ্রিয়।
৬।	রচয়িতা–	গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত লোক –কবি	গ্রামের স্বল্প-শিক্ষিত লোক –কবি
৭।	অংশগ্রহণকারী–	গ্রামের সাধারণ স্বল্প-শিক্ষিত, দরিদ্র মানুষ, ১০ থেকে ২৫ জন।	হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের স্বল্প-শিক্ষিত মানুষ অংশ নেয়, ১৫-২৫ জন
৮।	দর্শক শ্রোতা দোহার–	গ্রামের সাধারণ মানুষ। গম্ভীরা গানে দোহারিদের ভূমিকা আছে	গ্রামের সাধারণ মানুষ। আলকাপ গানেও দোহারি আছে।
৯।	স্ত্রী-ভূমিকা–	পুরুষেরাই সাধারণত স্ত্রী-ভূমিকায় অংশ নেয়, ইদানিং স্ত্রী-লোকেরা কোথাও কোথাও অভিনয় করছেন।	পুরুষরাই স্ত্রী-ভূমিকায় অংশ নেয়, ইদানিং স্ত্রী-লোকেরা কোথাও কোথাও অভিনয়ে অংশ নিচ্ছেন– বিশেষত পঞ্চরসে।
১০।	প্রশ্নোত্তর অংশ–	গম্ভীরার ডুয়েট অংশে নারী পুরুষের প্রশ্নোত্তর অংশ আছে	আলকাপেও পুরুষ ও স্ত্রী-ভূমিকায় প্রশ্নোত্তর ভূমিকা আছে 'ছব্‌কা'/ ডুয়েট দ্রষ্টব্য।
১১।	বাদ্য–যন্ত্র	ঢোলক, বাঁশি, মন্দিরা কর্ণেট, তবলা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।	ঢোলক, হারমোনিয়ম, সাইড ড্রাম, কর্ণেট বাঁশি, ফ্লুট, তবলা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।
১২।	বিষয়–	সমাজ, রাজনীতি, কৃষি, সামাজিক অন্যায়, গ্রাম্য বিষয় গম্ভীরার অংশ, গ্রাম্য লোক-কবিরা রচনা করেন।	প্রচলিত লোক-গাথা, লোক-কবিদের রচিত নাটিকা, সিনেমা ও অন্যান্য প্রচলিত সুরে স্থূল আঙ্গিকে পরিবেশিত।
১৩।	সংলাপ	নাট্যাংশে প্রধানত তাৎক্ষনিক সংলাপ পরিবেশিত হয়।	নাট্যাংশে প্রধানত তাৎক্ষণিক সংলাপ পরিবেশিত হয়।
১৪।	মুখোস–	গম্ভীরা নৃত্যে (উৎসবের সময়) মুখোস ব্যবহৃত হয়।	সেরকম মুখোসের ব্যবহার নেই, নাট্যাংশের প্রয়োজনে কদাচিত ব্যবহৃত হয়।
১৫।	নৃত্য–	গম্ভীরা গানে নৃত্যাভিনয়ও স্বতন্ত্র নৃত্যাংশ আছে।	আলকাপ গানেও নৃত্যাভিনয় ও স্বতন্ত্র নৃত্য আছে।

১৬।	অভিনয়--	গম্ভীরা গানে অভিনয়াংশ ও তাৎক্ষণিক সংলাপ/খণ্ড কাহিনী বিষয় আছে।	আলাপে ‘কাপ’ অংশে বিবিধ পালা পরিবেশিত হয়, গীতাভিনয় ও তাৎক্ষণিক সংলাপ আছে।
১৭।	সুর–	মালদহে গম্ভীরার নিজস্ব সুরে ও প্রচলিত বিবিধ সুরের সংযোগে গীত।	সুরে বাংলা ও হিন্দী সিনেমার প্রভাব প্রবল, দেশজ প্রচলিত সুরও গ্রহণ করা হয়।
১৮।	পোশাক-পরিচ্ছদ–	পোশাকের বাহুল্য কম, স্ত্রী ভূমিকা, শিব ইত্যাদি প্রয়োজনমতো সামান্য উপকরণে সাজেন।	পোশাকের বাহুল্য নাই। সামান্য উপকরণে সাজেন।
১৯।	পরিবেশনের সময়–	রাত্রে। ৩ ঘণ্টা ও ততোধিক।	রাত্রে। কখনো সারা রাত ধরে চলে।
২০।	অশ্লীলতা	এক সময় ছিল। এখন নাই।	এক সময় প্রবলভাবে ছিল। এখনো কিছুটা দেখা যায়।
২১।	বৈঠক–	বৈঠক দেবার রেওয়াজ আছে। গুরুত্ব কম।	বৈঠক দেবার রেওয়াজ আছে। গুরুত্ব কম।
২২।	আর্থিক সাফল্য–	অপেশাদারী।	প্রধানত অপেশাদারী। পেশাদারী আলকাপের দল জঙ্গীপুর অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত।
২৩।	পরিচালক–	সাধারণ গ্রামের অতি সাধারণ অল্প শিক্ষিত মানুষেরা।	সাধারণত: গ্রামের অতি সাধারণ অল্প শিক্ষিত মানুষেরা।

গাম্ভীরা

আতাউর রহমান

রাজশাহীর লোকসংগীতের কথা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে পূর্ব বাংলার কথা। মনে পড়ে পূর্ব বাংলার মাঝিদের প্রাণ আকুল করা ভাটিয়ালি আর বাউলের সুর। রাজশাহী জেলার লোকসংগীতের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বভাবতই ইতস্তত করতে হয়, কেননা এ ধরনের লোকসংগীত অন্যান্য জেলায়ও প্রচলিত দেখা যায় এবং এই কারণে এই সব গীতি আসলে রাজশাহীর কিনা এ ব্যাপারে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেন।

নদীর ধারে গোসল করার সময় দূরে দ্রুত চলমান নৌকা থেকে ভাটিয়ালি গানের সুর আমাদের কানে এসে মধুর তানে অনুরণিত হয়। কিন্তু সে গান রাজশাহীর নয়। পূর্ব বাংলার মাঝিরা ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যপদেশে এ জেলায় আগমন করে আর তাদেরই গলা থেকে ভেসে আসে ভাটিয়ালি সুরের মূর্চ্ছনা। এমনি ব্যবসা সূত্রে কিনা বলা যায় না, এ দেশে সত্যপীরের কাহিনীও সর্বত্র সুপ্রচলিত হয়েছে।

কারণ যাই হোক, এইগুলি এই জেলার লোকসংগীতের একটি বিশিষ্ট অংগ। প্রবীণদের কাছ থেকে জানা গেছে গ্রামে গ্রামে এ সব লোকসংগীতের প্রচলন বহুকাল থেকেই চলে আসছে। গ্রামের বহু যুবক 'যাত্রা' এবং 'আলকাপ' গানে পিতৃকুলের যথা–সর্বস্ব শেষ করেছে এরূপ প্রবাদও প্রচলিত। অবশ্য এ ধরনের গানের প্রচলন আজকাল বিশেষভাবে কমে এসেছে। তবে হিন্দুদের পূজা-পার্বণ উপলক্ষে এখনও মনসার ভাসানের গান ও ঝুমুর নাচের আসর দেখা যায়। ভাদ্র মাসে ক্ষেতের কাজ শেষ হলে প্রায় গ্রামেই রাত্রি বেলায় আসর জমিয়ে সত্যপীরের কাহিনী বলতে শোনা যায়। এই কাহিনী বলার প্রথা বহু প্রাচীন।

এই সব রাজশাহী জেলার লোকসংগীতের সাধারণ পরিচয় হলেও এর সবগুলি অন্যান্য জেলায় কমবেশি প্রচলিত আছে। কিন্তু রাজশাহীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলতে যদি কিছু থাকে তবে সে গাম্ভীরা গান। রাজশাহীর গাম্ভীরা গান প্রকৃতপক্ষে মালদহের গাম্ভীরা গানের সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্যসঞ্জাত। এইসব গানের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্যে মনে হয় এইগুলি মালদহ জেলার নিজস্ব সম্পদ। তবু একে রাজশাহীর বলে চালাতে যাওয়ার দুটি কারণ আছে। প্রথমত রাজশাহী জেলা মালদহ জেলার সংলগ্ন। মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী জেলার কথ্য ভাষার মধ্যে বরাবরই কিছুটা সাদৃশ্য বর্তমান ছিল। তার ফলে গাম্ভীরা গান ক্রমশ রাজশাহী জেলার গ্রামে গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়ত মালদহ জেলার যে অংশে এই গান সুপ্রচলিত ছিল, দেশ বিভাগের ফলে সেই অংশ রাজশাহী জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদের গৌরব রাজশাহী জেলার মধ্যে দিয়েই প্রকাশ করছে।

গাম্ভীরা গানের প্রাচীনত্ব গবেষণার বিষয়। প্রাচীন কালের গাম্ভীরা গান সংগ্রহ এবং এর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে গবেষণা করলে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। গাম্ভীরা গানের উৎপত্তির সঠিক

বিবরণ অনুসন্ধানে দুইটি সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত 'গম্ভীরা গান শিব পূজার অংশ অর্থাৎ শিবের উপাসনা গীতি'। দ্বিতীয়ত গাম্ভীরা আঞ্চলিক সালতামামী অর্থাৎ 'বর্ষ বিবরণী গীতি।'

দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলার লোকসাহিত্যে' লিখেছেন–

'আসামের আদিম অধিবাসী ঈঙ্গমঙ্গলয়েড জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে বাৎসরিক উপজাতীয় অধিবেশন (Tribal council) উপলক্ষে যেরূপ নৃত্য সহযোগে বর্ষ-বিবরণী পর্যালোচনার রীতি প্রচলিত আছে, গাম্ভীরা গানের ভিত্তিও তাই। গাম্ভীরা গানের সঙ্গে গাজনের কোনো সম্পর্ক নাই।'

কবি বনমালী কুণ্ড 'পরিচয়' পত্রিকায় লিখেছেন–

'গাম্ভীরা মালদহ জেলার বর্ষ-বিবরণী সংগীত। সারা বৎসরের ঘটনাবলি ও কীর্তিকলাপকে অবলম্বন করে এই গান রচিত হয়। বৎসরের শেষ তিন দিন এই গানের অনুষ্ঠান হয়। কোনো কোনো সময় নতুন বৎসরের বৈশাখ মাসব্যাপি এই সংগীত পরিবেশন অনুষ্ঠান জাঁকজমকের সাথে চালু থাকে।'

প্রথম কারণ সম্বন্ধে 'বেদে' আছে–

'আদি রদ যুগবর্তো গাম্ভীরা বৃষ বাহন'

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে–

'গাম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রালব
ভিতে মুখে শির মধ্যে ক্ষত হয় সব।'

গোবিন্দচন্দ্রের গীতে আছে–

'আপনার কায়া ছাড়ি গাম্ভীরে রাখিয়া
মায়াপতি যাত্রা কৈল দৈবজ্ঞ হইয়া।'

এই খানে 'গাম্ভীরা' শব্দের অর্থ–(১) শিবের নাম গাম্ভীর্য, (২) গাম্ভীর্য, (৩) যোগাসন, (৪) মন্দির দ্বার।

মূলত শিবকে অবলম্বন করেই যে গাম্ভীরা গানের জন্ম এ ধারণা অনেকেই করে থাকেন। দেবতা পূজার উল্লেখ গাম্ভীরা গানেই বর্তমান। যেমন–

(ক) কোথা হতে আইলেন গোঁসাই কোথায় তোমার স্থিতি
আহার নাই পানি নাই আস নিতি নিতি
কর্পূরেতে ওর কর পবন আহার
শিব নাথ কি মহেশ।

(খ) না ছিল জল স্থল দেবের মণ্ডল
কোনরূপে ছিল ধর্ম হয়ে শূন্যকার
কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা বিন্দু পরিমাণ।
বিন্দু পরিমাণ মধ্যে তিল পরিমাণ,
কূর্মের পৃষ্ঠে পৃথিবী করিল সৃজন।
কহেন গুরু গোঁসাই সরস্বতীর বরে

পৃথিবীর জন্ম কহি সবাকারে
শিব নাথ কি মহেশ।

এই গানগুলির মধ্যে রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের প্রতিধ্বনি স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়। বোঝা যায় যে গাম্ভীরা গান সুদূরতম প্রাচীন অনার্য জীবনাদর্শের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। তবু একে বর্ষ-বিবরণী গান বলে দাবি করারও যথেষ্ট কারণ আছে। অমল স্যান্যাল 'পরিচয়' পত্রিকায় লিখেছেন–

গাম্ভীরা সঙ্গীতের যেমন একটা বিশেষ ভৌগোলিক ক্ষেত্র আছে-সেটা হচ্ছে মালদহ জেলা, তেমনি তার একটা বিশেষ কালও আছে, সেটা হচ্ছে বৈশাখ মাস।--- অনুষ্ঠানের প্রথম দিন 'ছোট তামাসা', দ্বিতীয় দিন 'বড় তামাসা'; এই দুই দিন নানা রকম মুখোশ পরে কেউ শ্মশানকালীর, কেউ রক্ষাকালীর, কেউ রাধাকৃষ্ণের ভূমিকায় নাচে, কেউ সারা বৎসরের কীর্তিকালাপ অনুকরণে 'সং' বের করে সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে। তৃতীয় দিন হতে আরম্ভ হয় গাম্ভীরা গান। সারা বৎসরের ঘটনাবলির উপর রচিত এই গান চলে এক মাস যাবত। প্রত্যেক দিনের আসরে একটি করে বাৎসরিক রঙ্গীন রিপোর্ট গেয়েই আসর ভঙ্গ দেওয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বাৎসরিক এই রঙ্গীন রিপোর্ট না গাওয়া হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রোতারা আসর ভঙ্গ দিয়ে যান না। গানের শেষের রিপোর্টগুলি থাকে নিম্নরূপ–

(ক) পুরুষ : শুনে যা ও কানার মা,
সালি আনা মজার খাবোর।
স্ত্রী : জমা রেখে হরেক খবর
পেট করেছি উবোর খাবার
থাকে যদি দরকার রে তোর
দিতে পারিস পাল্লার আসর।

(খ) বেচি পঞ্জিকা আমি দিয়ে সৎ সন্ধান
(গোটা) সালের খবর জানতে পারেন
সাড়া দিয়ে যান।
কিনে দেখুন পঞ্জিকাখানা
খবর পাবেন জানা অজানা
পূর্ণ হবে মোনের বাসনা জুরাবে পরান।

এই সমস্ত গান পাঠ করলে বেশ বোঝা যায় যে, শিব পূজার সঙ্গে বৌদ্ধ পূজার যেমন সংমিশ্রণ ঘটেছে, তেমনি গাম্ভীরা গানের উপাসনা গীতির সাথে বর্ষ-বিবরণীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই সংমিশ্রণের কারণ জানতে হলে ধারাবাহিকভাবে কিছু গান নিয়ে আলোচনা করাই উত্তম।

পুরাকালে প্রাচীন গৌড় ভূমিতে সূর্যবংশের বহু লোক বাস করতেন। তাঁরা প্রত্যেকেই শিব পূজা করতেন। শশাঙ্ক, হর্ষবর্ধন, পালবংশের রাজগণ ও সেন বংশের রাজগণ সকলেই শিব পূজা করেছেন। গুপ্তযুগে যদিও কেউ কেউ মাঝে মাঝে ব্রহ্মার পূজা করেছেন তথাপি শিব ও বিষ্ণু পূজাই ছিল প্রধান। তখনকার দিনে হিন্দু রাজাগণের বিশ্বাস ছিল–

"যাঁরা করেন শিবের পূজা
তাঁদের পুত্র হয় রাজা।"

সুতরাং শিবপূজার সময় মন্দিরে মহাদেব বসে থাকতেন স্তিমিত নয়নে। আর তাঁকে উপলক্ষ করে পূজা অন্তে গাওয়া হতো এই গাম্ভীরা গান। তখনকার দিনের রচনার ভঙ্গি ছিল–

"শম্ভুরাম ভায়ার ভবণ কর প্রভু
পদছায়া দিয়া ছেড়ে নাহি কভু।"

রাজনৈতিক অবস্থা ও কাল ভেদে মুসলমান রাজত্বের পূর্বেই তখনকার কবিগণ সামাজিক সমালোচনায় গান রচনা আরম্ভ করেছিলেন। তবে তখনও প্রার্থনার ভঙ্গিতে বর্তমান ছিল–

"শ্যাষে রাখলিনা ক্যান
মা সরস্বতীকে (শিবহে)
তাড়ালি তাকে গাঁজার ধুয়াৎ
তোর এমনি পাগলা মতি হে
মায়ামতী অভাবে এই দ্যাশে,
লোকে বোকা হয়্যা আছে বসে,
চোখ দ্যাখ না একনা খুইলা,
ভোলা গেলিকে তুই ভুইল্যা।"

কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে বিশেষ কারণে জনসাধারণ তার শূল ভেঙ্গে লাঙ্গল গড়িয়ে মঙ্গল চণ্ডী, বিষহরি ও শীতলা ধর্ম প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতাকে খুঁজে বের করে। যারা নামে মাত্র শিব ভক্ত থাকে তাদের প্রার্থনার ভাষা পরিবর্তন হয়ে যায়।

"এবার কোন পূজা খাবে শিব বল না
কেন দেখি তোমার আজি শূল ভাঙ্গা
দিব পূজার নামে কাঁচ্চা কলা
কেন দিয়াছ মোদের দুঃখ-জ্বালা
খাও কচুপুরা ছাড় আসনখানা।"

আদি দেবতা শিবের প্রতি মানুষের এই অবহেলা দেখি কর্ণগড়ের রাজা যশোমন্ত সিংহের রাজত্বকালে রামেশ্বর নামে এক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শিবকে দেবতার আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'শিবায়ন' গ্রন্থ রচনা করেন। শিবায়ন গ্রন্থ রচনার পর গাম্ভীরা গানের ভাষা আবার একটু সংযত হয়েছিল। যেমন–

(১) দ্যাখ দ্যাশের দশা হোলা খোস
এমনি কে অজ্ঞান?
করি হামরা এই মিনতি
দ্যাশের কাজে দে মতি
নাই কি তোমার জ্ঞান?
যায় সময় চল্যা

বাহু তুল্যা ধর ধর্ম নিশান।

(২) যাত্রা থিয়েটার কীর্তনাঙ্গ
সকলকেই করেছে সাঙ্গ
কলের মধ্যে সবাই বন্ধ
কাউকে ছাড়ে নাই
কেবল বাকি আছে তারা
যারা গাম্ভীরা গান গায়।
সুশিক্ষিত মাহাত্মারা
কলের গানে আত্মহারা
বিলাস পূরণে তারা
কলের গান আনায়
ঘরের পয়সা যায় ভাইস্যা
দিশা করা চাই॥"

প্রাচীন কবিগানের প্রখ্যাত রচয়িতাদের মধ্যে লোহারাম মণ্ডলের পরে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেন সুবল দাস, গোপাল দাস ও মৃত্যুঞ্জয় হালদার। তাদের সময়ে যে সমস্ত গান রচিত হয়েছিল তাতে পৌরাণিকত্বের ভাব বর্তমান ছিল। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের আমলে সতীশ কবিরাজ, ধরণীধর, গোপিনাথ, মোহাম্মদ সুফি, আবদুর রহমান, ফজলুল হক, ভজু ইত্যাদি কবিগণের আবির্ভাবে রাজনৈতিক চেতনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন–

(১) শুন বাঙ্গালি গাদ্ধা তোদের
নাই বাংলার উন্নতি
টেরী কেটে চশমা এঁটে
সেজে ছিল নবাব নাতি।
তোরাই দেশের রাজা ছিলি
বিলাসিতায় হারিয়ে দিলি
সালাম গিরি চাকরী পেলি
হায় কি তোদের দুর্গতি।
(মোহাম্মদ সুফি),

(২) ধরণী ধরের এক কথা
অন্য কোন কথা নাই
তোমার কাছে এই মিনতি
পূর্ণ স্বাধীনতা চাই।'
(ধরণী ধর)

এসব কবিদের মধ্যে মোহাম্মদ সুফি ছিলেন অন্যতম। তাঁরা শুধু বিভিন্ন সমালোচনার গান রচনা করতেন না। তাঁদের গানে যেমন স্টাফোর্ডক্রিপ্‌সের ভূমিকা থাকত তেমনি স্থানীয় দোকানদার, কর্মচারী, আমলাতন্ত্র ও মজুতদারেব ভূমিকায়, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি দুর্নীতির ভূমিকায় এমনকি জনসাধারণের ভুলভ্রান্তির ভূমিকায় থাকত। এখন বেশ বোঝা

যায় যে, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় আলোড়নের সাথে সাথে গাম্ভীর কবিদের সমাজচেতনা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে। সুতরাং তাঁদের গান রচনার ভঙ্গিও পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই পরিবর্তন সম্বন্ধে ডকট্‌র সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী 'বাংলার লোকসাহিত্য'-এ আক্ষেপ করে লিখেছেন–

নিত্য নতুন ঘটনা বা অবস্থার উপর নির্ভর করে প্রতি বছরই বহু গাম্ভীরা গান রচিত হচ্ছে। নতুন গান রচনার সময় সম্ভবত রচয়িতা বা সুর রচয়িতারা সমসাময়িক সঙ্গীতের আবহাওয়া থেকে মুক্ত হতে পারছেন না। ফলে এর কাঠামোর পেছনে পাচ্ছি একদিকে শিল্প সঙ্গীত বা অন্যান্য এমন সঙ্গীত যা লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে না এবং অন্যদিকে লোক-সঙ্গীত–এই উৎসবের একটি যোগসূত্র গাম্ভীরা।*

অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন মাসিক 'মোহাম্মদী'তে লিখেছেন–

'দেবতার পূজা অবলম্বন করে মানুষের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা গাম্ভীরা গানে ধরা পড়েছে। অধুনা খবরের কাগজের যে উদ্দেশ্য, প্রাচীন ইসলাম-পূর্ব আরবের মেলায় আরবি কবিতা প্রতিযোগিতার যে উদ্দেশ্য ছিল, গম্ভীরা গানের একই উদ্দেশ্য।'

তাঁদের এই কথার পিছনে হয়ত যথেষ্ট যুক্তি ও প্রমাণ তাঁরা রেখেছেন আর থাকাও স্বাভাবিক; তবে এই সঙ্গীত যে অন্যান্য লোকসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত সেকথা সকলের স্বীকার করতেই হবে। কারণ এই উপমহাদেশের সভ্যতার প্রাচীনতম তন্তুর যে সমস্ত অবলুপ্ত ও অবহেলিত লোকসঙ্গীত লোক চক্ষুর অন্তরালে ফলগুধারার মতো প্রবহমান গাম্ভীরা সঙ্গীত তাদের মধ্যে অন্যতম। বহু পূর্ব হতেই রাজশাহীতে এর চাহিদা ছিল। বর্তমানেও যে না আছে এমন কথা বলা যায় না। তবে দুঃখের বিষয় এই গান সংগ্রহের ব্যাপারে তেমন কাউকে অগ্রসর হতে দেখেছি না। এগুলো আমাদের দেশের অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদ কিছুতেই হারানো উচিত নয়।

* বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন : ৬৭ ঢাকা, ১৯৯৫

গম্ভীরা

ড. মাযহারুল ইসলাম তরু

বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় প্রচলিত এক শ্রেণীর লোকসংগীতের নাম 'গম্ভীরা'। গম্ভীরা শব্দটির অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হলেও আজ পর্যন্ত তার অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট ফোকলোর গবেষক ড. প্রদ্যোৎ ঘোষ তাঁর 'লোকসংগীত: গম্ভীরা' শীর্ষক গ্রন্থে শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত যে অর্থ নির্ণয় করেছেন তা হচ্ছে–গম্ভীরা (গম্ভীর মূল)

১. পুরীধামে কাশীমিশ্রের ভবনে চৈতন্যদেবের বাসস্থান নিভৃত গভীর প্রকোষ্ঠ, অলিন্দের পর দালান, তার ভেতরে ক্ষুদ্র গৃহ।
   "গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা লব" (চৈতন্য চরিতামৃত৩১৩)
   "গম্ভীরাতে স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে শোয়াইল" (চৈতন্য চরিতামৃত–৩৫০)
২. জগন্নাথ দেবের শয়ন মন্দির গম্ভীর।
   "গম্ভীরা কক্ষে অন্ধকার অতি গম্ভীরা কুহরে জ্বলে প্রদীপ সন্ততি"(চৈতন্য চরিতামৃত ৩০৩)
৩. গ্রাম্য দেবতার স্থান (দিনাজপুর)।
৪. শিবের মন্দির, গাজন ঘর, গাজন উৎসব।[১]

অবশ্য অন্ধকার প্রকোষ্ঠ বা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ সম্পর্কে অন্যান্য গবেষকও একমত। কারণ মধ্যযুগের অনেক কাব্যে এই অর্থে 'গম্ভীরা' শব্দটির অনেক প্রমাণ মেলে। তবে আমাদের আলোচ্য 'গম্ভীরা' শব্দের সাথে গৃহ, মন্দির বা তাদের অন্তঃপ্রকোষ্ঠের কোন সম্পর্ক নেই। গম্ভীরা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে কোন কোন গবেষক শিব মন্দির অর্থেই শব্দটি গ্রহণ করার পক্ষপাতি।[২] কারণ শিব বা মহাদেবের অপর নাম গম্ভীর। আর সংস্কৃত 'গম্ভীর' শব্দ থেকেই 'গম্ভীরা' শব্দ এসেছে তা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। সুতরাং চলতি কথায় এই মহাদেবের বন্দনা গীতই গম্ভীরা।[৩] দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে গম্ভীরা এখন আর শিব বন্দনা বা মহাদেবের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোন লোকাচারকে বোঝানো হয় না। গম্ভীরা বলতে এখন একটি বিশেষ জনপ্রিয় লোকসংগীতকে বোঝায়। এই লোকসংগীতের উদ্দেশ্য শিব বন্দনা নয়, সমাজ সমালোচনা।[৪] আর তাই জাতি–ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ সংগীত আজ সবার প্রিয়।

উৎপত্তি : প্রাচীনকালে 'গম্ভীরা' পূজা উৎসব হিসেবেই প্রচলিত ছিল এবং এর উদ্ভব প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে অনুমান করা হয়।[৫] এ পূজা সাধারণ শিব বা মহাদেবকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হতো যা শিবের গাজন নামে পরিচিত ছিল। পশ্চিম বাংলার মালদহ জেলার কোথাও কোথাও এখনও তার অস্তিত্ব টিকে আছে।[৬] ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য গম্ভীরা গানের সঙ্গে গাজনের সম্পৃক্ততা স্বীকার করতে রাজী নন। তাঁর মতে, গম্ভীরা গানে

দীর্ঘদিন ধরে মূর্তি উপস্থাপন করার প্রথা প্রচলিত ছিল। তবুও তাঁর মতে গম্ভীরা লোকসংগীত ছাড়া আর কিছুই নয়।[৭] আর এই লোকসংগীত উদ্ভবের পেছনে একটা বিশেষ জাতিগত এবং ভৌগোলিক পরিবেশগত প্রভাব রয়েছে তা অস্বীকার করা যাবে না।

ভৌগোলিক দিক দিয়ে এই সংগীতাঞ্চল উত্তরবঙ্গ বা বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত। এই অঞ্চলের উত্তরাংশ প্রধানত কোচ জাতি দ্বারা অধ্যুষিত। কোচ জাতি ভারতের অতিপ্রাচীন আদিবাসী, রাঢ় অঞ্চলে যে অধিবাসী সমাজ ক্রমে ক্রমে হিন্দু ভাবাপন্ন হয়েছে তার সাথে কোচ জাতির মৌলিক কোন সম্পর্ক নেই। রাঢ় দেশীয় আদিম অধিবাসী প্রধানত আদি অস্ত্রাল (Proto-Australiod) গোষ্ঠীভুক্ত, কিন্তু উত্তরবঙ্গের আদিম অধিবাসী ইন্দোমোঙ্গলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত, ইন্দো-মোঙ্গলয়েড অন্যান্য জাতির মতো পীতবর্ণ নয়। বরং কৃষ্ণবর্ণ।[৮] যদিও এরই পাশাপাশি পলিয়াদের চেহারায় পরিষ্কার ইন্দোমোঙ্গলয়েড ছাপ বিদ্যমান। এই ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে 'গম্ভীরা উৎসব' বা বাৎসরিক উপজাতীয় অধিবেশন (Tribal Council) উপলক্ষে সঙ্গীত ও নৃত্য প্রচলিত ছিল। শিবকে উপলক্ষ করেই সাধারণত বর্ষবিবরণী বা 'বর্ষ পর্যালোচনা' হিসেবে এগুলোর পরিবেশন হতো। এসব হতেই গম্ভীরা গানের উদ্ভব বলে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন।[৯] গবেষকবৃন্দ গম্ভীরা সম্পর্কে যে মতামতই ব্যক্ত করুন না কেন সার্বিক দিক বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই যে, গম্ভীরা মূলত পূজা উৎসব হিসেবেই উদ্ভূত হয়েছে।

শ্রেণীবিন্যাস : মধ্যযুগে কৃষ্টি কালচারের প্রধান অবলম্বন ছিল বিভিন্ন লৌকিক দেব দেবীর গুণকীর্তন। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীকে কল্পনা করে পূজা উৎসব হতো। নিজেদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-অভিযোগ, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতি তাদের পাদপদ্মে নিবেদন করে প্রতিকারের আশায় বসে থাকতো। এইভাবে চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি লৌকিক দেবতা সম্পর্কে মানুষের মনে বিশ্বাস গড়ে ওঠে। ধর্ম ঠাকুরের পূজা শুরু হয় এই প্রেক্ষাপটেই।[১০]

শিব ও ধর্মঠাকুর অভিন্ন কল্পিত হওয়ায় কোন কোন অঞ্চলে আদ্য নামেও পরিচিত! এ কারণে হরিদাস পালিত শিবের গাজনকে 'আদ্যের গম্ভীরা' বলে উল্লেখ করেছেন। তবে বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে তো নয়ই, এমন কি পশ্চিম বাংলার বৃহত্তর মালদহ জেলার কোথাও আদ্যের গম্ভীরার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।[১১]

প্রাচীনকালে এসব কারণেই 'গম্ভীরা' দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যথা–

১. শিবের গাজন বা আদ্যের গম্ভীরা

২. পালা গম্ভীরা বা গম্ভীরা গান।

আদ্যের গম্ভীরা সাধারণত হিন্দু সমাজে প্রচলিত ও দেব-দেবীর বিষয় নিয়ে রচিত হতো। অন্যদিকে পালা গম্ভীরায় তৎকালীন সংঘটিত বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্থান পেত।[১২]

গম্ভীরার বিবর্তন : গম্ভীরা গানের উৎস মূলত 'বর্ষ বিবরণী' বা বর্ষ পর্যালোচনা থেকেই। সারা বছরের বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা সমস্যা, অভাব-অভিযোগ এতে স্থান পেত এবং মধ্যযুগীয় সনাতন বিশ্বাসে শিবকে সুখ-দুঃখের নির্বিকার প্রতীকরূপে কল্পনা করে তাঁর কাছে নিবেদন করা হতো। অর্থাৎ মানুষ যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন

হয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছে, তখনই তার প্রতিকারার্থে সঙ্গীতের মাধ্যমে শিবের স্মরণ নিয়েছে। তাদের বিশ্বাস, এ সবকিছুই হয় শিবের ইচ্ছায়। শিবই সকল প্রকার সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে দুর্ভোগের একমাত্র কারণ।[১৩] এখানে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে–

শিব তোমার লীলাখেলা কর অবসান
বুঝি বাঁচে না আর প্রাণ।
অনাবৃষ্টি কর‍্যা সৃষ্টি
মাটি করল্যা নষ্ট হে
দৃষ্টি থাকতে কষ্টি কর‍্যা
দেখছ নাকি কষ্ট হে
মিষ্ট কথায় তুষ্ট কর‍্যা
শিষ্ট লোকের ইষ্ট মার‍্যা
করল্যা মোদের গুষ্টি ছাড়া।
শুন বলি পষ্ট কর‍্যা
তারপরে ম্যালেরিয়ায়
হলাম হালাকান,
বুঝি বাঁচে না আর জান।
অন্নদা মা ভিক্ষা তোমার
করবে নাকি দানা হে,
সময়কালে না হয়্যা জল
অসময়ে ফলল কুফল।
(ওসব) মুশরী কালাই গ্যালো ডুব্যা
ক্ষেতের ফসল ম'ল
আম গ্যালো ছালা গ্যালো
ক্যামনে ধরি গান
বুঝি বাঁচে না আর জান।[১৪]

এই গানটিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট অভাবের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে শিবের উদ্দেশ্যে। কারণ সরল কৃষক মনে করে, শিব যেমন দরিদ্র ও নিঃসহায়, তেমনি তিনি সকল কৃষক সমাজেও দারিদ্র্যের কারণ। তিনি ইচ্ছে করলেই সমাজের এই দুঃসহ দুঃখ দারিদ্র্যের অবসান করতে পারেন–

প্যাটেতে ভাত নাই, ও শিব, গোলাতে[১৫] নাই ধান
কি দিয়্যা বাঁচাবো ও শিব ছেল্যা পিল্যার জান।
ও বুঢ়া[১৬] শিব দয়া করো
পরণে তেনা নাই ও শিব বরজে[১৭] নাই পান।
কি দিয়্যা রাখিবো ও শিব মাইয়া[১৮] লোকের মান
ও বোকা শিব দয়া করো।[১৯]

নিস্ক্রিয়তা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য কৃষক-কবির নিকট শিব কৃপার পাত্র হয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেবতার সাথে মানুষের যে একটা সহজ সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় গম্ভীরা গানে তার ব্যত্যয় ঘটেনি।[২০]

বিশ শতকের প্রারম্ভে গম্ভীরা গানে শিব মূর্তি তিরোহিত হয়। সে স্থান দখল করে মানবরূপী শিব। অর্থাৎ শিবের প্রতীকে একজন মানুষকে দাঁড় করিয়ে তাঁর কাছে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপস্থাপন করে ফরিয়াদ জানানো হতো। যেমন–

(তুমি) কেন উদাসী, কাশীবাসী, ওহে কাশীশ্বর।
দুনিয়াটা যায় রসাতল[২১] রক্ষা করো হর॥
কামার, কুমার, ছুতার, চাষা
ছাড়লো তার জাত ব্যবসা
চাকরি লয়ে বাবু হয়্যা ভাবছে কতো বড়।
গাঁয়ের মাটি শিল্প হলো মাটি
বাংলার মাটি আছে খাঁটি
কৃষি শিল্প শিখাও মোদের
(তুমি) দেশকে তুলে ধর।
চাষ উন্নতি করতে হলে
চলবে না আর পুরানা চালে
দেশ-বিদেশের নতুন নিয়ম
আমদানি সব করো।
রং তামাসা টুকীর গানে
দেবতা গলায় উলু বনে
শিখাও মোদের ভক্তি মন্ত্র
পূজা-গঙ্গাধর।[২২]

বিশ শতকের প্রারম্ভে, রচিত গম্ভীরা থেকে শিবমূর্তি তিরোহিত হলেও তখন পর্যন্ত তাতে শিব পূজার প্রভাব বিদ্যমান থাকে। পরবর্তী সময়ে দুই বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার প্রেক্ষিতে সমাজ মানসে পরিবর্তন আসে। গম্ভীরা গানেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। মানুষ সচেতন হয়। তারা ব্রিটিশ সরকারের শোষণে অতিষ্ঠ হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। তাই তাদের গম্ভীরায় শিব আর মহাদেব না হয়ে, হয়ে ওঠে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি। তার সামনে শিল্পীরা ব্রিটিশ সরকারের সামগ্রিক দুর্নীতির কথা তুলে ধরতেন বলিষ্ঠতার সাথে। ফলে গম্ভীরা গান বর্ষ পর্যালোচনা বা বর্ষ বিবরণী উপস্থাপনার পরিবর্তে হয়ে ওঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অন্যতম মাধ্যম। সরকারের সমালোচনায় মুখর একটি গানের কিছু অংশ হচ্ছে–

জমি-জমা চাষ করে যা ফসল উঠাই
তাহে মোরে কি স্বত্ব নাই?
তুমি ওজন করিয়া কাগজ ধরাইয়া
গাড়ি করো বোঝ।

ভারতে অর্জিত জিনিস তুমি কর চালান
আমরা ভারতের লোক খেটে মরি
বাঁচে কিনা জান
ধন্য তুমি বুদ্ধিমান।[২৩]

শিবের এই প্রতীকী পরিবর্তনের পেছনে একটা চিত্তাকর্ষক ঘটনা রয়েছে। ড. প্রদ্যোৎ ঘোষ তাঁর 'লোকসংস্কৃতি : গম্ভীরা' গ্রন্থে ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন। ১৯২০-২৩ খ্রিস্টাব্দের কোনও এক সময় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মালদহ আসার কথা ছিল। স্থানীয় প্রখ্যাত গম্ভীরা লেখক ও গায়ক মোহাম্মদ সুফী মাষ্টার স্যার আশুতোষ অর্থাৎ শিবের সামনে গম্ভীরা গাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একজন পাত্রকে শিব সাজিয়ে আসরে হাজির করেন। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত স্যার আশুতোষ মালদহে না আসায় তাঁর এক প্রতিনিধি আসেন। তবুও সুফী মাষ্টার শিবকে উপস্থিত করে গান গেয়েছিলেন। গানটির অংশ বিশেষ–

হে দ্যাখ্, হে দ্যাখ্ কারে ডাকতে
কেডা এলো ভাইরে–
ইনি কি স্যার আশুতোষ?
হাইকোর্টের জজ
গায়ে মাখা কেন ছাইরে?[২৪]

এ ঘটনার পর থেকে সব গম্ভীরায় শিব উপস্থিত হতে থাকেন, সর্বকালের হোতা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে। সুতরাং শিব চরিত্রকে সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের প্রতিভূরূপে গম্ভীরা গানে উপস্থিত করা এবং তাকে জনপ্রিয় করে তোলার মূলে সুফী মাষ্টারের অবদান অনস্বীকার্য।[২৫]

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর গম্ভীরা গানের পৃষ্ঠপোষক ও গায়েনরা মালদা ত্যাগ করে এদেশে চলে আসেন। ফলে আদি উৎপত্তিস্থল মালদহে এ গানের চর্চা দারুণভাবে কমে যায়। অন্যদিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহী জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমায় গম্ভীরার ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে। এতদাঞ্চলে গম্ভীরা গানের প্রবর্তনকারীদের মধ্যে যাঁরা অগ্রপথিকের কাজ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শেখ সফিউর রহমান বা সুফি মাস্টার, মোহাম্মদ সোলায়মান মোক্তার, মোহাম্মদ মোহসীন আলী মোক্তার, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ ফজলুল রহমান, তৈয়ব আলী, লুৎফল হক, মনিমূল মাস্টার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। [২৬]

বিভাগোত্তরকালে রাজশাহীর গম্ভীরা গানে শিবের অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে এবং সে স্থান দখল করে নানা ও নাতি। নানা নাতি সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যত রসিকতা চলতে পারে, ততটা অন্য কোনও সম্পর্কে সম্ভব নয় বলেই সম্ভবত এই বিবর্তন।[২৭] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, গম্ভীরা গানের উদ্দেশ্য হলো কৌতুকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে শাসক শ্রেণীর তথা সমাজের দোষ-ত্রুটি, গ্লানি বা অসঙ্গতি দর্শক-শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরা। আর তাই পাকিস্তান আমলে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী গম্ভীরা গানকে ভালো চোখে দেখেনি। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

পৃষ্ঠপোষকতায় গম্ভীরা গান নতুন জীবন লাভ করে এবং নানাবিধ বিষয় তার মধ্যে সন্নিবেশিত হয়ে উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে চলে।২৮

গম্ভীরা পরিবেশনের প্রচলিতরীতি : বরেন্দ্র অঞ্চলের তথা বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গম্ভীরা গানের কথা বলতে গেলেই আসে ডুয়েট বা দ্বৈত গম্ভীরার কথা। নানা আর নাতিই মুখ্য চরিত্র, তাদের কথাবার্তা, নাচ ও গানের মাধ্যমেই গম্ভীরা গানের সূচনা থেকে শেষ হয়। তবে বন্দনা পরিবেশনের রীতি রয়েছে বর্তমান গম্ভীরা গানেও, যা অতীতেও পরিবেশিত হতো। তবে পার্থক্য হচ্ছে পূর্বের বন্দনা ছিল শিব বা মহাদেবকে উপলক্ষ করে আর বর্তমান বন্দনা যুগোপযোগী বিষয় ভিত্তিক। যেমন–

কাঁদবি কতো কাল, মা তোর কি জঞ্জাল॥
মাগো তোর অর্ডারে যুদ্ধ হলো
কত রক্ত দিয়্যা স্বাধীন হলো
কতো নেতা আইলো গ্যালো
মোরা হইনু শুধু নাজেহাল॥
মাগো, মনে করি হলাম স্বাধীন
কিন্তু মোরা বিশ্বের অধীন
আবার মরবো যেদিন হবো স্বাধীন
তোর স্বাধীনে কিবা ফল। ২৯

এই বন্দনার পরই শুরু হয় মূল গম্ভীরা গান। নানা-নাতি ছাড়াও গম্ভীরা গানে নিম্নলিখিত সহযোগী শিল্পী থাকেন–

১. দোহার–৬/৭ জন
২.হারমোনিয়াম বাদক–১ জন
৩.তবলা বাদক–১ জন
৪. জুড়ি বাদক–১ জন

হারমোনিয়াম, তবলা ও জুড়ি বাদকেরাও দোহার হিসেবে কণ্ঠ দিয়ে থাকেন।

গম্ভীরা গানের শুরুতেই মঞ্চের নিচে দর্শকদের সামনে নাতিকে দেখা যায়। সে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে এদিক সেদিক তাকায় আর দর্শকদের জিজ্ঞেস করে–'হ্যাঁজী তোমরা হামার নানাকে দেখ্যাছো জী?' দর্শক–শোতারা তার নানাকে দেখেনি বলে জানালে নাতি মঞ্চের দিকে তাকায় এবং মঞ্চে উপবিষ্ট শিল্পীদের একই প্রশ্ন করে। শিল্পীরা তার নানাকে দেখেনি বলে জানায় এবং তাকে মঞ্চে এসে দুই একটা গান শোনাবার জন্য অনুরোধ জানায়। তাদের অনুরোধে নাতি মঞ্চে গিয়ে বন্দনা গেয়ে গেয়ে নৃত্য পরিবেশন করতে থাকে। এমন সময় লাঠি হাতে অকস্মাৎ নানার আগমন ঘটে। লাঠি দিয়ে তিনি নাতিকে আঘাত করেন এবং নাস্তা নিয়ে সময়মতো মাঠে না গিয়ে এখানে আসার কৈফিয়ত তলব করেন। নাতি ইনিয়ে বিনিয়ে মঞ্চে আসার কারণ বর্ণনা করে এবং এখানে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে তার গুরুত্ব সম্পর্কে নানাকে বুঝিয়ে তাকে কিছু বলার জন্য রাজি করায়। তারপর নানা-নাতির যৌথ কণ্ঠে শুরু হয় গান ও কথাবার্তা।

গম্ভীরা গানের প্রধান চরিত্র নানা-নাতির পোশাকে ফুটে ওঠে বাংলার শত সহস্র গ্রামের কৃষকের রূপ। নানার পরণে থাকে ছেঁড়া লুঙ্গি, মুখে পাকা দাড়ি, মাথায় মাথাল, হাতে পাঁচনি অর্থাৎ ছোট লাঠি, কখনো কাঁধে লাঙ্গল। তেমনি নাতির পরণেও শত ছিন্ন গেঞ্জি, কোমরে গামছা, কখনো গামছার আঁচলে বাঁধা থাকে ছাতু অথবা কলাইয়ের রুটি। নানাকে কখনো হুক্কা টানতেও দেখা যায়।[৩০]

বন্দনার পর নানা-নাতির যৌথ পরিবেশনায় শুরু হয় গম্ভীরা গান। এখানে শিক্ষা সম্পর্কিত একটি গম্ভীরা গানের দৃষ্টান্ত দেয়া হলো–

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার মধ্য দিয়েই জাতি উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিষাক্ত বীজ ঢুকে পড়েছে। শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও দিনের পর দিন সন্ত্রাস আর হানাহানিতে নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে নানা-নাতির মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তা নিম্নরূপ :

ধূয়া (স্থায়ী) : হে নানা শুনব্যাতো আইসোজি
দ্যাশের ক্যামুন ল্যাখা পড়া।
পড়্যা শুন্যা মানুষ হোতে
পারে না হাঁরঘে ছোঁড়া।[৩১]

যন্ত্র সঙ্গীতের তালে তালে নানা ও নাতি ধূয়া পরিবেশন করেন। দোহাররাও তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলায়। এক সময় উভয়েই থেমে যায়, থেমে যায় বাদ্যযন্ত্রের ঝংকার ও দোহারদের কণ্ঠও। নাতি ধূয়ার বক্তব্য সম্পর্কে নানাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে। নানা বয়স্ক মানুষ, তার অভিজ্ঞতা অনেক। তিনি যুক্তির মাধ্যমে নাতিকে সবকিছু বুঝিয়ে দেন। নাতির বয়স কম। বাস্তবতা সম্পর্কে তার জ্ঞান সীমিত। সে এমন এমন উক্তি করে যাতে দর্শক শ্রোতারা কৌতুক অনুভব করেন। তার অঙ্গ ভঙ্গিও দর্শক শ্রোতাদের বেশ আনন্দ দেয়। গানের অংশগুলো পূর্বে রচিত হলেও কথাবার্তাগুলো নানা-নাতি তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করেন। ধূয়ার পর শুরু হয় গান ও নৃত্য। প্রতিটি অন্তরার (পরধূয়া) পর নানা-নাতির কথাবার্তা হয় এবং দোহারীরা ধূয়া পরিবেশন করে। নানা-নাতির কথাবার্তার মধ্যে থাকে সমস্যার কথা, সমাধানের উপায় এবং সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন।

গম্ভীরার অন্তরাগুলো নিম্নরূপ–

ক্যামনে পড়ভে হাঁরঘে গোভ্যা
তোমরা সভাই বলো
বন্ধ থাকে এগারো মাস
খুলা থাকে এক মাস
এদিক ওদিক শুধু চলো।
কার কথা কেবা শুনে
না শুনলে দ্যায় তাড়া॥
নানাহে........... ।[৩২]

নানা-নাতির প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা, নাচ, যন্ত্রসহযোগে দোহারদের ধূয়া পরিবেশন।

পড়তে গিয়্যা পালিয়্যা আসে
লয়তো ছাত্রের দোষ
আজকের পরীক্ষা পরশু হবে
ক্যামুন কর্‌য়া ছাত্র রবে
পড়ার থাকে না যে পরিবেশ।
দেখ্যা শুন্যা গোভা কহে
খাবো না আর হুড়া॥
নানা হে.... ।[৩৩]

আবার নানা-নাতির প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা, নাচ এবং যন্ত্র সহযোগে দোহারদের স্থায়ী (ধূয়া) পরিবেশন–

আমরা সভাই এক হয়্যা
দাবি করি চলো
(শুধু) অন্নের সঙ্গে বস্ত্র লয়
ঠিক মতো পড়তে চাই
এক হয়্যা মুখ খুলো।
এক সঙ্গে দাবি করলে
ফাটবে ঘঁরঘে ফোঁড়া ।[৩৪]

গম্ভীরা গানের সমাপ্তি হয় বিষয়বস্তু উপস্থাপনার পর নাতিকে উপদেশ প্রদানের মধ্য দিয়ে দর্শক-শ্রোতা ও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির (গম্ভীরা শিল্পীরা তাঁকে 'বড়নানা' বলে সম্বোধন করে থাকেন) মনে সমস্যাটি সম্পর্কে নতুন অনুভূতি জাগিয়ে তা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানানোর মধ্য দিয়ে। গম্ভীরা অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ নির্ভর করে দলনেতার সাফল্য ও ব্যর্থতার ওপর।

গম্ভীরার বিষয় বৈচিত্র্য : গম্ভীরা গান 'সালতামামি' হিসেবে প্রথম উদ্ভূত হলেও ব্রিটিশ আমলে বিশেষত প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে তার অঙ্গনে ব্যাপক বৈচিত্র্য ঘটতে থাকে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, তার বহুবিধ সমস্যা গম্ভীরা গানের অঙ্গনে পরিগৃহীত হয়ে ওঠে। দেশ বিভাগের পর থেকে তার প্রসার আরও বেড়ে যায়। তাই বর্তমানে বিষযবস্তুর দিক থেকে গম্ভীরা গান বিবিধ বৈচিত্র্যের অধিকারী।৩৬ বিষয়গত দিক থেকে গম্ভীরা গানকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে–

১. ধর্মীয় বিষয় নিয়ে রচিত গম্ভীরা
২. সামাজিক বিষয় নিয়ে রচিত গম্ভীরা
৩. রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে রচিত গম্ভীরা
৪. বিবিধ বিষয় নিয়ে রচিত গম্ভীরা।

১. ধর্মীয় বিষয় নিয়ে রচিত গম্ভীরা : বর্তমানে গম্ভীরা গান সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে বিবর্তিত ও প্রসারিত হলেও গম্ভীরা পূজা ও গান মধ্যযুগে উদ্ভূত হয়ে উনিশ শতকের শেষাবধি তা ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তখন পর্যন্ত গম্ভীরা গানের আসরের এক কোণে শিবের মূর্তি স্থাপনের রেওয়াজ ছিল।৩৭ মানুষ নিজের দুঃখ-

দুর্দশার কথা, অভাব-অভিযোগের কথা, ব্যথা-বেদনার কথা গানের আসরে শিবকে উপলক্ষ করে উপস্থাপন করতো। কারণ, তাদের বিশ্বাস শিবই সকল অনিষ্টের মূল। তাই শিবকে তুষ্ট করার জন্য ভক্তের বিনম্র নিবেদন–

শিব মনের কথা দুট্যা বলিবো
এনে জড় জগতে, ঘুরাও নানা পথে,
কোথা গেলে দ্যাখা পাইবো।
পড়েশুনে শিখি শুধু তুমি বিশ্বেশ্বর,
বচন আওড়াতে আমরা হয়েছি খুব দড়,
ভুলে গেছি তব পূজা, তাই আমরা পাচ্ছি সাজা।
দুঃখের কথা কারে কহিবো।
ধর্মের সার গেছে কাল-স্রোতে ভেসে
সংস্কার রয়েছে এ পোড়া দেশে
বল পুণ: কিসে ধর্ম ফিরে আসে
সে উপায় আমরা শিখিব।
নিজ নিজ স্বার্থ হল ধর্মকর্ম
এই কি শিব, তোমার সনাতন ধর্ম,
বুঝে দেশের মর্ম করিব সে কর্ম
খাঁটি কর্মী এবার হইব।
ত্যাগী বেশে তুমি এসে এই গম্ভীরায়
মন সাথে পুঁজি মোরা ভাই বোন সবাই
হায় একি এলো দায়
নিজে ত্যাগী হতে নাহি চায়,
এ ছলনা আমরা ছাড়িব।[৩৮]

ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মুসলিম শিল্পীদের ঐকান্তিক প্রয়াসে গম্ভীরা গান ধর্মের খোলস থেকে বেরিয়ে আসে বিগত শতাব্দীর প্রথম পাদেই। ফলে গম্ভীরা গানে আর শৈবিক বন্দনা বা ধর্মীয় পরিবেশ প্রতিফলিত হয় না। বর্তমানে কিছু কিছু ধর্মীয় উৎসবে ধর্মীয় অনুভূতি প্রসূত কিছু গান পরিবেশিত হলেও তা নৈবেদ্য সূচক নয়, ধর্মীয় বিধান নির্দেশক।

সামাজিক বিষয় নিয়ে রচিত গম্ভীরা : সমাজের অন্যায়, অত্যাচার, দূর্নীতি মানুষকে অবহিত করার একটা বিশেষ মাধ্যম হচ্ছে গম্ভীরা গান। যা সরাসরি অন্য কোনও মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না সেই কঠিন সত্যকে এতে অবলীলাক্রমে প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন কু-প্রথার বিরুদ্ধে গম্ভীরা শিল্পীরা সোচ্চার। যেমন–বাল্য বিবাহ, যৌতুক বা পণপ্রথা, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি প্রসঙ্গে গম্ভীরা শিল্পীরা তাদের গানে স্থান দিয়ে থাকেন। বাল্য বিবাহ প্রসঙ্গে–

বয়স হামার ছয় কম কুড়ি
এ বয়সে সবাই ছুঁড়ি
খেলে সবাই লইয়া পুতুল গুড়িয়া
হামার জান গ্যালো পুড়িয়া
বুবুটে বিহ্যা না হইলে ব্যাড়াতাম দৈইড়্যা।৩৯

যৌতুক বা পণ-প্রথার সমালোচনা করে–

(তুমি) কেন উদাসী, কাশীবাসী, ওহে কাশীশ্বর,
দুনিয়াটা যায় রসাতল, রক্ষা করো হর।
... .
(দ্যাখো) কনের বাপের ঘাড়ে ঝুলি
বরের বাপের লম্বা বুলি।
পণ প্রথাটা উঠিয়ে দিয়ে সমাজ রক্ষা করো।
ডোম-ম্যাথর আর হাড়ি-মুচি
তারাই বন্ধু তারাই শুচি
মঠমন্দিরের দুয়ার খুল্যা সবার সমান করো।

বিধবা বিবাহের পক্ষে মতামত উপস্থাপন করে–

স্ত্রী মরিলে সুখের তরে
পুরুষ ক্যানে বিহ্যা করে
রাঢ়ি হয়্যা থাকবে সহ্যা
নারী কার তরে,
একোন ধর্ম দ্যাখো ভাবিয়্যারে।৪০

গম্ভীরার লোক কবিরা সামাজিক অবক্ষয়কে নানাভাবে গ্রামীণ পরিবেশে অশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত মানুষের কাছে তুলে ধরেন। সমাজে নকল বা ভেজাল প্রবণতা সর্বত্রই বিস্তার লাভ করেছে। অপরকে ঠকানো বা ধোঁকা দেয়া আজ যেন রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গম্ভীরা শিল্পীরা এসব দেখে ব্যথিত হন এবং গানের মাধ্যমে এসব তুলে ধরে তীব্র সমালোচনা করেন। যেমন–

হে নানা, কি আজব কাণ্ড দেখি
নকলের খেলা সারা দ্যাশে।
ত্যালে নকল, ঘিয়ে নকল
মানুষ নকল হলো শ্যাষে।
হাট বাজারে চলতে ফিরতে
দেখি চারিপাশে
আসল খুঁজে যায় না পাওয়া
খাঁটি জিনিস যায় না পাওয়া
দোকানিরা মুখ ফিরিয়ে হাসে।
সকল ভেজাল জিনিস পত্রই

খাঁটি হলো অবশেষে।[৪১]

সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা হচ্ছে মাদকাসক্তি। দেশের সম্ভাবনাময় যুব সমাজ আজ মাদকের বিষাক্ত আবহে বন্দি। এই ভয়ানক নেশার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গম্ভীরা শিল্পীরা উদ্বিগ্ন–

হে নানা শুন্যাছিস হায় রে
সর্বনাশ হয়্যাছে ষোল আনা।
কাণ্ডকীর্তি দেখ্যা শুন্যা
বিগড়্যা গেছে মেজাজ খানা।
বাংলাদেশের কিশোর যুবক
যত আছে নানা,
বেশির ভাগই গিলছে মদ
ধরছে তাড়িখানা।
নানা দ্যাখোতো কাণ্ডখানা।
প্রায় বিশ লাখ বাংলাদেশী
হয়েছে আসক্ত
ফেনসিডিল ও প্যাথেড্রিনের
কত শত ভক্ত
এদের ভবিষ্যৎ মরণ ছাড়া
গতি নাই হামার জানা॥
চেষ্টা তদবির চলছে নানা
সরকারি মহলে
ক্যামন করে ছাড়ানো যায়
এসব কি কৌশলে
নানা এভাবে দ্যাশ কি চলে?
ভাইসব তোমরা হচ্ছো দ্যাশের মা-বাপ
তোমরাই ভবিষ্যৎ কিনা।[৪২]

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, নকল প্রবণতা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতার সৃষ্টি করেছে। খেলাধূলা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ভুলে ছাত্র-ছাত্রীরা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। পড়াশুনা না করে নকল করে পাশ করার চেষ্টায় তারা ব্যস্ত। শিক্ষা অর্জন নয়, সার্টিফিকেট পাওয়াই তাদের কাছে মুখ্য। এ প্রবণতা থেকে মুক্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি গম্ভীরা শিল্পীর আবেদন–

পড়াশুনা করবো সবাই, নকলবাজি করবো না।
লেখা পড়া মানে কেবল বই পড়া নয়
খেলাধূলা শিল্পচর্চা বিদ্যার পরিচয়
আছে সঙ্গীত, আবৃত্তি, অভিনয়।
এসব নিয়েই আসল শিক্ষা–
নইলে উন্নতি হবে না।[৪৩]

গম্ভীরা রচয়িতারা জনসংখ্যা সমস্যা এবং তা প্রতিকারের জন্য পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বৃক্ষরোপনের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয় নিয়েও গম্ভীরা রচনা করে থাকেন, যা সাধারণ মানুষকে এসব বিষয় সম্পর্কে সচেতন করতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে রচিত গম্ভীরা : নগরায়ণের সাথে রাষ্ট্র ও সমাজ-মানসে যেমন সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থান-পতনে নাগরিক সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটেছে, তেমনি সমাজের বা রাজনীতির উত্থান-পতনের সাথে সাথে বাংলার লোকসংস্কৃতির জগতে লোক কবিদের মনেও আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। আমরা গম্ভীরা গানে দেশের রাজনীতি এবং উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনার প্রকাশ লক্ষ্য করি।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধ, ১৯০৫ ও ৫২'র মহান ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে গম্ভীরা রচয়িতারা অসংখ্য গান রচনা করেছেন। গানগুলো শুধু ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ নয়, এতে ঘটনার ভালো দিক, মন্দ দিক এবং তার বিচার বিশ্লেষণও ফুটে ওঠে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং তার পেছনে আত্মত্যাগের কথা বলতে গিয়ে গম্ভীরা শিল্পী বলেছেন–

বাংলাদেশ মোদের মাতৃভূমি হাজার ত্যাগের ফল
কত লোকের রক্ত গ্যালো
তারপরেতে স্বাধীন হলো
এসব কথা বলতে গিয়া প্রাণে লাগে ব্যথা!
হে নানা বলবো ক্যামনে হে
হাঁরঘে দুঃখের কথা। [৪৪]

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে যে দীর্ঘ পটভূমি রয়েছে গম্ভীরা রচয়িতারা সেকথাও জানেন। তাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে '৪৮ ও '৫২'র ভাষা আন্দোলনের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। একটি গানে গম্ভীরা রচয়িতা সেকথাই বলেছেন-

৪৮ এ ছাত্ররা করলো ভাষার আন্দোলন
৫২তে চরম হলো
২১শে ভাষা এনে দিলো
জান দিয়্যা কুরবান
তাই পায়্যাছি বাংলা ভাষা
খুশিতে মন যায় ছুটে।
একুশ শুধু দ্যায়নি ভাষা
একুশ স্বাধীনের চেতনা
একুশ মোদের বল্যা দিলো
যুদ্ধ করার বুদ্ধি হলো
বাড়লো মোদের সাধনা
পেলাম মোরা বাংলাদেশ
সব সহ্যা বুকে ফিঠে। [৪৫]

স্বাধীনতা অর্জনের পর আমাদের প্রত্যাশাগুলো পূরণ হয়নি। আমরা যা চেয়েছিলাম তা না পাওয়ায় স্বাধীনতার স্বাদ আমাদের কাছে পানসে মনে হচ্ছে। এই বোধ গম্ভীরা শিল্পীদের হৃদয়ে অনুভূত হয়েছে। তাই তারা গানের মাধ্যমে তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন–

১. স্বাধীন হয়ে এখন হামরা
পেলাম কি, বলো তোমরা
চলা ফিরায় নাইকো সুখ
প্যাটে থাকছে শুধুই ভুখ
এখন হামরা দিশ্যাহারা
আর কতো কাল চলবে বলো
নাঙ্গা ভুখা থাকা।

২. কৃষক শ্রমিক মানুষ হামরা
এই না বাংলা দেশে
হামরা জাতির মেরুদণ্ড
খাই যে লাঙ্গল চষে
হামরা মরছি অবশেষে।
সার বিছন আর পানির লাগ্যা
সবঠে খাছি গুতা।৪৬

গম্ভীরা শিল্পীরা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে গান বেঁধে জনগণের সামনে যেভাবে তা তুলে ধরেছেন তা সত্যি অনন্য। তারা শুধু বিষয় বা ঘটনা তুলে ধরেই ক্ষান্ত হননি, তার সমাধানের পথও নির্দেশ করেছেন তাদের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে।

বিবিধ বিষয় নিয়ে রচিত গম্ভীরা : গম্ভীরা শিল্পীরা সাধারণত পারিপার্শ্বিক নানা ঘটনা বা সমস্যাকে নানাভাবে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তাই তাঁদের গানে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও সমকালীন বিভিন্ন বিষয় যেমন–আঞ্চলিক সমস্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার সংকট ইত্যাদির কথাও বিধৃত হয়েছে।

এখানে বরেন্দ্র অঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জের ঐতিহ্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে রচিত গম্ভীরা গানের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো–

১. চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শহর কত যে সুনাম
কাঁসা, রেশম, লাক্ষা, চমচম কতরকম নাম
নানা কত যে এসবের দাম
কোথায় গেল কাঁসা লাক্ষা,
কোথায় হারালো নাইকো জানা!

২. বরেন্দ্র ভূমির পুরাতন এই নবাবগঞ্জ শহরে
আন্তঃনগর ট্রেন আসে না লোকালের বহরে
নানা বলব কত যে তোমায়

যোগাযোগের দিকে ক্যানে
নানা নজর দ্যায় না।

৩. হাসপাতাল আছে কিন্তু তেমন ওষুধ নাই
টেলিভিশন রেডিওতে শুনা কিছু দায়
নানা আর কত বলা যায়?
বরেন্দ্র প্রকল্পের গভীর নলকূপে
পানি যে থাকে না।
নানা বলবে ক্যামনে জী
হাঁরয়ে অবস্থাখানা।[৪৭]

গম্ভীরা গানের আঞ্চলিক ভাষা একান্ত আঞ্চলিক। অথচ অভিনয়ের ব্যঙ্গ রসিকতায় সে ভাষা অঞ্চলের চৌহদ্দী পেরিয়ে সার্বজনীনতা পেয়েছে। তবে সম্প্রতি শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে গম্ভীরা গানের ভাষা অনেকটা পরিশীলিত হয়েছে। গম্ভীরা গানের নিজস্ব কোনও সুর নেই। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের গণ্ডিভুক্ত হলেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সুরের সংমিশ্রণ ঘটেছে এতে। ঝাঁপতাল, একতাল, খেমটা, ত্রিতাল, কাহাররবা, দাদরা, জংলা প্রভৃতি বোলহীন মিশ্রসুরে গাওয়া হতো এ গান। তবে হাল আমলে হিন্দী ও আধুনিক বাংলা গানের সুর ও মাঝে মধ্যে ঢুকে পড়ে। আবার আলকাপ, রামপ্রসাদী, বাউল কীর্তনের সংমিশ্রণে গম্ভীরা সুরের উদ্ভব ঘটেছে।৪৮ আবার সে কারণেই এতে আলকাপের সুরেব প্রাধান্য লক্ষণীয় বলে অনেকেই মনে করেন।

গম্ভীরা গানের আধুনিক সংস্করণের জনক সুফি মাস্টার জন্মসূত্রে মালদহের অধিবাসী ছিলেন। বিভাগোত্তর যুগে তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমার রহনপুরে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভক্ত হলে বহু মুসলিম তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। সুফি মাস্টারও তাঁদের একজন। তাঁর গম্ভীরা রচনায় কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১) তাকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের পাবনা সাহিত্য সম্মেলনে একটি সোনার মেডেল উপহার দিয়েছিলেন।৪৯ জীবনের শেষভাগে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজশাহী থেকে 'মাদার বখশ সাহিত্য সংস্কৃতি পুরস্কার' এবং ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে 'উত্তরা সাহিত্য মজলিস পুরস্কার' লাভ করেন।[৫০] ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ৯২ বছর বয়সে আধুনিক গম্ভীরা গানের রূপকার এই লোককবি বহনপুর গ্রামে ইন্তেকাল করেন।

বিভাগোত্তর কালে ডা. সোলেমান, পশুপতি মোক্তার, নাইমূল হক প্রমুখের প্রয়াসে গম্ভীরা গান ব্যাপক উৎকর্ষ লাভ করে। পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশে রাকিবুদ্দীন ও কুতুবুল আলম তাঁদের একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা গম্ভীরা গানকে জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লোকসংগীত হিসেবে তুলে ধরতে পেরেছেন। মাঝে মাহবুবুল আলম ও বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ একটি গম্ভীরা দল গঠন করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে কুতুবুল আলমের মৃত্যুর পর রাকিবুদ্দীন মাহবুবকে নিয়ে দল গঠন করেন। অন্যদিকে বীরেন ঘোষ ও ফাইজুর রহমান আরেকটি দল গঠন করেছেন। ভবিষ্যতে নতুন নতুন

শিল্পীদের সংগ্রহ, চর্চা ও প্রচেষ্টার ফলে সার্বজনীন ও সর্বকালীন আবেদন সমৃদ্ধ এ লোকসংগীতের উৎকর্ষ যে আরো বৃদ্ধি পাবে এতে কোনও সন্দেহ নেই।

গম্ভীরা গানের নমুনা :

১. হে নানা মনে বড়ো জ্বালা হে
গম্ভীরায় করিবো বর্ণনা
দ্যাশে কখন সুদিন আসবে
সেটাই তো সবার ভাবনা॥

(১) নাইকো শান্তি কারো মনে
এসব ঘটছে কি কারণে
সন্ত্রাসী আর জুলুমবাজি
দ্যাশ জুড়্যা বস্যাছে আর্জি
বাঁচবে ক্যামুন কর্যা জনগণে
সবাই যদি না ভাবো আর
কিছুতেই কিছু হৈবে না॥

(২) শস্যার মধ্যে ভূত থাকিলে
কহো ক্যামুন কইর্যা চলে
আইনের শাসন কায়েম করো
নইলে যদি পকেটে ভরো
দেশ চল্যা যাবে রসাতলে।
তোমরাই হইছো দ্যাশের সেবক
একথা ক্যানে বুঝো না॥

(৩) যৌতুক প্রথা বাপরে বাপ
হচ্ছে চরম অভিশাপ
তাকিয়্যা দ্যাখো আশেপাশে
কান পাতিয়্যা শুনছো না বিলাপ
বন্ধ করো যৌতুক প্রথা
অশান্তি দূর হবে ষোল আনা॥

(৪) হামিরা হইয়্যা এক জোট
সারা জীবন দিনু ভোট
কপালে জুটলো না কিছু
দুখ্খো চলে আগু পিছু
হামরা খালি পায়্যাছি ঝনজোট।
মাঝি যদি ঠিক না থাকে
নৌকা তীরে পৌছাইবে না॥

২. হে নানা চিন্ত্যা কর্যা দ্যাখ হে
কোথায় সুখের ঠিকানা

বদল খাদ্য গ্রহণ করলে
খাদ্যের অভাব পড়বে না॥

(১) দ্যাখ নারা দুনিয়াতে
ব্যস্ত সমাধান খুঁজিতে
ধান গমেতে নির্ভর কর‍্যা
সমস্যা যাইবে না সর‍্যা
সবাই ভাবছে বিকল্প খুঁজিতে।
চিন্তা ভাবনা কর‍্যা চললে
অভাব কখুনো থাকবে না॥

(২) ভাতে যতো পরিমাণ
ক্যালোরি আছে বর্তমান
আলু খাও ক্যালোরি পাবে
ভাতের অভাব ঘুঁচ্যা যাইবে
এই বিজ্ঞানের নতুন অবদান।
দ্যাশ-বিদ্যাশে চাইয়্যা দ্যাখ
খাদ্য পুরণ হইছে ষোল্লো আনা॥

(৩) ধারা বদলাইতে হইবে
গ্রহণ করো অনুভবে
আলু খাইক্যা স্বাদের খাবার
হতে পারে নানা প্রকার
পায়েশ রুটি বিস্কুট করা যাইবে
ভাতের জায়গায় আলু খাইলে
কোনো দিন সমস্যা থাকবে না॥

৩. হে নানা গম্ভীরা গানেতে হে
করিবো দু'কথা আলোচনা
স্বাস্থ্যই হচ্ছে সেরা সম্পদ
একথা সকলেরই জানা॥

(১) পানি ফুটিয়্যা খাইলে
অনেক জীবানু যায় চলে
ডায়রিয়া আমাশা রোগে
পালাইবে একযোগে
স্বাস্থ্যবিধি এসব কথাই বলে
সুস্থ না থাকিলে দেহ
মন বিগড়্যা যাবে ষোল আনা॥

(২) বাড়ির পাশের আবরজনা
সরাও হইও না আনমনা
বিড়ালে ডিপথেরিয়া আনে
প্লেগের কারণ সবাই জানে

ইঁদুর মরলে বস্যা থাকিও না
রোগ বালা প্রতিরোধ করো
কতো আর যাব্যা ডাক্তারখানা॥

(৩) ম্যালোরিয়া গোদরোগে
যারা চিবকালই ভুগে
খাটাইলে মশারি ঘরে
জ্বলবে না
মরবেনা কেহ রোগে শোকে
মশাই এসব রোগের কারণ
জান্যাও কানে জানছো না॥

৪. হে নানা কি আর কহিবো হে
দুঃখেতে পরান বাঁচে না
মাছে ভাতে বাঙালি হায়
তাও কেনে মাছ খাইতে পাছি না॥

(১) দেশের পুকুর দিঘি কতো
হাজা মজা শত শত
খনন করে ছাড়লে পোনা
আর্থিক কষ্ট আর পাবে না
ভিটামিনের অভাব থাকবে না
অপুষ্টিতে ভুগবে না কেউ
অসুখ বিসুখ কখনো হৈবে না॥

(২) দুঃখের কথা বলি তবে
মন দিয়্যা শুনো সবে
মাছ যখন হৈবে বড়ো
তখন প্রয়োজনে ধরো
পোনা মারা বনদো করতে হৈবে
আইন মান্যা চলতে হৈবে
খেয়াল খুশিতে চলিও না॥

(৩) দেশ ও দশের কল্যাণ তরে
যারা ভাবো অবসরে
চাষ করো মাছ অধিক হারে
অর্থ আসবে ঘরে ঘরে
নইলে বাধা যাবে ক্যামুন করে
স্বনির্ভর হইতে হইলে
এছাড়া উপায় যে দেখি না॥

তথ্যসূত্র :

১. ড. প্রদ্যোত ঘোষ, লোকসংগীত: গম্ভীরা, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ১৩৮৯,পৃ. ১
২. পালিত হরিদাস, আদ্যের গম্ভীরা, প্রথম প্রকাশ ১৯০৭, কলকাতা, পৃ. ১০
৩. মাযহারুল ইসলাম তরু, জেলা নবাবগঞ্জের ইতিকথা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১৯৯০, পৃ. ১৪৪
৪. তাসাদ্দক আহমদ, নবাবগঞ্জ জেলার লোকসংগীত : গম্ভীরা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ ৪৬
৫. ড. প্রদ্যোত ঘোষ, গম্ভীরা লোকসংগীত উৎসব : একাল ও সেকাল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৯, পৃ. ৩৪-৩৫
৬. তাসাদ্দক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
৭. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
৮. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৪
৯. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭২
১০. তাসাদ্দক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
১১. পালিত হরিদাস, আদ্যের গম্ভীরা প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
১২. তাসাদ্দক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
১৪. ড. প্রদ্যোত ঘোষ, লোকসংগীত : গম্ভীরা, পৃ. ৩৬
১৫. ধান রাখার জন্য নির্মিত বিশেষ ধরণের ঘর। বাঁশের বেড়া দিয়ে এক ধরণের গোলা তৈরি হয়। মাটি দিয়েও আরেক রকমের গোলা তৈরির নিয়ম বরেন্দ্র অঞ্চলে রয়েছে।
১৬. বৃদ্ধ
১৭. পান উৎপাদনের জন্য বাঁশ ও ছনের চাল দিয়ে নির্মিত ঘরের মতো উঁচু ক্ষেত-ছাউনী।
১৮. মহিলা
১৯. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাঙলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৩
২০. তাসাদ্দক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
২১. ধ্বংসের দিকে
২২. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, ২৬১-২৬২
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪-২৬৫
২৪. ড. প্রদ্যোত ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮
২৫. তাসাদ্দক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬
২৬. সাক্ষাৎকার : রকীবুদ্দিন, গম্ভীরা নাতি : গ্রাম : বাসুনিয়াপট্টি, পো. চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জেলা : নবাবগঞ্জ; তারিখ : ১২ মার্চ ১৯৯৯, বয়স : ৬২ বছর
২৭. সাক্ষাৎকার : মাহবুবুল আলম, গম্ভীরা নানা, দূর্গাপুর, পো . চাঁপাইদুর্গাপুর, জেলা : নবাবগঞ্জ, তারিখ : ১৯ মার্চ ১৯৯৯, বয়স : ৪৭ বছর
২৮. প্রাগুক্ত
২৯. গম্ভীরা শিল্পী বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ-এর নিকট থেকে সংগৃহীত
৩০. তাসাদ্দক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
৩১. গম্ভীরা শিল্পী মাহবুবুল আলমের নিকট থেকে সংগৃহীত

৩২. অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের নিকট থেকে সংগৃহীত
৩৩. প্রাগুক্ত
৩৪. প্রাগুক্ত
৩৫. তাসাদ্দক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
৩৭. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৫
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫–২৫৬
৩৯. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬২
৪০. ড. প্রদ্যোত ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১-১১২
৪১. মাহবুবুল আলমের নিকট থেকে সংগৃহীত
৪২. প্রাগুক্ত
৪৩. প্রাগুক্ত
৪৪. প্রাগুক্ত

মালদহের গম্ভীরার ইতিবৃত্ত

শচীকান্ত দাস

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের ভক্ত ও শিষ্য নিত্যনন্দ প্রভু বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে নামেন। পাল ও সেন বংশের রাজাদের আমলে বৌদ্ধধর্মের অবনতি হলে শৈব ধর্মের প্রাধান্য ঘটে এবং শঙ্করাচার্যের শৈবধর্ম প্রচারিত হয়। ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধ উৎসবগুলি হিন্দু উৎসবে পরিগণিত হয়, সৃষ্টি হয় মালদহেব গম্ভীরা উৎসবের। যুগ ধর্মের চাপে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ, গড়ে ওঠে স্বদেশী শিক্ষার বনিয়াদ। স্বদেশী আন্দোলনের দিকপাল বিনয়কুমার সরকার বঙ্গদেশে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিয়েই ১৯০৭ (১৩১৩ বঙ্গাব্দে) মালদহে জুন মাসে এসে জাতীয় শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। মালদহে লোকসাহিত্য লোকসঙ্গীত ও লোকশিক্ষা নিয়ে বিনয়কুমার সরকার শুরু করেন স্বদেশী মহোৎসব। গম্ভীরা তখন মালদহের প্রাণের সম্পদ। (১৯০৯) ১৩১৬ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় সর্বপ্রথম হরিদাস পালিতের আদ্যের গম্ভীরা প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। সারা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের যখন চলছিল জোয়ার এবং বিপ্লবী দলের কার্যকলাপ যখন উঠেছিল তুঙ্গে, ঠিক সেই সময় (১৩১৯ বঙ্গাব্দে) ১৯১৩ মালদহের খ্যাতনামা গবেষক হরিদাস পালিতের 'আদ্যের গম্ভীরা' বইটি প্রকাশ করেন সম্পাদক বিপিন বিহারী ঘোষ। মালদহে জাতীয় শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে শুরু হয় মালদহে ইতিহাস চর্চা, লোকসংস্কৃতির অনুসন্ধান, নৃতাত্ত্বিক এষণা ও সামাজিক অর্থনৈতিক আলোচনা। অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যাদির প্রচারের জন্য এগিয়ে আসে অনেক পত্র-পত্রিকা। মালদহের গম্ভীরা সে সময় প্রকাশিত হয় মালদহ সমাচার ও গৌড় দূত পত্রিকায়। সে সময় কলকাতা থেকে যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতো তাতে মালদহের অনেক গুণি ব্যক্তিরা সেই পত্রিকাগুলিকে সমৃদ্ধ করতেন। বিনয়কুমার সরকারও সেই পত্রিকাগুলিকে সমৃদ্ধ করতে এগিয়ে যান। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মালদহের ইতিহাস অনুসন্ধান, সাংস্কৃতিক চর্চা ও সাহিত্য সাধনা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। হরিদাস পালিত ছিলেন শিক্ষা-সংস্কৃতি ও গবেষণার জগতে মালদহের কৃতি সন্তান। বর্ধমান জেলায় কুড়মুনে জন্মাবার পর বাল্যকালটা মালদহের ভোলাহাটে কাটিয়েই ইংলিশবাজার শহরে তিনি চলে আসেন। মালদহ সমাচার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে হরিদাস পালিত আদ্যের গম্ভীরা রচনা করে মালদহের জাতীয় শিক্ষা সমিতির সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আদ্যের গম্ভীরা গ্রন্থে গম্ভীরার অনুষ্ঠান ও তৎসংযুক্ত সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য ছিল তার প্রধান বিষয়। তাই বোধহয় গম্ভীরা সংগীত ধারার দিকটা অর্থাৎ কালগত গম্ভীরা বা তাঁর আমলে প্রচলিত গম্ভীরা সংগীতের উল্লেখের দিকটা তিনি তেমন গুরুত্ব দেননি। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলার সঙ' প্রসঙ্গে গ্রন্থে দেশের অন্যান্য সংগীত সংগ্রহের সঙ্গে মালদহের গম্ভীরা সংগীতও স্থান দিয়েছেন। কিন্তু মালদহের গম্ভীরা

সংগীতের সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করতে পারেননি। দুটি কারণে প্রথমত, প্রাচীন গম্ভীরা সংগীতের অনুপস্থিতি; দ্বিতীয়ত, শিববন্দনা ছাড়াও অন্যান্য গম্ভীরা সংগীতের উল্লেখ না থাকার জন্য। হরিমোহন কুণ্ড, ধনকৃষ্ণ অধিকারী, হরি বোলা, মৃত্যুঞ্জয় দাস, ধরণীধর সাহা, ডা. সোলেমান প্রমুখ সংগীতকারদের পূর্বেও যে গম্ভীরা সংগীতশিল্পীরা গান রচনায় সিদ্ধ হস্ত ছিলেন তা অস্বীকার করা যাবে না। আনন্দ চন্দ নামক এক সংগীতকারের রচিত শিববন্দনা সেই সময়ে এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ যেমন–

'মেরুতে নাচে সদাশিব ডমরু বাজায়া
নাচছে ঈশাণ প্রথম শং
নত শিরে তরঙ্গ
কিলিকিলি কিলি করে ভুজং
শিবের জটাজুট বেড়িয়া॥১
ভ্রূকুটি কুটিল জটিলা শং
কি বুঝি পতির প্রমথ রঙ্গ
জগতজননী অর্দ্ধ অঙ্গ
গতি বৃষসভর চাপিয়া॥২
শিরে শসি গলে হাড়মাল
ববম ববম বাজায় গাল
কটিতটে শোভে ঘুঙঘুরু জাল
ঝুমুরু ঝুনুরু বাজায়া॥৩
কাতর আনন্দ চান্দেন বানি
সুনহ ঠাকুর পিনাক পাণি
সদা চমকিত এভয় মানি
এবার লহ মোরে তরাইয়া॥৪

মালদহের জাতীয় শিক্ষা পরিষদ তথা গম্ভীরা পরিষদ এবং মালদহের গিরি গোস্বামীদের দ্বারা আয়োজিত গম্ভীরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে যে সমস্ত গম্ভীরা সংগীত দল বা বোলবাই সমিতি সেকালের গম্ভীরার জাগরণ এগিয়ে এনে গম্ভীরার আন্দোলনকে উৎসাহিত ও সমৃদ্ধ করেছিল সেই দলগুলির নাম হলো–

১। মকদুমপুর বোলবাই সমিতি, ২। মহেশপুর বোলবাই সমিতি, ৩। কুতুবপুর বোলবাই সমিতি, ৪। গনিপুর বোলবাই সমিতি, ৫। টিপাজানি বোলবাই সমিতি, ৬। ইংরেজবাজার বোলবাই সমিতি, ৭। ভোলাহাট বোলবাই সমিতি, ৮। গিলাবাড়ি বোলবাই সমিতি, ৯। চণ্ডীপুর বোলবাই সমিতি, ১০। ছিলিমপুর বোলবাই সমিতি, ১১। মজুমপুর বোলবাই সমিতি, ১২। মুচিয়া বোলবাই সমিতি, ১৩। পুরাটুলী বোলবাই সমিতি, ১৪। কোতুয়ালী বোলবাই সমিতি, ১৫। মঙ্গলবাড়ি বোলবাই সমিতি।

'গম্ভীরা কবি ও গায়কগণ' প্রবন্ধে কুমুদনাথ লাহিড়ীর ২০ জন গম্ভীরা লেখকের নাম এখানে দেওয়া হলেও সেকালের তথ্য সংগ্রহ করে আর যে সমস্ত গম্ভীরা লেখকের নাম পাওয়া গেছে তাঁরা হলেন ললিত চন্দ্র দাস, কোতুয়ালী, নবীন চন্দ্র সাহা আলিনগর

কালিয়াচক, শশীভূষণ নন্দী, নিমা সরাই, শশিভূষণ সাহা ইংরেজবাজার, মনমোহন সাহা ইংরেজবাজার, বৈদ্যনাথ সাহা ইংরেজবাজার, বাদল চন্দ্র দাস ও বসন্তকুমার দাস জোত, ডোমন চন্দ্র ঘোষ ও ডা. সোলেমান খলিফা প্রমুখ। তাই কুমুদনাথ লাহিড়ী ২০ জন গম্ভীরা লেখকের নামের তালিকা দেওয়া সত্ত্বেও উপরি উল্লিখিত বাদপড়া গম্ভীরা সংগীত লেখকেব তালিকা এখানে দেওয়া হলো। পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে যে কুমুদনাথ লাহিড়ীর ২০ জন এবং উপরি উল্লিখিত ১০ জন গীতিকার ছাড়াও আরও কয়েকজন খ্যাতিমান গম্ভীরা কবি ছিলেন। যে কোনো কারণে তৎকালীন প্রতিযোগীদের তালিকায় ও সংবাদপত্রের পাতায় এই নামগুলি ওঠে নাই। এঁদের মধ্যে যাঁদের নাম পাওয়া গেছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গীতিকার হলেন–

১। ডা. ধরণীধর সাহা, মকদুমপুর, ২। গোলাম গুপ্ত, আইহো, ৩। উপেন্দ্রনাথ সাহা, চুড়িপট্টী, ৪। ইন্দ্র দমন শেঠ, আইহো প্রমুখ।

গিরি গোস্বামীদের আয়োজিত মালদহ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ তথা গম্ভীরা পরিষদ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে সেকালে বিচারকের ভূমিকায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম–

১। পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য (শাস্ত্রী), ২। পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী, ৩। যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, ৪। কালীপদ চট্টোপাধ্যায়, ৫। নলিনীকান্ত বসু, ৬। মৌলবী আব্দুল গণি, ৭। আদিত্যনাথ মৈত্র, ৮। রাম নৃসিংহ গোস্বামী প্রমুখ।

সম্প্রতি গম্ভীরা নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ড. প্রদ্যোত ঘোষ, ড. ফণী পাল ও ড. পুষ্পজিত রায়। মালদহ জেলার লোকানুষ্ঠান গম্ভীরা ও তার প্রকৃতির গুরুত্ব ও বিষয়ের গৌরবে তা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে। আদ্যের গম্ভীরা গ্রন্থকে অবলম্বন করে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার তাঁর ইংরেজি ভাষায় লেখা "The folk element in Hindu cultural' বইটি ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রকাশ করে বিদ্বৎ মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছেন। তখন সেখানকার বড় বড় গ্রন্থাগারগুলিতে তা সগৌরবে স্থান করে নিয়েছিল। এ সম্পর্কে বিনয়কুমার সরকার লিখেছেন, '১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ফোক এলিমেন্ট বইটা বেরোলো। তখন আমি আমেরিকায় হার্ভাডে, তারপর ইউরোপ ও আমেরিকা ও নানা দেশের বড়ো বড়ো লাইব্রেরিতে এ বইয়ের একটি কপি যখনই দেখেছি, বুকটা তখন চেঁড়ে উঠেছে, তখনই পেয়েছি জীবনের বিপুল ধাক্কা। ভেবেছি, এ আমার জামতল্লীর গম্ভীরার দিগ্‌বিজয়। মনে হয়েছে, এ আমার পুড়াটুলীর দিগ্‌বিজয়। কল্পনা করেছি, এ আমার এই মালদহের দিগ্‌বিজয়–আমার চুনিয়া, মুনিয়া ভাইদের দিগ্‌বিজয়।' (বিনয় সরকারের বৈঠকে হরিদাস মুখোপাধ্যায়)। ১৯১৪-১৬ খ্রিস্টাব্দ (১৩২০–১৩২২ বঙ্গাব্দ) অবধি মালদহের কলিগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছে গম্ভীরা পত্রিকা। সেই সময় এই পত্রিকাটির তত্ত্বাবধায়ক হন কৃষ্ণচন্দ্র সরকার, পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব নেন হরিদাস পালিত। মালদহ জেলা স্কুলে স্বনামধন্য সংস্কৃত শিক্ষক রজনীকান্ত চক্রবর্তীর গম্ভীরা পত্রিকায় সে সময় প্রকাশিত হয়েছে 'পুরাণে বিজ্ঞান'। শুধু তাই নয়, কুমুদনাথ লাহিড়ী সেই সময়ে মালদহের গম্ভীরা উৎসবের অনেক তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করেছেন, গানের দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং মালদহের গম্ভীরা গান ও নৃত্য যাতে পুনরুজ্জীবিত হয় তার জন্য গম্ভীরা গানের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন কিছু নতুন সুর, চালু

করেছেন গম্ভীরার নৃত্যকৌশল। ১৩২০ বঙ্গাব্দে (১৯১৪) কুমুদনাথ লাহিড়ী মহাশয় তাঁর 'মালদহের কবি ও গায়কগণ' প্রবন্ধে যে কুড়িজন প্রধান গম্ভীরা লেখকের তালিকা দিয়েছেন তার শীর্ষ নামে আছে ধনকৃষ্ণ অধিকারীর নাম।

নামের তালিকা : ১। ধনকৃষ্ণ অধিকারী, চণ্ডীপুর ২। হরিমোহন কুণ্ড, সাহাপুর ৩। কৃষ্ণধন দাস বাবাজী, আইহো ৪। শরৎচন্দ্র দাস, মকদুমপুর ৫। গোপালচন্দ্র দাস, মহেশপুর ৬। কবিরাজ মৃতুঞ্জয়, হালর টীপাজানী ৭। পণ্ডিত কিশোরীমোহন চৌধুরী, পুরাটুলী ৮। সেখ সমীর খলিফা, ফুলবাড়ি ৯। মহ. সুফি, ফুলবাড়ি ১০। গদাধর দাস, গণিপুর ১১। রাখালচন্দ্র দাস, মকদুমপুর ১২। ভোলানাথ খলিফা, জোত ১৩। গুরুজী কেশবচন্দ্র দাস, মকদুমপুর ১৪। ডা. ঠাকুরদাস দাস, মকদুমপুর ১৫। গোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, গিলাবাড়ি ১৬। রাধামাধব দাস, গণিপুর ১৭। পণ্ডিত আব্দুল জাব্বার, মোজমপুর ১৮। শ্রীনিবাস দাস, কাশিমপুর/ভোলাহাট ১৯। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, কোতুয়ালী ২০। কবিরাজ সতীশ চন্দ্র গুপ্ত (কাব্যরত্ন), আইহো।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২রা মার্চ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের পক্ষ থেকে উত্তর বাংলার বিশিষ্ট গবেষক ও সাহিত্যিক ড. ফণী পাল গবেষণালব্ধ কাজে মহদীপুরে এসে ধনকৃষ্ণ অধিকারীর উত্তরপুরুষ অমরনাথ ভট্টাচার্যের (ধনকৃষ্ণ অধিকারীর পঞ্চম পুরুষ) সাক্ষাৎ লাভে জানতে পারেন যে, ধনকৃষ্ণ অধিকারীর রচিত শ্রীল শ্রীযুক্ত সনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামীর জীবন চরিত্র গ্রন্থটি ১২৯৮ বঙ্গাব্দে (১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে) ছাপার অক্ষরে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছে। মহদীপুর সংলগ্ন চণ্ডীপুর বামভিটা গ্রামেও ধনকৃষ্ণ অধিকারী বসবাস করতেন। ধনকৃষ্ণবাবুর কৌলিক উপাধি ছিল ভট্টাচার্য। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই মালদহের শিক্ষা সমিতি ও গম্ভীরা পরিষদ গঠন হবার সময়ে ধনকৃষ্ণ অধিকারীর নাম তালিকাভুক্ত না হওয়ার কারণ হিসাবে গবেষক মনে করেন সেই সময় ধনকৃষ্ণ অধিকারী হয়ত জীবিত ছিলেন না। তবে ধনকৃষ্ণ অধিকারী যে হরিমোহন কুণ্ড, হরিবোলা, মৃত্যুঞ্জয় দাস, ধরনীধর সাহা ও ডা. সোলেমান প্রমুখ রচয়িতাদের সমসাময়িক রচয়িতা ছিলেন এতে কোনো সন্দেহ ছিল না। তার প্রমাণ পাওয়া যায় এইসব রচয়িতাদের পাশাপাশি নামের উল্লেখ দেখে মালদহের পূর্বসূরি ১৭ জন গ্রন্থকারের মধ্যে দীপ্তিময় সরকার হচ্ছেন একজন। তিনি মালদহের ভূমিপুত্র। ১৯৮১ (১৩৮৮) খ্রিস্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বর মালদহের গম্ভীরার ওপর তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'মালদহের প্রধান লোক উৎসব গম্ভীরা' নামে। তাছাড়া যাট বা সত্তরের দশকে যাঁরা মালদহ জেলায় আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির চর্চায় নেমেছেন তাঁদের কাছে কালিপদ লাহিড়ীর গৌড় পাণ্ডুয়া গ্রন্থটি আকর গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। ইনিও মালদহের পূর্বসূরি গ্রন্থকারের মধ্যে একজন। তাঁর আদিনিবাস ছিল পাবনা জেলায়, পরবর্তীকালে তিনি মালদহের মুচিয়া গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। অনুসন্ধানসাপেক্ষে একথাও জানা যায় যে, লোকসংস্কৃতি প্রেমিক মালদহ কলেজের প্রাক্তন প্রয়াত অধ্যাপক মিহির কুমার গোস্বামী ওপার বাংলার (পূর্ব পাকিস্তান ও চাপাই নবাবগঞ্জের। গম্ভীরার নানা তত্ত্ব ও তথ্য লোকশিল্পীদের মধ্যে প্রচার করে উদ্দীপনার সাড়া দিয়েছেন। গবেষক হরিদাস পালিত আদ্যের গম্ভীরা নামক গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের বরিনের (বরেন্দ্রভূমির) বাঙ্গালদের গম্ভীরা

সম্পর্কে নানান তথ্য দিয়েছেন। নিম্ন শ্রেণির জনগণের (কোঁচ, পলে) বাঙ্গালগণ চৈত্রমাসের শেষে শিবপূজা করে থাকে। তাদের গম্ভীরায় আদৌ বিলাসিতার চিহ্ন আগেও ছিল না, বর্তমানেও নাই। তাদের গম্ভীরা গৃহটি থাকে জীর্ণ, শিবলিঙ্গ প্রায় মৃত্তিকা মগ্ন, গৃহাভ্যন্তরে থাকে চামর, শুষ্ক ফুলমালা, কাষ্ঠের কালি প্রভৃতি। দেবদেবীর মুখা, পুরাতন ঘট এবং ধূপদানিতে জেগে ওঠে তাদের আন্তরিক ভক্তি, পবিত্রতাপূর্ণ হয়ে উঠে উৎসবানুষ্ঠান। তাদের পূজক ব্রাহ্মণ নাই, তারা নিজেই পূজাদি সম্পন্ন করে। ঢাক বাজার জন্য অন্য লোকের আবশ্যকতা নাই। তারা স্বয়ং এ কাজ করে। প্রধান সন্ন্যাসীর গুণী পূজা করে। নৃত্যগীতাদি উৎসব সহ জাগরণ এবং মুখোশ নৃত্য হয়। বাঙ্গালেরা ভুত বিশ্বাস করে। তাদের ওপর বহু গ্রাম্য ও গ্রামান্তরের ভূত ভর করে থাকে। তারা মৃত্যুর পরে স্বর্গবাস পছন্দ করে না। তারা বলে, 'কেষ্ট বিষ্ট হয়ে কি করমু, মশনা মুশনী হমু যে ঘরে রহুমু।' অর্থাৎ দেবত্ব প্রাপ্তিতে সুখ নাই ভূত প্রেত হয়ে গৃহে থাকলে বেশি সুখানুভব হবে। এই বিশ্বাসে তারা গৃহাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিন্দুর লিপ্ত বেদী প্রস্তুত করে থাকে। তারা বলে তাদের পূর্বপুরুষগণের ভৌতিক দেহ বা ভূত আত্মা ওই সিন্দুর লিপ্ত বেদীতে অবস্থান করে। গম্ভীরার সময় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতে উক্ত প্রকার বহু ভূতের পূজা হয়ে থাকে। বরিনের গম্ভীরায় ভক্তগণের ভর বা পাতা নামে অর্থাৎ গ্রাম্য দেবতার আবির্ভাব হয়। এই পাতা নামা মুখা নৃত্যই বরিনের গম্ভীরায় প্রধান। বরিন অঞ্চলের পূজা-পার্বণের আচারীয় অনুষ্ঠানকে লক্ষ্য করেই গম্ভীরা আজ মালদহ জেলায় প্রধান উৎসব বলে বিবেচিত হয়েছে। মালদহ-দিনাজপুর সংলগ্ন এলাকা এক সময় পৌন্ড্রবর্ধনভূক্ত ছিল। এই পৌন্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত বরেন্দ্রভূমির প্রাচীন জনগোষ্ঠী হচ্ছে পৌন্ড্রক, পৌন্ড্র, পৌন্ড্র ক্ষত্রিয়। মালদহ জেলার পুরাতন মালদহ, অর্থাৎ মালদহ, গাজল, হবিবপুর ও বামনগোলা এই চারটি থানা বরিন্দ অঞ্চল বলে পরিচিত। এই এলাকায় রাজবংশী, দেশি, পলি ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর বাস এবং এদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। গম্ভীরা এদেরই প্রধান উৎসব। কারণ এরা আনুষঙ্গিক, প্রাসঙ্গিক ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিয়াকলাপগুলি খুঁটিনাটি ভাবে গম্ভীরা উৎসবে পালন করে থাকে। গম্ভীরা এই সম্প্রদায়ের উৎসব হলেও বর্তমানে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা যেমন নাগর, ধানুক চাঁই, কেওট, কাহার, গোয়ালা, জেলে, তাঁতী, নাপিত, বিন্দ ও সদগোপ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা এ উৎসবে বর্তমানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। মালদহ জেলার মালদহ (পুরাতন মালদহ), গাজল, হবিবপুর, বামনগোলা, ইংরেজবাজার, কালিয়াচক এবং চাঁচল প্রভৃতি থানা এলাকায় এই গম্ভীরা গানের প্রচলন বেশি। বিভক্ত মালদহ জেলার ভোলাহাট ও নবাবগঞ্জ থানাতেও এর প্রচলন অতীতে ব্যাপক ছিল।

গম্ভীরা উৎসবে দেশবাসীগণ ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে তাদের পুঞ্জীভূত সমস্ত ক্ষোভ প্রধান দেবতা শিবকে সামনে রেখেই প্রকাশ করেছে। কারণ ধর্মকে বাদ দিয়ে গম্ভীরা সংস্কৃতি কখনই দাঁড়ায় না। কারণ ধর্মই হলো সংস্কৃতির হৃৎস্পন্দন। তাই মালদহ জেলার বিভিন্ন থানায় বিভিন্ন নামীয় গম্ভীরা লোকগানের দলের লোকেরা ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ বিশেষ জায়গায় সমাজ জীবনের নানান সমস্যা যেমন অভাব, অনটন, সুখ, দুঃখ, সামাজিক দুর্দশা তথা সারা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অন্যান্য ঘটনাবলী

ইত্যাদির সমস্যা সমাধানের জন্য প্রাচীন গম্ভীরা লোকসংগীতের আঙ্গিকে দেবাদিদেব মহাদেবের (শিব) কাছে ব্যক্ত করে এবং তার প্রতিবাদের জন্য জনসমক্ষে তুলে ধরে এমন উন্মাদনার সাড়া জাগায় যাতে করে আকর্ষণীয় গানের রচনাশৈলী পরিবেশনা ও শিল্পী বিষয়ে বাগ্মিতা ও অভিনয় কুশলতা মানুষকে হাসির আনন্দে বিহ্বল করে তোলে। যার ফলস্বরূপ অশিক্ষিত নিরক্ষর ব্যক্তিরা সহজবোধ্য রঙ্গরস সমন্বিত ব্যাঙ্গ কৌতুক মিশ্রিত গান ও নাচের মাধ্যমে অতি সহজে জানবার সুযোগ পায়। তাই মালদহের মাটির সুরে ধর্ম ও প্রাচীন সংস্কৃতিকে পাশাপাশি রেখে গম্ভীরার গানের সুরেই শিবের বন্দনা গান। এখানে মালদহের দুজন খ্যাতনামা গম্ভীরা গানের রচয়িতা শিল্পীর 'শিববন্দনা'র গানের সংকলন করা হলো।

শিব বন্দনা

ড. দেবপ্রসাদ সাটিয়ার

শিব হে তোমার দেশের প্রতি নাইকো টান্
ভারতবাসী যত সবে বুদ্ধি হত
করে দেখ না মনে জ্ঞান
আজকে ভারত ধুলায় যে ম্লান
যে করেছিল প্রথম স্থান
করতে ভারত উদ্ধার নাইকি দেশ প্রেমাবতার
তারা আবার গাইবে দেশের কীর্তিগান
ভগবানে বিশ্বাস করে কাজ করো ধর্য্য ধরে
তবে দুঃখের হবে অবসান।

শিববন্দনা

অরুণ বসাক

(ড. প্রদ্যোত ঘোষের যোগাযোগে শিলিগুড়ি বেতারকেন্দ্রে গানটি গাওয়া হয়েছে। শিব–গৌরগোপাল গুপ্ত, ভাষ্য–অরুণ বসাক, গায়ক–মনোজ ত্রিবেদী, অখিল সাহা, **গনেশ মণ্ডল ও বুম্বা)**

শিব কোনখানে শান্তি নাই, ছটপটাচ্ছি একনা শান্তির আশায়
জ্বলছি ঘরে বাহিরে বাঁচবো কি করে একটা কিছু করার উপায়।
স্বার্থ-রাজনীতি ভাঙে সম্প্রীতি, যত গণ্ড গোলের গোড়া
আর এই কারণেই বিচ্ছিন্নতাবাদ দ্যায়রে মাথা চ্যাড়া,
কেলেঙ্কারী আর ভ্রষ্টাচারে গোটা দেশ গিয়েছে ভরে,
উগ্রপন্থী উঠেছে চ্যাঁড়া, দেশকে করবে টুকরা টুকরা
আল্লা কৃষ্ট, খৃষ্ট পাচ্ছে কষ্ট আমাদের হীনতায়।

ছোটবড় পর্দায় কুরুচি ছবি বলব কি আর হ্যায়
দেশের যুবশক্তি রাতারাতি যাচ্ছে যে গোল্লায়।
বাড়ছে খুন অপহরণ, ডাকাতি আর নারী ধর্ষণ,
সভ্য বলতে লজ্জা পায়, কর আবার শিক্ষার বড়াই,
হচ্ছে ওষ্ঠাগত প্রাণ, ঘুষ ডোনেশন, নিত্যনূতন করের বোঝায়।
নয়া শতাব্দীতে অ্যাসেও মোরা আছি সেই আঁধারে
শিশুকন্যা হত্যা, ডাইনী–হত্যা চলছে নির্বিচারে,
পনের বলি কত বধু, তাকিয়ে মজা লুট্‌ছি শুধু
বেকারে ঘরে গেছে ভরে, সবাই চড়ছে চড়চড় করে
অরুণ বসাক বলে ওরে ভোলে তুমি ছাড়া আর গতি নাই।

গবেষক হরিদাস পালিত একথাও বলেছেন, গম্ভীরা যে কেবল একটা লোকসংগীত বা লোকানুষ্ঠান তা নয়। এটা একটা 'অঞ্চলানা'। এককালে অবিভক্ত মালদহে গঙ্গা অববাহিকার দুই তীরে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছিল গম্ভীরার প্রভাব। সেকালের রচিত গম্ভীরা গানের ঘরানার মতো গম্ভীরার অঞ্চলানা সেই প্রাচীন সংস্কৃতি ও সংগীত ধারার স্বকীয়তাকে বজায় রেখে আজও চলেছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি অঞ্চলানার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। উত্তর সীমান্তের জেলাগুলিতে 'ভাওয়াইয়া' অঞ্চলানা, দক্ষিণ সীমান্তের জেলাগুলিতে 'ঝুমুর' অঞ্চলানা, গাঙ্গেয় ও পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে গম্ভীরা অঞ্চলানা। এই তিনটি অঞ্চলানার মধ্যে গম্ভীরার বিস্তৃত ও গুরুত্ব সর্বাধিক। পূর্বের ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরার অঞ্চলানার জেলাগুলির নাম দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ।

মালদহের গম্ভীরাকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। ইংরেজবাজার শহরকেন্দ্রিক গম্ভীরা, টাল-দিয়ারা অঞ্চলের গম্ভীরা এবং বরিন্দ অঞ্চলের গম্ভীরা। আগে শহরকেন্দ্রিক গম্ভীরায় নৃত্য ও বিভিন্ন ঢাকের বাজনার প্রাধান্য বেশি ছিল। কিন্তু বর্তমানে সংগীতের প্রাধান্য বেড়েছে। বরিন্দ অঞ্চলের গম্ভীরায় আদিমতার প্রাধান্য আগের মতো আছে। বর্তমানে তার সঙ্গে তান্ত্রিক আচার-আচরণ দেখা যাচ্ছে। আর টাল-দিয়ারা অঞ্চলের গম্ভীরায় আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম-দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত মালদহের গম্ভীরা ছিল পূজাকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠান প্রধান। পরে ক্রমশ তা সংগীতপ্রধান হয়ে উঠেছে। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি কর্তৃক গম্ভীরা সংগীতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ, সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন, পুরস্কার প্রদান ও দেশ-বিদেশে গম্ভীরা সংগীতের প্রচার প্রভৃতি কারণে গম্ভীরার পূজা ও তৎসংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম হ্রাস পেয়ে সংগীত ও নৃত্যের দিকটা প্রধান হয়ে উঠেছে। কালক্রমে গম্ভীরার স্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গম্ভীরা উৎসব আয়োজনের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ফলস্বরূপ গায়ক ও নর্তকগণের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। গম্ভীরা উৎসবে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়গণের উৎসাহাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। নাগর, ধানুক, চাঁয়, রাজবংশী, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যগণের মধ্যেও এখন গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অবিভক্ত মালদহে একদা ভোলাহাটের গম্ভীরার খুব সুনাম ছিল, সেকালে ভোলাহাটের গম্ভীরার পুজামণ্ডপের সাজসজ্জায় প্রচুর অর্থ ব্যয় হতো।

মালদহের শৈব উৎসব প্রাচীন গম্ভীরা প্রসঙ্গে স্বনামধন্য মালদহের ভূমিপুত্র বিনয়কুমার সরকার বলেছেন এই উৎসবে যে কেবল তিন-চার দিন ব্যাপী নৃত্যগীত ও বাদ্যের ব্যবস্থা করা হয় তা নয়। বাংলার ভাষাসাহিত্য বাঙালীর সভ্যতা, বাঙালীর আদর্শ গ্রহণ করার একটি প্রধান উপায় মালদহের গম্ভীরা। এই উৎসব হরিবংশ ও ধর্মসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রানুমোদিত। এর সাহায্যে এই জেলার সংগীত, সাহিত্য, শিল্পসমাজ, কলাবিদ্যা, ধর্ম ও সমাজশিক্ষা প্রভৃতি যুগে যুগে গঠিত হয়েছে। মালদহবাসীর অতীত ও বর্তমান সংস্কৃতি ও জীবনদর্শনের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। গম্ভীরা সংগীত সম্পর্কে তিনি আরও গভীরভাবে লক্ষ্য করেছেন যে ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস ও জয়দেবের রচনাকৌশল, বাক্যবিন্যাস, ভাবুকতা এখনও গম্ভীরা গীতকর্তাদের মধ্যে অনেক সময় লক্ষিত হয়। মালদহে গম্ভীরার মান উন্নয়ন ও বহির্বিশ্বে প্রচারের উদ্দেশ্যে গম্ভীরা নামক একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী প্রশংসনীয়। এই গম্ভীরা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডা. তারাপদ লাহিড়ী (বেতারশিল্পী)। সভাপতি ডা. আশুতোষ ভট্টাচার্য, সম্পাদক ড. প্রতাপ চন্দ্র চন্দ। এই পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের লোকসংগীতকে পুনরুজ্জিবীত করে দেশ-বিদেশে প্রচার করা।

অবিভক্ত মালদহের প্রাচীন, পরবর্তী ও বর্তমান কালের গম্ভীরা গানের প্রসিদ্ধ রচয়িতাগণ অনেকেই প্রয়াত হয়েছেন। প্রাচীন রচয়িতাদের বংশধরেরা এবং নতুন নতুন রচয়িতারা গম্ভীরার প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রাচীন ও বর্তমান গম্ভীরা গানের রচয়িতাদের মধ্যে বেশির ভাগ রচয়িতারা স্বল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর গ্রাম্য কবি হলেও তাদের বহু গানে প্রতিভার স্বাক্ষর বিদ্যমান। গম্ভীরা শিল্পীদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু সংগীত রচয়িতা আবার কেউবা সংগীত রচয়িতা ও গায়ক উভয় গুণসম্পন্ন। সংগীত রচয়িতাদের মধ্যে কতিপয় শিল্পী ভনিতা (গানের শেষে নাম উল্লেখ) দিতেন আবার কতিপয় শিল্পী ভনিতা দিতেন না। অভিভক্ত মালদহের শহর থেকে শুরু করে গ্রাম-গ্রামান্তরের প্রাচীন, পরবর্তী ও বর্তমান কালের গম্ভীরা সংগীতের, রচয়িতা ও গায়ক শিল্পীদের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো। প্রাচীন ও পরবর্তীকালের অনেক শিল্পী আজ আমাদের মাঝে না থাকলেও তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ অঞ্চলভিত্তিক আঞ্চলিক সংগীতের রচনাশৈলীর উচ্চারণজনিত ভঙ্গির সুরের অলঙ্কার এমনভাবে দিয়ে গেছেন যাতে করে সেই সংগীত এখনও স্বকীয় ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্যে ও স্বতন্ত্র মাধুর্যে সমৃদ্ধ হয়ে আছে এবং চিরদিনই থাকবে।

অবিভক্ত মালদহের গম্ভীরা সংগীতের রচয়িতা শিল্পীদের নাম

চাপাই নবাবগঞ্জের সিরাজুল ইসলাম, ভোলাহাটের ধর্মদাস মণ্ডল, গিলাবাড়ির গোষ্ঠবিহারী বাণিজ্যা, নীলকণ্ঠ দাস, বজরা ট্যাকের সমীর খলিফা, ইংরেজবাজারের মহ. সোলেমান, রামকিংকর পণ্ডিত, মাজিদ, উমেশ চৌধুরী, দেবনাথ রায় (হাবলা), মেরাজুদ্দিন, আবুল হোসেন, আকবর খলিফা, শরৎ পণ্ডিত (ভট্টাচার্য), গোপাল দাস, কিশোরী দত্ত, শরতচন্দ্র দাস, ঝড়ু খলিফা, সমীর খলিফা ও গঙ্গারাম, ফুলবাড়ির মহ. সুফী ও অসীম রায়, কুতুবপুরের গোবিন্দলাল শেঠ, গোপীনাথ শেঠ ও প্রশান্ত শেঠ, পুরাটুলীর তপন হালদার, বাঁশবাড়ির দোকড়ী চৌধুরী, গোলাপট্টীর ডা. দেবপ্রসাদ সাটিয়ার,

হাটখোলার বিশ্বনাথ পণ্ডিত, মকদুমপুরের মনোরঞ্জন দাস, ধরণীধর সাহা ও সৌরভ ঘোষ, গয়েশপুরের বামনবিহারী গোস্বামী, ধানতোলার গদাধর মণ্ডল, সুধাকর দাস ও শ্রীদামচন্দ্র দাস, সাহাজালালপুরের জগৎচরণ দাস, নরহাট্টার দীনবন্ধু সাহা ও কৃষ্ণগোপাল পাল, আড়াপুরের মৃত্যুঞ্জয় হালদার ও সুবোধ দাস, জোতের দুর্গাচরণ চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ দাস, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ব্রজেন্দ্রনাথ দাস, বীরেন্দ্রনাথ বর্মন, মহেশপুরের গোপালচন্দ্র দাস, বিধানপুরের তারণ খলিফা, মহদীপুরের ধনকৃষ্ণ অধিকারী, মৃত্যুঞ্জয় শর্মা, শ্রীরূপ খলিফা, মধুসুদন খলিফা, বসন্ত মজুমদার ও ভৈরবনারায়ণ সরকার, অমৃতির বিষ্ণু প্রসাদ নাগর। পুরাতন মালদহের আব্দুল রাকিব, অরুণ বসাক, রবিশঙ্কর ঘোষ ও অশোক গুপ্ত, সাহাপুরের হরিমোহন কুণ্ড, তারাপদ সরকার (মণ্ডল), মুচিয়ার তারাপদ লাহিড়ী, গোপাল গুপ্ত, কালীপদ গুপ্ত, ব্রজলাল পসারী, বিপিন খলিফা, শশী ডাক্তার, ইমারত হোসেন চৌধুরী, জীবন হালদার, মৃণালকান্তি রায়, হাজারী বসাক ও বনমালী দাস, মাধাইপুরের মাধাই গোঁসাই, আইহোর কৃষ্ণধন দাস (গোস্বামী), ডা. সতীশচন্দ্র গুপ্ত, ইন্দ্রদমন শেঠ, উপেন্দ্র কর্মকার, ভূপেন্দ্র নাথ সাহা, রজনী সরকার, সুদর্শন শেঠ, বিনয় গুপ্ত, কালিপদ গুপ্ত ও নিতাইচন্দ্র দাস, মানিকপুরের অমর মণ্ডল, গাজলের উপেন মণ্ডল, চাঁচলের বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অবিভক্ত মালদহের গম্ভীরার গায়ক শিল্পীদের নাম

মহ. কুতুবুল আলম ও মহ. রকিবুদ্দিন, হরিদাস দাস ও রাধানাথ কুণ্ড, কুতুবপুরর অমরনাথ মণ্ডল, আশুতোষ ঘোষ, হরিবোল সাহা (হরিবোলা), নগরা, কিনু হালদার, মুচিয়ার কালুয়া ও বিশুয়া (ভ্রাতৃদ্বয়), সাহাপুরের সুনীল হালদার, ভবেশ দাস, বাপী হালদার, হরেন্দ্রনাথ দাস, শরত কর্মকার, বাবুলাল মণ্ডল, বিমল গুপ্ত, গোপাল সূত্রধর, অদৈত বিশ্বাস, ইংরেজবাজারের প্রবাদশিল্পী যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী (মটরা) ও নির্মল দাস (নিরু), মাধবনগরের কুশ মল্লিক, মকদমপুরের পরিতোষ চক্রবর্তী, মানিকপুরের অনিল মজুমদার, শঙ্কর মণ্ডল, নুরবাহিগ্রামের বিপদভঞ্জন গোস্বামী, বারঘরিয়ার অশোক ঝা, কুতুবপুরের প্রবোধ দাস, নিখিল চৌধুরী, সদরঘাটের সুকুমার দাস, আন্ধারুপাড়ার অশোক বোস, গয়েশপুরের তপন বসাক, ঝলঝলিয়ার আনন্দ দাস, বিমল দাস, নারায়ণ দাস, বাঁশবাড়ির স্বপন চৌধুরী, বিনয় সরকারের রোডের নবমী নিয়োগী, ইংরেজবাজারের অশোক চক্রবর্তী, সুবীর দত্ত, কার্তিক বর্মন, বিক্রম দাস, সমীরণ সাটিয়ার, নবীন রক্ষিত, প্রসেনজিৎ ঘোষ ও পার্থ কর্মকার, বালুচরের বিশ্বনাথ দে, প্রবাল পল্লীর বিশ্বনাথ সরকার, পুরাটুলির নিখিল দাস, পুরাতন মালদহের নিত্যানন্দ দাস, নিশিথ বসাক, তন্ময় শেঠ, গণেশ মণ্ডল, মনোজ ত্রিবেদী, কৌশিক বসাক, স্বরূপ বসাক, অখিল সাহা, উত্তম পাকড়াশি, গৌরগোপাল গুপ্ত, বুম্বা, মূল গায়ক ও অভিনয়ে মালদহ জেলায় অদ্বিতীয় গায়ক শিল্পী নারুগোপাল দত্ত। অন্যান্য গায়কশিল্পী প্রসাদ দেব, রাজিব দাস, সুভাষ সরকার, শান্তু দাস, সুনীল কুণ্ড, সৃজন ঘোষ ও বাপ্পা চক্রবর্তী, আইহোর দুর্গাচরণ রায়, নিশিথ দাস, ষষ্ঠীচরণ মণ্ডল, সুকুমার মণ্ডল, সত্যচরণ হালদার, রাজকুমার দাস ও প্রবীর রায়, গাজলের সুশীলকুমার দাস, হাবল দাস, কৃষ্ণ মুদী, কার্তিক দাস, কিরণ চক্রবর্তী, আদমপুরের

বাবুলাল বর্মন। ধানতলা, কোতুয়ালী, নরহাট্টা, জোত, আড়াপুর ও টিপাজানীর রাধাবিনোদ দাস, উমাকান্ত দাস, গোপীনাথ দাস, ঠাকুরদাস দাস, ভবেশ দাস, বিনয় প্রামাণিক, বিজয় দাস, শম্ভুনাথ দাস, শুধাংশু দাস, তিনকড়ী মণ্ডল, শশী দাস ও সুরেশ সরকার, রাখাল রায়, কার্তিক রায়, সুরেন চৌধুরী, নগেন দাস, সত্যরঞ্জন দাস, যশোদানন্দন রায়, চারু ভৌমিক, পতিতপাবন দে, গঙ্গা দাস, বিভূতি বর্মন (বড়ো), বিভূতি বর্মন (ছোটো), দেবেন চৌধুরী, মধু মণ্ডল, ফণী দাস, সুফল মণ্ডল, জগন্নাথ রায়, বৈদ্যনাথ রায়, সুরেন চৌধুরী, নগেন দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ চৌধুরী, অমল চৌধুরী, শান্তি পাল, ফণী দাস, নিখিল দাস, চারু রায়, মধু হালদার, অমর হালদার, শশা দাস, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, রতুয়ার কিশোর রায় প্রমুখ শিল্পীগণ।

মালদহের ফুলবাড়ির স্বনামধন্য গম্ভীরা গান রচয়িতা মহ. সুফীর নাম গম্ভীরা জগতে অমর হয়ে আছে। বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে রাজনৈতিক বিষয়ক গম্ভীরা গান রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন এবং ব্রিটিশ রাজত্বকালে নিজের ভাব-ভাবনায় মালদহের গম্ভীরা গান কিভাবে পরিচালিত হবে তার একটা ছক ও রূপরেখা তৈরি করেন যেমন শিববন্দনা, ডুয়েট, চার-ইয়ারী, টপ্পিং ও রিপোর্ট (সালতামামী)। এ তথ্য পুরাটুলী নিবাসী নানাহে গম্ভীরা দলের বর্তমান পরিচালক এবং মালদহের খ্যাতনামা সর্বপ্রথম লালন পুরস্কার প্রাপ্ত মৃৎশিল্পী বিশ্বনাথ পণ্ডিতের একান্ত অনুগত শিষ্য মৃৎশিল্পী তপন হালদারের কাছে জানতে পারে। মহ. সুফি ব্রিটিশের শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে সে সময় বেশ কয়েকটি গম্ভীরা গান রচনা করেন। এই উদ্ধৃত গানের কলির কথাও তপন হালদার আমাকে বলেছেন এটি হচ্ছে নতুন টাকার গান, ব্রিটিশ সরকার সে সময় নতুন টাকায় ছাপিয়ে ছিল কলাগাছের ছবি। এই গানের কলি এখানে সংকলন করা হলো।

'সাহেব ধরিয়া লাঙল কলার গাছ হে
নাছাচ্ছো বেশ ভালুক নাচ হে
এই সোনার ভারতে, দোকান আড়তে,
চাঁদির বিনিময়ে কাঁচ হে–
নাচাচ্ছো বেশ...
আধপয়সা কাগজেতে, তেরেঙ্গা দিচ্ছ তাতে
একি সাহেব তোদের বিচার হে–
নাচচ্ছো বেশ....'

মহ. সুফির সে সময়ের রচিত আর একটি গানের কলি এখানে দেওয়া হলো। যে গানে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন–

'তুমি ঘুঁসির (ঘুঁটে) আগুন, তুষের ধোঁয়া,
লাগিয়ে দিলে বঙ্গে
আজ হাবুডুবু খায় ভারতবাসী, স্বরাজ তরঙ্গে।
হাল চাষ করে বঙ্গের মাটি
বুঁদলা গোপালভোগের আঁটি
তাতে ফল ফলিল তরমুজ ফুটি

আলু পটল ঝিঙে
বঙ্গমাতার সুতসুতা, দেশের মাঝে সাজলো নেতা
আজ পিঠে তাদের রুলের গুঁতা দিয়েছে শ্বেতাঙ্গে।'

সেই সময় গম্ভীরা গান রাজনৈতিক বিষয়ে প্রাসঙ্গিকতা পেত বলে সুফীমাস্টারের গম্ভীরা গানের খাতা নাকি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। এ তথ্য জানতে পারি পুরাতন মালদহের লুব্ধক একটি সাংস্কৃতিক প্রয়াস, গম্ভীরা দলের পরিচালক রবিশঙ্কর ঘোষের কাছে।

অতীতে মালদহের গম্ভীরা উৎসবে শুধু মুখোশ নাচ ও টপ্পা গান হতো। এখানে মালদহের একটি টপ্পা গানের কলির নমুনাও দেওয়া হলো।

টপ্পা

তপন হালদার, প্রবোধ দাস ও সুকুমার দাস
'যা পরেছে দিনকাল, সবই আকাল
নুন্ কিনতে ত্যাল জুটে না নানা,
মালদার আম সুবিখ্যাত ছিল
হঠাৎ বাজার পড়্যা গেল
চিনি ভিজ্যা আম কিনে
আমি হলাম তালকানা—নানা।'

পরবর্তীকালের গম্ভীরা গান রচয়িতাদের মধ্যে হাটখোলার প্রয়াত বিশ্বনাথ পণ্ডিতের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে গম্ভীরা গানের জন্য সর্বপ্রথম লালন পুরস্কার পান। দ্বিতীয়বারে লালন পুরস্কার পান 'বাঁশবাড়ির দোকড়ী চৌধুরী। দোকড়ী গম্ভীরা গান রচয়িতা ও গায়কশিল্পী। তাঁর স্বতস্ফূর্ত চড়া গলার গম্ভীরা গান জনমানসে এক অভিনব সাড়া জাগিয়ে তোলে বিশেষ করে মালদহের 'আমের' গানে। এটি আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি তৃতীয়বর্ষ রাজ্য আম উৎসবে মালদহে ২০০৫-এ স্মরণিকা ও অফিস সাব-কমিটির সদস্য হিসাবে উৎসবানুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে। এবারে এ জেলার পুরাতন মালদহ ও গোলাপট্টীর সদস্য প্রয়াত গম্ভীরা গানের স্বনামধন্য রচয়িতা ডা. দেবপ্রসাদ সাটিয়ারের কথা উল্লেখ না করলে গম্ভীরা গানের জগতে বেশ কিছু অপূর্ণতা থেকে যাবে, যিনি শৈশবকাল থেকেই পুরাতন মালদহে গম্ভীরা আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হয়ে বহু গান রচনা করেন। প্রথমাবস্থায় তিনি একাই কথা-সুর ও গায়কের ভূমিকায় তাঁর রচনা করা বিভিন্ন গানে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর আটটি জনপ্রিয় গম্ভীরা গানের সংকলনে 'শিব হে' নামীয় একটি গানের ক্যাসেট প্রকাশিত হয়। পুরাতন মালদহের পীরোজপুর নিবাসী তারকেশ্বর চৌধুরীর কাছ থেকে এ তথ্য জানতে পারি যে ডা. দেবপ্রসাদ সাটিয়ার আনুমানিক ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে একটি গম্ভীরার দল তৈরি করেন, যে দলের মূল গায়ক হিসাবে ডা. সাটিয়ার নিজেই ছিলেন এবং দোহারী হিসাবে সেই দলে ছিলেন পুরাতন মালদহের পিরোজপুরের তারকেশ্বর চৌধুরী ও সুকদেব দাস, শর্বরীর কৃষ্ণ বাগচী ও বিশ্বনাথ সরকার, বাঁশবাড়ির বিখ্যাত তবলাবাদক বিশ্বনাথ বসাক, যন্ত্রশিল্পে

ইংরেজবাজারের আনেসুর রহমান প্রমুখ। গম্ভীরার রচয়িতা শিল্পদের কথার পরিশেষে গম্ভীরার গায়কশিল্পীদের কথা বলতে গিয়ে এ জেলায় স্বনামধন্য গুরু-শিষ্য দুজন গায়কশিল্পীর কথা বলা যেতে পারে তাঁরা হলেন জনপ্রিয় দুজন গায়কশিল্পী যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী (মটরা) ও নির্মলচন্দ্র দাস (নিরু)। গুরু-শিষ্য দুজনেই এ জেলার জনপ্রিয় শিল্পী পুরুষ ও মহিলার ভূমিকায়। তাঁদের নাম মালদহের আকাশে-বাতাসে এখনও ছড়িয়ে আছে, তাঁরা হচ্ছেন অপরাজেয় অমর শিল্পী।

মুখোশ নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে আইহোর বৈদ্যনাথ হালদার এবং ঢাকী শিল্পীদের মধ্যে জগন্নাথ, রবিদাসের নাম এখনও অমর হয়ে আছে। আমি নিজে দেখেছি পরান রবিদাসকে পুরাতন মালদহের তারাপুরে ঢাক বাজাতে। সেও ছিল একজন নামকরা ঢাকিয়া। বিভিন্ন নৃত্যকারীরা নৃত্যের তাল ও সঠিক নৃত্য করতে না পারলে তিনি তৎক্ষণাৎ নেচে নেচে তার ঢাক বাজনার তালের সঙ্গেই নৃত্যকারীদের প্রশিক্ষণ দিতেন। মালদহের গম্ভীরার ইতিবৃত্ত আলোচনা করতে গিয়ে একটি কথা আমার বারবার মনে হয়েছে অতীতে গম্ভীরা গানে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিল্পী ও দোহারদের বলিষ্ঠ কণ্ঠে গম্ভীরা গান প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে উঠত। কয়েক দশক থেকে এই অঙ্গটি ক্ষীণতর হয়ে উঠেছে। ত্যাগ ও সেবা ধর্মে আগের সেই নীতি এখন আর বজায় নেই। গম্ভীরা গান তার পুরানো ঐতিহ্যকে ক্রমান্বয়ে হারাতে বসেছে এবং সেই গান ধীরে ধীরে স্টেজধর্মী হয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে মালদহ জেলার পুরাতন মালদহ সেই পুরানো ঐতিহ্যকে অনেকটা ধরে রাখতে পেরেছে। তাই জীবিতকালে মালদহের একমাত্র শিক্ষিত গম্ভীরার রচয়িতা শিল্পী ডা. দেবপ্রসাদ সাটিয়ার গম্ভীরা শিল্পীদের বাঁচাতে গিয়ে বলেছেন, 'মালদহের গম্ভীরা নিয়ে আজ এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মানুষ রীতিমতো ব্যবসা শুরু করেছে, গম্ভীরার পূজামণ্ডপ ব্যতিরেকে এখানে-সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কতিপয় কয়েকটি গোষ্ঠিকে অনুষ্ঠান পাইয়ে দিয়ে ওই মানুষেরা দালালের ও ঠিকাদারের কাজ করে চলেছেন। জীবিতকালে এই বিষয়টি তিনি মালদহ জেলার তথ্যসংস্কৃতি দপ্তরকে জানান, যাতে করে কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এই মহান শিল্পী গম্ভীরাকে শুধু গম্ভীরা গানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি, চেয়েছেন তার ব্যাপ্তি ঘটাতে। তাই ইংরেজবাজার শহরে ড. প্রদ্যোত ঘোষকে নিয়ে বুলেট ক্লাবে গম্ভীরার ব্যাপ্তির জন্য কিছু অনুষ্ঠান করতে চেয়েছিলেন কিন্তু একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী মানুষের চক্রান্তে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই মনের দুঃখে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, মালদহের গম্ভীরার ভবিষ্যৎ কি হবে জানি না। তবে মালদহের গম্ভীরা যদি কিছুটা বেঁচে থাকে সেটা রয়েছে পুরাতন মালদহের জন্য।'

প্রতিবছর ৩১ বৈশাখ এই দিনটিতে ওই পুরানো শহরের পিরোজপুরে তিনি যেতেন এবং মালদহ জেলার বিখ্যাত সং দেখতেন এবং সেই সঙ-এর প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসাবেও অংশগ্রহণ করতেন এবং পুরাতন মালদহবাসীর ভূয়সী প্রশংসা করতেন। প্রতিবছর ৩১ বৈশাখে পুরাতন মালদহে জনমানসে এক নতুন প্রাণচাঞ্চল্যের সাড়া এখনও পড়ে যায় সেই সুপ্রাচীন গম্ভীরানুষ্ঠান ও গম্ভীরা লোকগানের পুরানো ঐতিহ্যকে নিয়ে। ড: সাটিয়ারের লেখা 'স্মৃতি আলোয় চারুগোপাল শেঠ' এবং পুরাতন মালদহের গম্ভীরা গীতি' এই দু-টি প্রবন্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে, সুপ্রাচীন গম্ভীরার ইতিহাসই ছিল পুরাতন মালদহের

গ্রামীণ সংস্কৃতির এক গৌরবময় অধ্যায়। পুরাতন মালদহের বনেদি জমিদার প্রয়াত চারুগোপাল শেঠ ছিলেন সংগীতপ্রিয়, জনদরদী ও সুরসিক পুরুষ। নিজের গুণে তিনি ছিলেন পুরাতন মালদহের নয়নমণি। তাঁকে বাদ দিয়ে কখনই পুরাতন মলদহের গম্ভীরা উৎসবের কথা ভাবাই যায় না। তিনি সেকালে তাঁর বসতবাড়ির পাশেই নিজস্ব শিবমন্দিরের সামনে সামিয়ানা খাটিয়ে বৈশাখ মাসের গম্ভীরার উৎসবের নির্দিষ্ট দিনে গম্ভীরা উপলক্ষে সং, মুখোশ নৃত্য ও দলগত গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠান সারারাতব্যাপী চালাতেন। তাঁর ব্যক্তিগত আর্থিক সহযোগিতা, সাহচর্যে অনেক গুণী শিল্পীর সে সময় সমাবেশ ঘটত। চারু শেঠের মাধ্যমেই গম্ভীরা গানের শিল্পী হিসাবে মালদহের ভূমিপুত্র ডা. দেবপ্রসাদ সাটিয়ারের সর্বপ্রথম পরিচিতি ঘটে। তাই 'স্মৃতির আলোয় চাঁরুগোপাল শেঠ' প্রবন্ধে ডা. সাটিয়ার বলেছেন, 'গম্ভীরা গানের শিল্পী বা গায়ক হিসাবে প্রথম আমার পরিচিতি ওই চারুবাবুকে কেন্দ্র করে। আমি তখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। আমার সেই গম্ভীরা গানের প্রথম দু ছত্রের আমি উল্লেখ করছি। কথাগুলি ছিল–

'শিব ওই চারুবাবুর পেট মোটা
হায় রে পানি শাল্লা উঠিয়া দিলা
এমন বুদ্ধি দিলে কেটা।'

এই গানের কলি দিয়েই আমার গম্ভীরা গানের সূত্রপাত এবং এই চারুবাবুই আমার গম্ভীরা গানের প্রথম ব্যক্তিত্ব ও উৎসমুখ। তিনি আমার প্রণম্য।'

সূত্র সহায়তা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। হরিদাস পালিতের আদ্যের গম্ভীরা।
২। কালিপদ লাহিড়ীর গৌড় পাণ্ডুয়া।
৩। ড. হরিপদ চক্রবর্তীর মালদহের গম্ভীরা ও আলকাপ।
৪। ড. প্রদ্যোত ঘোষের লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা।
৫। কমল বসাকের মালদহের পূর্বসূরি ও গ্রন্থকার।
৬। সাংবাদিক ধীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গম্ভীরা সম্পর্কিত কয়েকটি কথা বরিন্দ মেলা উৎসব সুভেনির, ১৯৯২ থেকে।
৭। ড. রাধাগোবিন্দ ঘোষ কর্তৃক সংকলিত পুস্তক 'ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোকে" পুরাতন মালদহের স্মৃতি আলোয় চারুগোপাল শেঠ প্রবন্ধ থেকে।
৮। রবিশঙ্কর ঘোষের লেখা জেলা বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত বিগত 8 অক্টোবর ২০০৫ (১৮ আশ্বিন, ১৪১২) -এ 'এক কলাকার কি মউত রেখে গেল অনেক প্রশ্ন থেকে।
৯। ড. ফণী পালের লেখা সম্পাদক সুজিতকুমার বিশ্বাস কর্তৃক ২৮ লক্ষীবাঈ পথ। সিটি সেন্টার দুর্গাপুর ১৬, বর্ধমান থেকে প্রকাশিত। 'পুরাপত্র' ত্রৈমাসিক ২য় সংখ্যা, প্রথম বর্ষ, ১৪১২ পত্রিকায় 'গম্ভীরা গানের স্বর্ণযুগ' থেকে।

বিষয়বস্তুযুক্ত গম্ভীরা গানের উদ্ভব অন্যান্য লোকসঙ্গীতের তুলনায় বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তার নিজস্ব প্রাণশক্তিতে, রঙ্গে-ব্যাঙ্গে-নাট্যে সে এ জগতে একক ও অদ্বিতীয়।

বাংলার যুগ–সন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বর গুপ্তের (১৮১২–৫৯) লেখায় লিখিত সাহিত্যে এই ধারায় সূত্রপাত আধুনিক বাংলার। ধ্রুপদী ও লোকসাহিত্যের পটভূমিকায় গম্ভীরাকে স্থাপন করলে লোকচৈতন্যের উদ্বোধক হিসেবে তার স্মরণীয় ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচিতব্য।

গম্ভীরা গানের সমাজ মূল্য যতটা বেশি, সাহিত্য মুল্য ততটা নয়।[৯] কারণ, এ গানের যা কিছু সম্পদ বা বক্তব্য সব সমাজকে ঘিরে–সমাজই তার একমাত্র অবলম্বন। তাই এর রচয়িতারা ভাবুক রোমান্টিক কবি নন, নন ধর্মীয় সঙ্গীত রচয়িতা আউল, বাউল, সুফি, মুর্শিদা, মারফতি বা মরমিয়া কবি। মাটির পৃথিবীতে চোখ খুলে তাঁরা পথ চলেন। তাঁদের বক্তব্যে তাই সমস্যা জর্জর সমাজের শতছিন্ন রূপের কথা, কখনো বা লজ্জাহীন শোষণের কথা ধ্বনিত হয়। সমাজচৈতন্যের মুক্তিদাতা হিসেবে তাই তাঁরা লোকসাহিত্যের জগতে সমাসীন।[১০] তাঁদের স্বাতন্ত্র্য এখানেই।

গম্ভীরা গান 'সালতামামি' হিসেবে প্রথমত উদ্ভূত হলেও ব্রিটিশ আমলে বিশেষত প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে তার অঙ্গনে ব্যাপক বৈচিত্র্য ঘটতে থাকে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, তার বহুবিধ সমস্যা, গম্ভীরা গানের অঙ্গনে পরিগৃহীত হয়ে ওঠে। দেশভাগের পর থেকে তার প্রসারণ আরও বেড়ে যায়। তাই বর্তমানে বিষয়বস্তুর দিক থেকে গম্ভীরা গান বিবিধ বৈচিত্র্যের অধিকারী। সুতরাং বিষয়গত দিক থেকে গম্ভীরা গানকে প্রধানত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা–

১. ধর্মীয় বিষয় নিয়ে রচিত গম্ভীরা।
২. সামাজিক বিষয় নিয়ে রচিত গম্ভীরা।
৩. পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক গম্ভীরা।
৪. রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে রচিত গম্ভীরা।
৫. বিবিধ বিষয়ক গম্ভীরা।

ধর্মীয় বিষয় নিয়ে রচিত গম্ভীরা

সম্প্রতি গম্ভীরা গান সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে বিবর্তিত ও প্রসারিত হলেও গম্ভীরা উৎসব-পূজা ও গানের জন্ম যে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তখন থেকে উনিশ শতকের শেষাবধি তা ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগে মানুষের আচারে বিশ্বাসে, মননে কর্মে, এক কথায় সার্বিক ক্রিয়াকলাপে ধর্ম ছিল জড়িত। সে ধর্ম সাধারণত লোকধর্ম। কেননা, লোক সমাজের ধ্যান-ধারণা, আচার-সংস্কার পূজা-পার্বণ ও উৎসব-অনুষ্ঠান সবই লোক-বিশ্বাস থেকে উৎসারিত। বিশ্বাস মনোজ। বস্তু বা বিষয় গুণের ধারণা থেকেই বিশ্বাসের জন্ম।[১১] এই লোক-বিশ্বাসই ধর্মের ভিত্তি। অই মানুষ যখনই কোনো সমস্যার আবর্তে পতিত হয়েছে, তখনই সে শরণ নিয়েছে দেবতা বা অশরীরী শক্তির।

এই অশরীরী শক্তিকে তুষ্ট করতে পারলেই তার মুক্তি–এই বিশ্বাসে সে তার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য বা বিনম্র আকুতি প্রকাশ করেছে গানের মাধ্যমে।[১২] কারণ, লোকসঙ্গীত মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপের বিচিত্র অভ্যাস-আচরণের একটি কাব্যময় সুর ও ছন্দময় প্রকাশ বলে, এর সব কথাই সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত।[১৩] তাই লোকসঙ্গীত মানবচিত্তের আদি ও সহজ ধর্ম।[১৪]

এমনিভাবে একদিন লৌকিক সূর্যদেবতার স্মরণে অনুষ্ঠিত সূর্যোৎসব[১৫] থেকে বিবর্তিত হয়ে গম্ভীরা পূজার সূচনা হয়েছিল। যুগের বিবর্তনে তা শেষ পর্যন্ত গানে রূপান্তরিত হলেও সূর্য পূজা বা ধর্মঠাকুরের স্মরণ হিসেবে দীর্ঘদিন গম্ভীরা আসরের এক কোণে শিবের মূর্তি স্থাপনের রেওয়াজ চলতে থাকে। তখন মানুষ নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কথা, অভাব-অভিযোগের কথা, ব্যথা-বেদনার কথা গানের আসরে শিবকে উপলক্ষ করে উপস্থাপন করতো। কারণ, তাদের বিশ্বাস-শিবই সকল অনিষ্টের মুল।[১৬] তাই শিবকে তুষ্ট করার জন্য ভক্তের বিনম্র নিবেদন–

শিব মনের কথা দু'টা বলিব
এনে জড় জগতে, ঘুরাও নানা পথে,
কোথা গেলে দেখা পাইব।
পড়ে শুনে শিখি শুধু তুমি বিশ্বেশ্বর,
বচন আউড়াতে আমরা হয়েছি খুব দড়,
ভুলে গেছি তব পূজা, তাই আমরা পাচ্ছি সাজা,
দুঃখের কথা কারে কহিব।
ধরমের সার গেছে কাল-স্রোতে ভেসে
সংস্কার রয়েছে এ পোড়া দেশে
বল পুনঃ কিসে ধর্ম ফিরে আসে,
সে উপায় আমরা শিখিব।
নিজ নিজ স্বার্থ হল ধর্ম কর্ম
এই কি, শিব, তোমার সনাতন ধর্ম,
বুঝি দেশের মর্ম করিব যে কর্ম
খাঁটি কর্ম এবার হইব।
ত্যাগীবেশে তুমি এসে এই গম্ভীরায়,
মনসাধে পুঁজি মোরা, ভাই-বোন সবায়
হায়, একি হ'ল দায়, নিজে ত্যাগী হতে নাহি চায়,
এ ছলনা আমরা ছাড়িব।[১৭]

ভক্তের নৈবেদ্য নিবেদনে শিব সাড়া না দিলে ভক্তের মনে স্বভাবত ক্রোধ জেগেছে। কারণ, ভক্তের উদ্দেশ্য তো শুধু আত্মনিবেদনই নয়, আত্মপ্রসারণও। কিন্তু শিব 'ভাঙ ধুতরা' খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে বলে–সেদিকে তার কোনও খেয়াল নেই। অথচ ভক্তের নিবেদন–

ভোলা হে! ভোলা এ কি কর‍্যাছ মোদের দশা,
ভাঙ-ধুতুরা খায়্যা ব্যোম হয়্যা আছ বোস্যা।
প্যাটেতে আজ ভাত নাই, পরনেতে ত্যানা,
হাল-বলদ সব বেচ্যা ফেল্যা, দিতে হলো খাজনা।
এখন করি কি হে, ভোলা নানা, তার উপরে রোগের জ্বালা
হারিয়্যা ফেল্যাছি দিশা।[১৮]

কিন্তু দুর্দশা তো শুধু ভক্তদেরই নয়, শিব নিজেও দুর্দশাগ্রস্ত। তাঁর সাজসজ্জাতেও তো ভক্তি জাগে না। অথচ তিনি 'শিবায়ণ' বা 'শিবমঙ্গলের' চরিত্র।

শিব তোমার এ কি সাজ, মাথায় বাঁইন্ধ্যাছ কেনে জটা,
ম্যালেরিয়ায় ভুগ্যা ভুগ্যা ভুঁড়ি কর‍্যাছ মোটা।
হাতি ঘোড়া ছাড়্যা দিয়্যা ষাঁড়ের উপর চড়্যা
তোমার কপাল গিয়েছে পুড়্যা।
এবার নতুন সাজে না সাজলে পূজা করবে তোরে কেটা?[১৯]

তবু এই বৃদ্ধকে না ছাড়ার ইচ্ছা, কারণ তার সমাধান তারই হাতে–

ধর ধর, দিস নলা ছাড়্যা লিয়া চলেক সঙ্গে কর‍্যা।
এই বুঢ়াটা দিলে বড় দুরুখ হে, দিলে বড় দুখ।
ধান বুনিলে দ্যায় না পানি, এই বুঢ়াটা বড়ই শনি
সদাই রহে মোদের প্যাটে ভুক হে।
দামড়ার উপর চড়্যা বেড়ায় কুচলী পাড়ায় ঘুর‍্যা
বুঢ়্যা ঠাট্ কুহুরা জানে কতই কর‍্যা বেড়ায় তুক হে
করে কতই তুক।[২০]

অর্থাৎ ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে যে শিবকে নৈবেদ্য নিবেদন করেছে, অবস্থার প্রেক্ষিতে তার প্রতি ভক্তের বীতস্পৃহতাও জেগেছে স্বাভাবিকভাবেই।

ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মুসলমান শিল্পীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গম্ভীরা গান ধর্মের খোলস থেকে বেরিয়ে আসে এ শতাব্দীর প্রথম পাদেই। ফলে গম্ভীরা গানে আর শৈবিক বন্দনা বা ধর্মীয় পরিবেশ প্রতিফলিত হয় না। বর্তমানে কিছু কিছু ধর্মীয় উৎসবে ধর্মীয় অনুভূতিপ্রসূত কিছু গান পরিবেশিত হলেও তা নৈবেদ্যসূচক নয়, ধর্মীয় বিধান নির্দেশক। রোজা, নামাজ, হজ্জ্ব, জাকাত প্রভৃতির মাহাত্ম্য বর্ণনা করে জনগণের মনে ধর্মীয় আবেদন সৃষ্টি করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সামাজিক বিষয় নিয়ে রচিত গম্ভীরা

ব্যষ্টির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সমাজ এবং সমাজকে কেন্দ্র করেই প্রকাশ পায় ব্যষ্টির অনুভূতি। সমাজ ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ব্যষ্টির অনুভবে নানা রঙ ও রূপের সৃষ্টি করে। এই রং ও রূপের মন্থনে মন-সাগরে যে গরল ওঠে তাই বাণীবদ্ধ লাভ করে সম্প্রসারিত হয় সমাজ-মানসে। কেননা, যে কোনো অনুভূতি ব্যষ্টি-মন থেকেই সমষ্টি মনে সঞ্চারিত হয় এবং তারপর তার বিকাশ ঘটে।[২১] সুতরাং সমাজকে বাদ দিয়ে যেমন

ব্যষ্টির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তেমনি ব্যষ্টিকে বাদ দিয়ে সমাজের কল্পনাও করা যায় না।

আমরা পূর্বেই বলেছি, গম্ভীরা গানের যা কিছু সম্পদ বা বক্তব্য সমস্তই সমাজকে ঘিরে। সমাজই তার একমাত্র অবলম্বন। সমাজের অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি মানুষকে অবহিত করার একটি বিশেষ মাধ্যম এই গম্ভীরা, যা সারাসরি অন্য কোনো মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। কমলাকান্তের মতো শর্করার মোড়কে ঢেঁকে সেই কঠিন সত্য এখানে অবলীলাক্রমে প্রকাশ করা সম্ভব। তাই সমাজের সমস্ত অন্যায়-অত্যাচার অভাব অভিযোগ, দোষ-ত্রুটি, সামাজিক অবক্ষয় এ গানে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে। এর শিল্পীরা এত স্পর্শকাতর বা সচেতন যে, তাঁদের সূক্ষ্মদৃষ্টি থেকে কোনো কিছুই আড়াল হতে পারে নি। পণপ্রথা বা বিধবা বিবাহ থেকে শুরু করে গুরুভক্তি বা নৈতিক শিষ্টাচার পর্যন্ত তাঁদের তীক্ষ্ণ মনে ধরা পড়েছে। যদিও তাঁদের গানগুলো সম্পূর্ণ কবিত্ববিবর্জিত[২২]। তবুও তাদের নেপথ্যে যে সমাজচেতনার প্রতিফলন ঘটেছে, তা সত্যি বিশেষ মূল্যবহ। তাই সামাজিক পরিবেশে রচিত গম্ভীরা গানগুলোকে কয়েকটি প্রশাখায় আলোচনা করা যেতে পারে :

(ক) কুপ্রথাগত,
(খ) অবক্ষয়জনিত,
(গ) শিক্ষাগত

(ক) কুপ্রথাগত

ব্রিটিশ শাসনের পর থেকে আধুনিক যুগের সূত্রপাত এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০) ও 'হিন্দু কলেজ' (১৮১৭) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এ দেশে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারণ ঘটলে জনমানসে নাগরিক চেতনার উন্মেষ হয়। আধুনিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্যই মানবপ্রেম বা মানবতাবাদ এবং এই মানবতার মধ্য দিয়েই মধ্যযুগীয়তার অবসান। মধ্যযুগ ছিল সাধারণত কুসংস্কার, কুপ্রথা আর কুশিক্ষার বেড়াজালে আবদ্ধ। আধুনিকযুগচেতনায় নতুন শিক্ষাদীক্ষার ফলে নগর জীবনে নবজাগরণের সূচনা ঘটে এবং সমস্ত কুপ্রথার মূলে কুঠারঘাত শুরু হয়।[২৩] পল্লীর মানুষ তা থেকে তখনো অনেক দূরে থাকলেও পল্লী কবিদের সূক্ষ্ম অনুভূতির খুব পিছিয়ে থাকে নি। নবজাগরণের সাথে সাথে যেমন 'সতীদাহ প্রথা নিবারণ' ও 'বিধবা বিবাহ' প্রচলন সম্পর্কিত আইন তৈরি হয়, তেমনি পণপ্রথার প্রতিও গণমানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে ওঠে। গম্ভীরা গানেও তার প্রতিফলন ঘটে। পণ প্রথার দুষ্ট ক্ষত দেখে পিতা ও পুত্রীর সংলাপের মাধ্যমে শিল্পী–আত্মা ঘৃণায় যন্ত্রণায় অস্থির–

পিতা– মা তোর বিহার লাগ্যা পড়্যাছি দায়ে
অমন শিক্ষাতে ধিক অন্ধ অধিক বেচে যেন শালিক টিয়ে।
কন্যা– সোনার চেন, সোনার ঘড়ি গর্ব যাদের গলায় পরি
অমন পশু কিনো না বাবা দিয়ে টাকা কড়ি
বিহা কি পদার্থ, অপদার্থ বুঝে না ছেলে পেয়ে।
পিতা– ভণ্ড দেশের হিতৈষী, ওরাই রক্ত চোষে

বি. এ, এল. এ. হলে ছেলে অর্থপিয়াসী
ধিক্ উচ্চ শিক্ষা, বিদেশী দীক্ষা, প্রীতি কেবল টাকার মোহে।

কন্যা– বেচবে কেন ভিটা মাটি, বেচবে কেন ঘটি বাটি
মজবে কেন আমার তরে ভিটায় পুকুর কাটি
ভাল কুলীন কুল-ই, কশাইগুলি, ফিরছে ছুরি শানাইয়ে।

পিতা– কোনো জনে কল্লে কিবা পাপ বাংলায় হতে হয় মেয়ের বাপ
বুঝতে নারি ত্রিপুরারি একি মনস্তাপ
যত ঘোষ আর বোস ধরছে ইসু চাটুজ্জে, মুখুজ্জে পশুর হিয়ে।[২৪]

উক্ত গানে পণ প্রথার সাথে জঘন্য কৌলীন্য প্রথার মিলনে যে শোষণ সমাজ ব্যবস্থা বর্তমান, তার চিত্র পিতাপুত্রীর সংলাপে কেমন সজল কারুণ্য রসে অভিষিক্ত হয়েছে। অন্য একটা গানে পণপ্রথার সাথে বর্ণবৈষম্যবাদ থেকে মুক্তির কামনা করা হয়েছে–

(তুমি) কেন উদাসী, কাশীবাসী, ওহে কাশীশ্বর।
দুনিয়াটা যায় রসাতল, রক্ষা কর হর।
... ...
(দেখো) কনের বাপের ঘাড়ে ঝুলি
বরের বাপের লম্বা বুলি।
পণপ্রথাটা উঠিয়ে দিয়া সমাজ রক্ষা কর।
ডোম-মেথর আর হাড়ি-মুচি
তারাই বন্ধু তারাই শুচি
মঠ-মন্দিরের দুয়ার খুল্যা সবার সমান কর।[২৫]

এক সময় এই কৌলীন্য প্রথা থেকেই বাংলাদেশে 'অধিবেদন প্রথা'র সৃষ্টি হয়। ফলে অল্পবয়স্ক মেয়েদের বিয়ে হলে অনেকেই অল্প বয়সেই বিধবা হতো। কিন্তু তাদের পুনরায় বিবাহ প্রথা ছিল নিষিদ্ধ। ফলে তারা সমাজে নিগ্রহের পাত্রীতে পরিণত হতো। এই কিশোরী বা যুবতী বিধবাদের করুণ দুঃখ-দুর্দশা দেখে মানবতাবাদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) নিজের সবর্স্ব নিঃস্ব করে দিয়ে গ্র্যান্ড সাহেবের সহায়তায় ১৮৫৬ সালে 'বিধবা বিবাহ আইন' পাশ করেন। কিন্তু তাঁর এই প্রয়াসকে আধুনিক শিক্ষিত সমাজও নির্বিবাদে গ্রহণ করে নিতে পারে নি। সমকালে বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়, এমন কি পাশ্চাত্য শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বিরোধিতা করেন। অথচ পল্লীর অশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত গম্ভীরা কবিদের কাছে সাদরেই তা গৃহীত হয়েছিল।

স্ত্রী মরিলে সুখের তরে পুরুষ কেন বিহ্যা করে
রাঢ়ি হয়্যা থাকবে সহ্যা নারী কার তরে,
এ কোনো দেশী ধর্ম দেখ ভাবিয়ে রে॥[২৬]

বাল্যবিবাহের যন্ত্রণা বা কুফল সম্পর্কেও গম্ভীরা কবি সচেতন। তাই একজন বাল্য বিবাহিতা কিশোরী রমণীর জীবন-যন্ত্রণাও গম্ভীরা গানে ধ্বনিত–

বয়স হামার ছয় কম কুড়ি
এ বয়সে সবাই ছুড়ি

খেলে সবাই লইয়া পুতুল গুড়িয়া
হামার জান গেল পুড়িয়া
বুবুটে-বিহা না হইলৈ ব্যাড়াতাম দৈইড়্যা।[২৭]

(খ) সামাজিক অবক্ষয়জনিত

ইংরেজদের আগমনের ফলে এ দেশে নতুন চিন্তাচেতনার যেমন প্রসার ঘটে, অন্যদিকে তেমনি মানব-মনে তথা সমাজে–জীবনে তার প্রতিক্রিয়াও কম হয় নি। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের (১৮৩৬) ফলে সমাজ-মনে পাশ্চাত্য চেতনার উদয় হয় এবং সেইসাথে ইংরেজ সাহেবদের অনুকরণে নকল সাহেব সাজার প্রবণতাও বেড়ে ওঠে। তাই ঊনিশ শতকের প্রথম পাদে হুজুগে বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদের গৃহে এক নতুন 'বাবু' সম্প্রদায়ের জন্ম হয় এবং সমাজ-জীবনে তারা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। তাদের স্বরূপ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন–"মুখে, ভূপার্শ্বে ও নেত্রকালে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরী চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগলস সমন্বিত চীনের বাড়ির জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণা প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাফ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাতে বারঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীত বাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত এবং গড়দেহের মেলা ও মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।"২৭

তাদের এই জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৭৮–১৮৪৮) 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫), 'নব বিবি বিলাস' (১৮৩০), 'প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪–৮৩) 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), দীনবন্ধু মিত্রের (১৮২৯–৭৩) 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) প্রভৃতি নক্সা জাতীয় অনেক গ্রন্থ রচিত হয় এবং সেখানে সামাজিক অবক্ষয়ে যুবক-যুবতীদের অনাচারের চিত্রটি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। গম্ভীরা লোককবিরাও তা থেকে পিছিয়ে থাকেন নি। তাঁরাও সেই সামাজিক অবক্ষয়কে নানাভাবে গ্রামীণ পরিবেশে অশিক্ষিত অল্প শিক্ষিত মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। ছেলের বাবা ও মেয়ের বাবার সংলাপের মধ্যদিয়ে শেখ সোলেমানের একটা গানে তার পরিচয় মেলে–

(ছেলের বাবা)
আগে সামলা নিজের বাড়ি
দিস পরেরি দোষ, হয়ে বেহোঁস
মেয়ে রেকে ধাড়ী॥
১। মেয়েরি গুণ, কানা বেগুন
জেনেও তার মাতা।

ঘরে বসে আটা পিসে
হয়ে ঢেঁকি যাঁতা
কেউ বলতে গেলে ভাজা তেলে
তারি ভাঙ্গে হাঁড়ি॥

২। সোনার চুড়ি, হাতে ঘড়ি
চশমা এঁটে।
খোপারি চুল, জড়িয়ে ফুল
বাঁধে ঢেউ কেটে।
ও ঘুরে মতলব করে, ফ্যাসান ধরে
ও পরে মার্কা মারা শাড়ী।

৩। টকি দেখে নাচ গান শিখে
আরও কত কি
প্রাণ ঢেলে কাঁদে ফেলে
খায় মাখন ঘি
বেড়ায় নৌকায় চড়ে, গুণ ধরে
সমুদ্রে দেয় পাড়ি॥

(মেয়ের বাবা)
যাই তোর কথার বলিহারি
সাফাই ঝেড়ে মাথা নেড়ে
দেখাও দোষ আমারি॥

১। ছেলেরা আজ পেয়ে স্বরাজ
সেজে ধর্মা ষাঁড়।
সাধু বেশে ঘরে এসে
খুঁজে মধুর ভাড়।
খেলে তাসপাশা, লয়ে আশা
করে আড্ডা জারি॥

২। মাসি পিসি যে যার খুশি
সম্বন্ধ পেতে
আসে যায়, শুষে খায়
রঙ্গেতে মেতে।
চলে উজান ভাটা, ভুলে ঘাটা
সেজে ব্রহ্মচারী॥

৩। লেখাপড়া, বিয়ে করা
শিকাতে ভুলে
উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, চাঁদের ফাঁকে
ফুটন্ত ফুলে

ঘুরে বিলাসিতায়, চরম মাত্রায়
হয়ে বেরোজগারী॥[২৯]

অথবা ফ্যাশনপ্রিয় বোখাটেদের লেফাফা দুরস্ত দেখা এবং সিনেমার যৌন আবেদনে সমাজে যে দুষ্ট কীট প্রবেশ করে সে কথাও দুটো পত্রিকার সম্পাদক-সম্পাদিকার উক্তি প্রত্যুক্তিতে বিধৃত–

সম্পাদক– তোমাদের জোগাতে ফ্যাসন, পুরুষ হালাকান
পয়সা কোথায় পায়?
রকমারি ব্লাউজ শাড়ী কত কিনতে পারা যায়?

সম্পাদিকা– মোদের ফ্যাসান কি বা আর
নিজের দিকে তাকাও একবার
যার ঘরে চড়ে না হাঁড়ি, তার সুটের কি বাহার।
বাবুয়ানি তার শোভে কি যার ঘরে শুয়্যা চাঁদ দেখা যায়।

সম্পাদক– লিপিস্টিকে ঠোঁট কর্যাছ রাঙা
দুই চোখে দিয়্যাছ সুরমা
সিন্যা চ্যাড়া, বেড়াও ঘুর্যা কি হাঁটার ভঙ্গিমা,
আহা কি হাঁটার ভঙ্গিমা।
বন্ধুর সাথে বেড়াও পথে অপ্‌সরী কিন্নরী প্রায়।

সম্পাদিকা– মুখে সিগারেট চারমিনার
চোখে চশমা জিরো পাওয়ার
ইংরেজি বাংলা লেকচারে গ্রাজুয়েট মানে হার।
নাম সইতে কলম ভাঙ্গে, পকেটে রঙ-বেরঙ
পেন থাকা চায়।

সম্পাদক– ফ্যাসানের সীমা সংখ্যা নাই
সিনেমার সাথে ফ্যাসানও বদলায়
ব্লাউজ, শাড়ি, ইয়ারিং, চুড়ি, জুতাও বদলে যায়
সাজে কোজে ডান্সের পোছে সুচিত্রাসেন হতে চায়।

উভয়– সিনেমার যৌন আবেদন
সমাজে ঘটায় অঘটন
ছেলে মেয়েদের চরিত্রের তাই দেখি অধঃপতন
এ প্রলোভন না হলে দমন
(দেশের) ভবিষ্যৎ কি হবে হায়।[৩০]

সভ্যতার ক্রমবিকাশে নগরজীবনে যেমন স্বাতন্ত্র্যবোধ, ছলচাতুরি, প্রতারণা ইত্যাদির প্রবৃদ্ধি ঘটে, তেমনি কমতে থাকে গ্রামীণ জীবনের সারল্য। তখন সবাই নিজের স্বার্থ বৃদ্ধিতে সচেষ্ট। ফলে সমাজে একে অপরকে ধোকা দেয়া, ঠকানো, ভালো নিয়ে খারাপ দেয়া ইত্যাদির প্রবণতা নিত্য বাড়তে থাকে। হাট বাজারে তাই শুধু প্রতারণা, আসলের নামে নকলের ছড়াছড়ি। গম্ভীরা গানে এ চিত্রও প্রতিফলিত–

হে নানা, কি আজব কাণ্ড দেখি
নকলের খেলা সারাদেশে।
তেলে নকল, ঘিয়ে নকল
মানুষ নকল হলো শেষে॥
হাট বাজারে চলতে ফেরতে দেখি চারি পাশে
আসল খুঁজে যায় না পাওয়া
খাটি জিনিস যায় না চাওয়া
দোকানিরা মুখ ফিরিয়ে হাসে।
সকল ভেজাল জিনিসপত্রই খাঁটি হলো অবশেষে॥৩১

তার পরেও জিনিসপত্রের মূল্য এত চড়া যে বাজারে গিয়ে মাথা ঘুরে ওঠে। যেন নূন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা।

হাট বাজারে যাইয়া দেখি জিনিস পত্রের হাল
ব্যাগ ভর্তি টাকা লিয়া পকেট ভর্তি মাল
নানা এ কি হলো জঞ্জাল?
জিনিসের দাম দেখ্যা নানা ঘুর্যা উঠে মাথা॥৩২

অথবা চোরাকারবারির পরিণতি সম্পর্কেও সচেষ্ট–

চোরাকারবারি রে ভাই
ধ্বংস করল সব যে হায়।
দ্যাশের জিনিস ঢুয়্যা ঢুয়্যা
দিয়্যা আইলো ওপার গিয়্যা
এ কথা কারে বা শোনায়?
এ্যামন সোনার দেশটারে তাই বানাইলো কিসের কারখানা?
(তাই) আইস সবাই দ্যাশের ছেলে
দ্যাশকে গড়ি সবাই মিলে
দ্যাশের জিনিস পার করব না
নিজে হয়ে খাঁটি সোনা
দ্যাশের দরদ পয়দা করি দিলে।
দ্যাশের তরে জীবন-মরণ
হোক না মোদের শপথ খানা॥৩৩

সামাজিক অবক্ষয়ের প্রধান ও জটিলতম সমস্যা হচ্ছে মাদকাসক্তি। দেশের উদীয়মান তরুণ সম্প্রদায় সে বিষাক্ত আবহে জড়িয়ে পড়েছে, অথচ তারাই দেশের ভবিষ্যৎ। এই নেশার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও গম্ভীরা-শিল্পী উদ্বিগ্ন।

হে নানা শুন্যাছিস হায় রে
সর্বনাশ হয়্যাছে ষোল আনা।
কাণ্ড কীর্তি দেখ্যা শুন্যা
বিগড়া গেছে মেজাজ খানা॥

১। বাংলাদেশের কিশোর যুবক যত আছে নানা,
বেশির ভাগই গিলছে মদ, ধরছে তাড়ি খানা
না দ্যাখতো কাণ্ডখানা।
মদ ছাড়াও আছে নানা হেরোইন মারিজুয়ানা॥

২। প্রায় বিশ লাখ বাংলাদেশী হয়েছে আসক্ত
ফেনসিডিল ও প্যাথেডিনের কত শত ভক্ত
নানা আরো আছে নাম শক্ত
এদের ভবিষ্যৎ মরণ ছাড়া গতি নাই হামার জানা॥

৩। চেষ্টা তদ্বির চলছে নানা সরকারি মহলে
ক্যামন কর‍্যা ছাড়ানো যায় এ সব কি কৌশলে
নানা এভাবে দ্যাশ কি চলে?
ভাইসব তোমরা হচ্ছো দ্যাশের মা-বাপ,
তোমরাই ভবিষ্যৎ কি না॥[৩৪]

অথবা,
মালদার আকবারির (আবগারি) দোকানে
পয়সা লোকে নাহি চিনে।
নিজের পয়সা দিয়ে অকারণ
মিছে পাগল সাজে
চল দেশের কাজে, মর কেন লাজে।
দেশের লাগিয়া, নিয়্যা যাও বাঁধিয়া
মোদেরকে কোন খানে?
হয়ে তারা আত্মহারা, নেশায় মজে থাকে।[৩৫]

এই সব কারণেই সামাজিক জীবনে যেমন দেখা দিয়েছে বেকারত্ব, তেমনি দেখা দিয়েছে সমাজিক অস্থিতিশীলতা। কেননা, সমাজ-শৃঙ্খলার যে নীতিজ্ঞান তা আজ সমাজ থেকে তিরোহিত—

১। মনে পড়েল বাল্যকালে রোজই উঠ্যাছি সকালে—
নাস্তাপানি টেবিলে খায়্যা দায়্যা
পড়ারও যায়্যা
পড়া শুনা করাছি সকালে
কোথায় সে পরিবেশ গেল, নাইকো কিছুরই ঠিক-ঠিকানা।

২। বয়ঃজ্যেষ্ঠদের কাছে শেখার অনেক কিছু আছে
বড়রা পাইতো যে ভক্তি
অমান্যের ছিল না শক্তি
গুরুজনে আশিসও দিয়্যাছে।
ভক্তি শ্রদ্ধা কোথা গ্যালো, কি হলো কারো যে নাই জানা॥

৩। জেগে ওঠো নীতিজ্ঞানে বড় হবে গুণে মানে

চলতে হবে সত্য পথে
চলিও না অন্য মতে
সমাজ, চায়্যা আছে তোমাদের পানে
অন্যায়কে প্রশ্রয় না দিলে পূর্ণ হবে সবার কামনা॥[৩৬]

অথবা বেকারত্ব সম্পর্কেও বলা হয়েছে–

বি. এ. এম. এ. পাস করে কত বঙ্গ সন্তান
চাকুরি খুঁজে খুঁজে হয়ে গেল হয়রান।
করিতে পারে না তারা নিজের পেটের সংস্থান
(হল) হতাশে সদাই ম্রিয়মান॥[৩৭]
আর এ বেকারত্বের কারণেই
দলে দলে দেখি দা-কুমড়া সম্বন্ধ,
সর্বত্রই লেগে আছে দ্বন্দ্ব।[৩৮]

এই রূপ সামাজিক অবক্ষয়জনিত নানা ক্ষেত্রেই গম্ভীরা কবি সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন।

(গ) শিক্ষাগত

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার মধ্য দিয়েই যে কোনো জাতি বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার হার উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় এ কারণেই অনেক বেশি। সচেতন নাগরিক মাত্রেই এ কথা অবহিত। কিন্তু গ্রামের অশিক্ষিত অল্পশিক্ষিত মানুষ এ সম্পর্কে কতটুকু সচেতন? গম্ভীরা কবি গানের মধ্য দিয়ে তাদের কাছে সে আবেদনটুকুও পৌঁছে দিতে কসুর করেন নি।

বাংলাদেশের মাঝে নানা ঘাটতি আছে শিক্ষার
তাই তো নানা বিদেশীরা দিচ্ছে মোদের ধিক্কার
নানা হে–
শুনবো না আর সেই লাঞ্ছনা, লেখা-পড়া আর ছাড়বো না,
শিখবো মোরা সকল জনা পণ করি মনে মনে॥[৩৯]

শুধু স্কুল-কলেজে পড়ে পাস করলেই জ্ঞানী বা শিক্ষিত হওয়া যায় না। জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে নানাবিধ জ্ঞানচর্চা করাই প্রকৃত শিক্ষা–প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত'[৪০] –এ বিশ্বাসে গ্রাম্য কবিও বিশ্বাসী–

১। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড জানে সর্বজনে
সবাই লিব শিক্ষা মোরা কু-শিক্ষা বর্জনে
সবে প্রতিজ্ঞা কর মনে প্রাণে।

২। পড়া-শুনা করবো সবাই নকল বাজী করবো না।
লেখাপড়া মানে কেবল বই পড়া নয়
খেলাধুলা শিল্প চর্চা বিদ্যার পরিচয়,
আছে সঙ্গীত, আবৃত্তি, অভিনয়।

এ সব নিয়েই আসল শিক্ষা-নইলে উন্নতি হবে না॥[৪১]

জ্ঞান মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ নির্দেশ করে। এ কারণেই জ্ঞান বা বিদ্যাকে আলোকবর্তিকা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রেও এমন বিষাক্ত বীজ ঢুকে পড়েছে যে, শিক্ষা ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি না বাড়িয়ে মূর্খতাকেই বাড়িয়ে তুলেছে বেশি। শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও দিনের পর দিন সন্ত্রাস আর হানাহানিতে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে, তাই এ ক্ষেত্রেও গম্ভীরা শিল্পী উদ্বিগ্ন–

হে নানা শুনব্যাতো আইসোজি
দ্যাশের ক্যামন লেখা পড়া।
পড়্যা শুন্যা মানুষ হো'তে
পারে না হাঁরঘে ছোঁড়া॥

১। ক্যামনে পড়বে হাঁরঘে গোভ্যা
তোমরা সবাই বল,
বন্ধ থাকে এগারো মাস
খুলা থাকে এক মাস
এ দিক ও দিক শুধু চল।
কার কথা কেবা শুনে
না শুনিলে দেয় তাড়া॥

২। পড়তে গিয়্যা, পালিয়্যা আসে
লয়তো ছাত্রের দোষ,
আজকের পরীক্ষা পরশু হবে
ক্যামন কর‍্যা ছাত্র রবে
পড়ার থাকে না যে পরিবেশ।
দেখ্যা শুন্যা গোভ্যা কহে–খাব না আর হুড়া॥

৩। আমরা সবাই এক হয়্যা
দাবি করি চলো
(শুধু) অন্নের সঙ্গে বস্ত্র নয়
ঠিকমত পড়তে চাই
এক হয়্যা মুখ খোল।
এক সঙ্গে দাবি করলে কাটবে হাঁরঘে ফাঁড়া॥ [৪২]

পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক গম্ভীরা

পূর্বে এ কথাও বলা হয়েছে যে, গম্ভীরা গান সমকালীন যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়। তার কবিরা দূরাগত জীবনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভাবার অবকাশ পান না। তা সত্ত্বেও কিছু গান কোনো বিশেষ কালের হয়েও কালোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। আধুনিক গম্ভীরা গানেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। পরিবার

পরিকল্পনা, শিশু স্বাস্থ্য, টিকা সপ্তাহ প্রভৃতি সমকালীন নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও তাই গম্ভীরা গানের শিল্পীরা সচেতন হয়ে উঠেছেন। রেডিও বাংলাদেশ রাজশাহী কেন্দ্র থেকে প্রায়ই তা পরিবেশিত হয়ে থাকে।

আজকের দুর্মূল্যের ও কঠিন বাস্তবতার বাজারে বড় সংসার হলে সমাজজীবনে যে হয়রানি বা দুদর্শার স্বীকার হতে হয়, দুঃখ-দৈন্যে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে সে কথা জানিয়ে কবি গণমানসকে সচেতন করে তুলেছেন–

হে নানা কি জ্বালায় পড়্যাছি হে
বড় সংসারের কারণে।
জ্বল্যা পুড়্যা মরছি ভাইরে
শান্তি পাছি না আর মনে॥

১। কাজের শেষে আসলে ঘরে
খালি অভাব চোখে পড়ে
খাওয়া দাওয়া লেখা পড়া
জামা কাপড় বাজার করা
পাইন্যাখো ভাই ওষুধ পড়লে জ্বরে।

২। মানুষ নামে হ'নু বটে
যদি থাকতো বুদ্ধি ঘটে
হ'তো না ভুল এতখানি
দু'চোখে ঝরতো না পানি
দু'টি সন্তান থাকতো যদি মোটে।
তোমরা কেহ করিও না ভুল, হামার মতো কোনো ক্ষণে॥

৩। দু'টা থাকলে ছেলে মেয়ে
সুখের কাঠি যাবে পেয়ে
লেখাপড়ায় বড় হবে
সুনাম অর্জন করবে ভবে
সুখী সংসার গড়বে সবার চেয়ে।
যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, সুখ শান্তি আসবে ঘরের কোণে।

নানা আজ বার্ধক্যের কোঠায় দাঁড়িয়ে অতীতের ভুলের কথা স্মরণ করছেন। তখন তাঁর বুদ্ধি ছিল না, ভালো মন্দ কিসে হয় সে কথাও তাঁর জানা ছিল না। প্রবৃত্তির বশে একাধিক বিয়ে করেন এবং কোনো সতর্কতা বা বিশেষ কোনো পদ্ধতি গ্রহণ না করায় আজ অধিক সন্তান সংসারে থাকায় নিত্য খুটাখুটি লেগেই আছে–যাতে ঘরে বাইরে কোথাও শান্তি নেই। তাই এতদিনে তাঁর বোধোদয় হলে তিনি অন্যান্যদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন–

ও তুই শুনবে কালু এখন কান খাড় ক'র্যা
হামি যাব বুঝি আজ ম'র্যা
হে নানা, হামি কি যে করি সংসার লইয়া

পথ পাই না ভাই ঢুঁড়্যা॥

১। সংসারেরই দুঃখের কথা কি বলবো আর তোকে
সারা রা'ত ভাবনা চিন্তায় ঘুম আসে না চোখে–নানা হে...
একেতো সংসারের জ্বালা গোলমাল করে ছা'ল্যা–পিল্যা
শু'ন্যা কানে লাগে তালা মাথা যা'ছে ঘৃ'র্য্যা॥

২। চৌদ্দগোন্ডা ছাল্যার জ্বালা সহে না আর পরাণে
দিনে দিনে শরীর হামার শুখা'ল খাদ্যের টানে-নানা হে...
আর এদিকে তোর দুই নানি, হামায় নিয়ে টানাটানি
সদায় করে প্যান প্যানানি, শাড়ি লিবে ডিসকো পা'ড়্যা॥

৩। এতগুলো ছা'ল্যা-পিল্যা হ'লো হামার সংসারে
কেমন ক'র্য্যা মানুষ করি কি খাওয়াবো তাদের -নানা হে...
খাওয়া পরা শিক্ষা নানা, ঠিকমতো দিতে পারনু না
চোখ থাকতে হলো কানা সারা জনম ধ'র্য্যা॥

৪। শক্কে প'ড়্যা রঙ্গে-চড়'্যা কোরনু দু'টা বিহ্যা
সকাল-সন্ধ্যা তোর দুই নানি করতে থাকে কাজিয়া –নানা হে...
বছর বছর হ'য়্যা ছাল্যা, দিল হামায় কষ্টে ফেল্যা
অন্তর হামার গেল জ্বল্যা, কলজ্যা গেল পুড়্যা॥

৫। তোর বড় নানি যেমন তেমন, ছোটকি অধিক কড়া
সকাল-সন্ধ্যায় কাজিয়া ক'র্য্যা জাগায় সারা পাড়া-নানা হে...
পাড়া-পড়শীর গালিজ-গালা, অন্তর পুড়্যা হলো কালা
সবাই হামায় বলে শালা, মারতে আসে তা'ড়্যা॥

৬। শুন হে নানা কথা শুনেক বলছি হামি তোকে
বোকার মত কাজ করাতে বকছে সকল লোক–নানা হে...
সময় থাকতে পরিকল্পনা, নিলে পারে এমন হতো না
না পাতিস আর এই যন্ত্রণা, থাকতিস সুখের সংসার গড়্যা॥

৭। তাই, সময় থাকতে হুঁশ কর ভাই বেহুঁশ কেহ হয়ো না
অধিক সন্তান জন্ম দিয়া মরার আগে মরো না –নানা হে...
জন্মনিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করো সুখের সংসার সবাই গড়ো
হো'বে তোমার মান যে বড় সারা জগৎ জুড়্যা॥

পূর্বে এ কথাও বলা হয়েছে, গম্ভীরা শিল্পীদের ভূমিকা সমাজ শিক্ষকের। নিরক্ষর জনমানসে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌছে দেয়াই তাঁদের কাজ। শিশুদের স্বাস্থ্য পরিচর্যায় গণস্বাস্থ্য বিভাগ বর্তমানে যে টিকাদান কর্মসূচি শুরু করেছে, গম্ভীরা শিল্পী গ্রামীণ নিরক্ষর সমাজে তার উপকারিতা সম্পর্কেও উপদেশের বাণী পৌছে দিয়েছেন।

হে নানা শিশু স্বাস্থ্য দিবস সবে করে পালন
শিশুর হতে দিও না অকালেই মরণ
হে নানা, টিকা দানে শিশুগণের ভালো স্বাস্থ্য কর গঠন।

১। ছয়টি রোগের হাত থেকে শিশুকে বাঁচানো যায়,
বলে সম্প্রসারিত কর্মসূচি ই. পি. আই। নানা হে...
সপ্তাহের দু'টা দিনে শিশু স্বাস্থ্য টিকা দানে,
গ্রহণ কর জনে জনে রেখেছে করে আয়োজন॥

২। ১ নম্বর ডিপথেরিয়া ২ নম্বর হুপিং কাশি,
৩ নম্বরে ধনুষ্টঙ্কার যেটা মোদের হয় বেশি।
কেহ ভুগে ডিপথেরিয়ায় কেহ কেশে প্রাণ হারায়
ধনুষ্টঙ্কারে শরীর টান ধরায় কেন্দে মরে সর্বক্ষণ॥

৩। ৪ নম্বরে পোলিও মাইলাইটস, ৫ নম্বরে যক্ষ্মা,
এই সব রোগ হোলে নানা, কেউ পাবে না রক্ষা।
পোলিও পা ধরে কষে যক্ষ্মা রোগীর রক্ত শোষে
হাম হয়ে তাদের সাথী মানব দেহে করে ধারণ॥[৪৩]

এভাবেই গম্ভীরা কবি সমাজের নানাবিধ প্রয়োজনে যুগোপযোগী গান পরিবেশন করে সমাজ শিক্ষকের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে।

রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে রচিত গম্ভীরা

আজকের সভ্য জগতে ব্যক্তি চেতনায় যেমন সবাই তৎপর, তেমনি তৎপর রাষ্ট্রিক চেতনায়ও। আর এ শুধু শিক্ষিত সমাজেই নয়, অশিক্ষিত, অজ্ঞ সমাজেও। নগরায়নের সাথে রাষ্ট্র ও সমাজ-মানসে যেমন সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থানপতনে নাগরিক সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটেছে, তেমনি সমাজের বা রাজনীতির উত্থানপতনের সাথে সাথে বাংলার লোকসংস্কৃতির জগতে লোককবিদের মনেও আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে বৈ কি! এবং ব্রিটিশ যুগে এ তৎপরতা যে বৃদ্ধি পায় তাতে সন্দেহ নেই। সেই সাথে এ কথাও স্বীকার করতে হয়, যে কোনো দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আন্দোলনে সচেতন করে তোলার জন্য তাদের ভূমিকাও কম নয়। এবং এ ক্ষেত্রে লোকসঙ্গীতের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। কেননা, লোকসঙ্গীত গোষ্ঠীচেতনাকে সবচেয়ে দ্রুত বিভাবিত করতে পারে।[৪৪] নিরক্ষর গণমানুষের মনে জাতীয় চেতনার উদ্বোধনের জন্য গম্ভীরা সঙ্গীতও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। কাজেই রাজনৈতিক ইতিহাসে গম্ভীরা গানের ঐতিহাসিক গুরুত্বও স্বীকার করতে হয়।

উপমহাদেশেব স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গম্ভীরা গান

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার চির গৌরবের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয় এবং বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি নবাব সিরাজউদ্দৌলা নিহত হন। এরপর দু'শো বছর ধরে এদেশে চলে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির একচ্ছত্র আধিপত্য। কিন্তু এ দেশের জনগণ কখনো বসে থাকে নি. থাকে নি নিষ্ক্রিয়ভাবে ব্রিটিশের পদানুগত হয়ে। পলাশীর পরাজয়ের পর থেকে এ দেশের স্বাধীনতার জন্য তারা বার বার বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন করেছে। এ দেশের সংগ্রামী জনতা একত্রিত হয়েছে, প্রতিবাদ

করেছে, বিক্ষোভ দেখিয়েছে, এমন কি সংঘবদ্ধ না হয়েই সিপাহী বিদ্রোহে (১৮৫৭) মেতে উঠেছে। গম্ভীরা গানে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাও ভাষা পেয়েছে–

বুঝি ফিরিঙ্গি দল এবার ভাইরে ধোর‍্যা নিলে খাঁটা,
সিপাহী সব মিল্যা অদরে করলে বলির পাঁঠা।
গরু আর শুয়ারের চর্বি দিয়্যা করলে যেরে টোটা।
হিন্দু আর মোসলেমের বুকে মার‍্যা দিল খুঁটা
জাতিধর্ম নেই এক ফোঁটা।
(পরে) দুই ভায়েতে শল্লা কোর‍্যা, তাদের নাড়্যাৎ মারছে সাঁটা।
বারাকপুর আর রাণীগঞ্জে গ্যাল আগুন লাগ্যা।
ফিরিঙ্গি সব তল্‌পী ছাড়্যা, গ্যালো কুন্‌ঠে ভাস্যা।
সিপাহীর দল থাকলো সব রাইগ্যা
গোটা ভারতে উঠল জাইগ্যা।[৪৫]

কিন্তু তখনো সে বিপ্লব ছিল বিচ্ছিন্ন। প্রকৃতপক্ষে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৫ সাল থেকে বঙ্গভঙ্গের মধ্যদিয়ে, শুরু হয় বাঙালির নব জাগরণ। এই সংগ্রামে বহু রাজনৈতিক নেতা অংশগ্রহণ করলেও বৃহত্তর বাঙালি জাতিকে যাঁরা অধিকতর অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছিলেন, তাঁরা হলেন অখ্যাত পাড়াগাঁয়ের চারণ কবি ও পল্লী গায়কেরাই। এদের রচিত ও গীত লোকসঙ্গীতগুলোই সেদিনের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বহুলাংশে ত্বরান্বিত করে এবং স্বাধীনতার সপক্ষে জনমত গড়ে তোলে। গম্ভীরা গানেও তার পরিচয় মেলে–

১। জাগ বাঙাল ছাড় বাঙালি উঠা কাচ্চি পাকি।
ওরে বঙ্গভঙ্গ এক হোয়ে যাক, রেখে ধর্ম সাক্ষী
নইলে বাঙালির স্থান নাই, ভারতে হলি ছন্নছাড়া॥

২। আত্মতত্ত্ব ভুলে মত্ত চাকর‍্যা বাবু সাজ্যা
বাঙালি বাঙালি ধোর‍্যা ঘুসে খাছিস ভাজ্যা,
যদি বাঁচবার মতো বাঁচতে চাসতো ধরেক ন্যায়ের খাঁড়া॥

৩। তোরাই একদিন ভাঁসিয়্যাছিলি সাত সাগরে ডিঙা,
রূপ সনাতন হাজির করলে তোদেরই এক হিঙ্গা
স্বর্ণবঙ্গে ধর্মপ্রচার কর‍্যাছিল কারা॥

৪। তোরাই ভারত ভাগ্যাকাশে দীপ্ত দিনমণি
স্বর্ণপ্রসু বঙ্গভূমে তোরাই স্বর্ণখনি,
তোরা বাপের ছেলে দাপে চলেক, আবার উঠ্যা দাঁড়া॥[৪৬]

সে সময় গ্রাম বাংলার অসচেতন সমাজে সচেতনতার প্রতীক হিসেবে দু'একজন সচেতন প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছিল। আধুনিক গম্ভীরা গানের স্রষ্টা সুফি মাস্টার তাঁদের অন্যতম। তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে তাঁর রচিত গানগুলোও বাংলাদেশের একটা অঞ্চলের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীকে জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল–

আর কতকাল, হে মহাকাল
থাকবা বসে যোগে।
গা তোল-উঠেছে সব জেগে
হিন্দু মুসলমান মেথর ডোম
খেলাফৎ (খিলাফত আন্দোলন) কমিটির চর্চা
উঠেছিল পাঞ্জাবে।
শুনতে পেয়ে ইউরোপবাসী
কামান গোলা এনে রাশি রাশি
তোপেতে লাগিয়ে দিয়ে আগুন
সকলকে করলে পোড়া বাগুন
ইংরেজ সরকার অকারণে
মারল প্রাণে
ঘেরে জালিয়ান বাগে
গা তোল উঠেছে সব জেগে॥[৪৭]

অথবা

তুমি ঘুসির (ঘুটে) আগুন, তুষের ধোঁয়া লাগিয়ে দিলে বঙ্গে।
আজ হাবুডুবু খায় ভারতবাসী, স্বরাজ তরঙ্গে
হালচাল করে বঙ্গের মাটি
বুঁদলা (রোপণ করলে) গোপাল ভোগের (এক প্রকার আম) আঁটি
তাতে ফল ফলিল তরমুজ ফুটি
আলু পটল ঝিঙে।
বঙ্গ মাতার সূত-সূতা দেশের মাঝে সাজলো নেতা
আজ পিঠে তাদের রুলের গুতা দিতেছে শ্বেতাঙ্গে॥[৪৮]

অথবা

স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচনা করেন–

দেশ ছাড়্যা পালাবি ইন্দুর
খায়্যা পিটন হুড়কা,
যখঁন মেয়েরা সব ঘরে ঘরে
ধরবে হাতে চরকা॥[৪৯]

অথবা

রূপার পরিবর্তে ব্রিটিশ সরকার কাগজের টাকার প্রবর্তন করলে–

সাহেব ধরিয়া লাঙ্গল কলার গাছ হে
নাচাইছ বেশ ভালুক নাচ হে
সোনার ভারতে দোকান আড়তে
চাদির বিনিময়ে দিচ্ছ কাচ হে।[৫০]

এসব গম্ভীরা গানের মধ্য দিয়ে সাধারণত ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী সম্পর্কে জনগণকে বিদ্বেষী করে তোলা হয়েছিল, যার প্রেক্ষিতে তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সচেতন সৈনিক হিসেবে গড়ে উঠতে পেরেছিল।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ধর্মভিত্তিক দু'টো পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে পড়লে প্রচুর হিন্দু মুসলমানের স্থানান্তর ঘটে। যারা স্থানান্তরিত হতে পারে নি তারা নিজের ঘরে বাস করেও পরবাসীর মতো নিজেকে মনে করতে লাগলো। তাদের এই চিত্র বিধৃত হয়েছে নিম্নোক্ত গানটিতে–

নিজের ঘরে হো'নু পরবাসী
থাকতে বাপের ভিটা মাটি
এ কুন দ্যাশ এ কি হ'লো
থাকতে ভারত মা।
হে নানা, ওহে ভোলা নানা॥
ছিনু দু'টা ভারত সন্তান
হিন্দু আর মোসলমান
মিল্যা-মিশ্যা ছিনু ভালো
এখন ক্যান হবে না॥
ভারত আর পাকিস্তান হলো
তাতে কি আর আ'ইলো গ্যালো
ধরম করম লিয়া ক্যানো
আপন ভিটা'য় থাকব না॥ ৫১

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও গম্ভীরা গান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শুধু শিক্ষিত জনগণই অংশগ্রহণ করে নি, গ্রাম বাংলার নিরক্ষর ও স্বল্প শিক্ষিত মানুষও অংশ নিয়েছিল। তারা তাদের সনাতনী পেশা ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল শিখেছিল। এরা পাকসেনাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে এনেছে। সেই সব স্মৃতি আজ বেদনার ভার বহন করে–

বাংলাদেশ মোদের মাতৃভূমি হাজার ত্যাগের ফল
কত লোকের রক্ত গেল
তার পরে স্বাধীন হলো
এ সব কথা বলতে গিয়্যা প্রাণে লাগে ব্যথা॥
হে নানা, বলব ক্যামনে হে
হাঁরঘে দুঃখের কথা॥[৫২]

স্বাধীনতা সংগ্রাম যে হঠাৎ করে হয়ে উঠে নি, এর পেছনে ৪৮ ও ৫২-র ভাষা আন্দোলনের বিরাট ভূমিকা রয়েছে, সে কথাও কবি জানেন–

১। ৪৮-এর ছাত্ররা করল ভাষার আন্দোলন
৫২-তে চরম হ'লো

২১-ভাষা এনে দিল
জান দিয়্যা কুরবান
তাই পায়্যাছি বাংলা ভাষা খুশিতে মন যায় ছুটে॥

২। একুশ শুধু দ্যায়নি ভাষা—স্বাধীনতার চেতনা,
একুশ মোদের বল্যা দিল
যুদ্ধ করার বুদ্ধি হ'লো
বাড়লো মোদের সাধনা।
পেলাম মোরা বাংলাদেশ সব সহ্যা বুকে পিঠে॥
হে নানা বলব ক্যামনে হে
বলতে যে বুক ফাটে।
শহীদ হলো বরকত সালাম
কত জেলে মুটে॥[৫৩]

মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে দীর্ঘ নয় মাসের পর পাকিস্তানী বাহিনী পরাক্রান্ত হলে স্বাধীনতা যুদ্ধের অবসান ঘটে। কিন্তু যুদ্ধের সেই ভয়াবহ স্মৃতি লোক কবির মনে আজও সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

রক্ত দিয়্যা গড়া মোদের সোনার বাংলাদেশ
এদেশ তোমার আমার সম অধিকার
শেখ মুজিবের হয় আদেশ।
বুকের ব্যথা আর মুখের কথায় প্রকাশ করে যাই
নরপিশাচ ইয়াহিয়ার জুলুম ভুলতে পারি নাই।
নয় মাস ধরে সোনার বাংলায় জুলুম যে করিল
রাস্তাঘাট করলো নষ্ট—কত বাড়ি পোড়াইল।
ধরলো কত নারীরে ভাই মানুষ মারলো কতো
রক্ত নদী সোনার বাংলায় বহিল অবিরত।
*   *   *   *
এই ভাবেতে ত্রিশ লক্ষ লোক গেছে যে ভাই মারা
এক কোটি হিন্দু-মুসলমান হয় বাস্তুহারা।
বাস্তুহারা হয়েরে ভাই ভারত চলে যায়
সেইখানেতে গিয়্যা তারা মুক্তি ট্রেনিং লয়।
মুক্তিফৌজে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করিল
ষোলই ডিসেম্বরে বাংলা শত্রুমুক্ত হইল॥[৫৪]

এভাবে ব্রিটিশ যুগ থেকে মুক্তিকামী মানুষকে গম্ভীরা গানের মধ্য দিয়ে জাতীয় চেতনায় গম্ভীরা কবিরা বিভাবিত করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী ও কথা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতীয় বিপর্যয় ও সমস্যার স্বরূপ ও সমাধানও গম্ভীরা গানে বিধৃত। স্বাধীনতা পেয়েও বর্তমানে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় দেশে বিশৃঙ্খলা চলছে—শান্তি বা নিরাপত্তা কোথাও নেই। তাই কবির আক্ষেপ—

১। স্বাধীন হয়ে এখন হামরা পেলাম কি বল তোমরা
চলা–ফেরায় নাইখো সুখ
প্যাটে থাকছে শুধুই ভুক
এখন হামরা দিশ্যাহারা।
আর কতকাল চলবে বল নাঙ্গা ভুখা থাকা॥

২। কৃষক শ্রমিক মানুষ হামরা এই না বাংলাদেশে
হামরা জাতির মেরুদণ্ড
খাইয়েয লাঙ্গল চষে
হামরা মরছি অবশেষে।
সার বিছন আর পানির লাগ্যা সবঠে খাছি গুতা।[৫৫]

অথবা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতবিরোধ সম্পর্কে–

১। গণতন্ত্রের আসল রূপটা, বেশ উঠেছে ফুটে।
মারামারি কাটাকাটি, নারীর ধরম লুটে হে।
ঘুষ, ঘেরাও, গুণ্ডাবাজী, হরতাল, ইলেকট্রিক, পুলিশ লাঠি
গ্যাস গুলি আর বোমা, এ সব রাম রাজত্বের গয়না।
দেশে ধ্বংসলীলা চলছে, খোলা পথে লাগছে ভয়।

২। ব্যস্ত সবাই গদির লাগি, কাজের বেলায় মান্দা
গেল উদোরপিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে, দোষী লাল ঝাণ্ডা হে।
গরু মেরে জুতো করে দান, গদিওয়ালারা এমনি শয়তান।
ওরা মুখে যেটা বলে, কাজে উল্টা ঠিক তার চলে
তাই আজ হিংসার আগুন, জ্বলছে দ্বিগুণ
ছড়িয়ে গেছে দেশময়॥[৫৬]

আমাদের বাংলাদেশের এই অস্বস্তিকর রাজনৈতিক পরিবেশের পেছনে মূল কারণ হচ্ছে পারস্পরিক অসহযোগিতা বা দোষাদোষী। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি হলে যে আমাদের দেশের উন্নতি হবে, তেমনি ফিরে আসবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত গম্ভীরা শিল্পীর মনেও সেই ধারণা বদ্ধমূল। তাই তাঁর অনুরোধ–

স্বাধীনতা সংগ্রামে বহু
প্রাণ হয়েছে বলি
আর যারা ছিল তারা
সকলে বাঙালি।
এখনো তাই এক বাঙালি
অপর ভাইকে দিচ্ছে গালি
গাল দিয়ে কি লাভ যে আছে
ক্যানো বুজতে পারছে না॥
(তাই) সকলে চাই দুষ্টের দমন

আর চাই ভাই শিষ্টের পালন
শান্তি আসুক দেশ জুড়্যা আজ
সবার মনের বাসনা॥[৫৭]

আর এ জন্য সবার স্বার্থ ত্যাগ করা প্রয়োজন। কারণ, সবার স্বার্থ ত্যাগের মধ্য দিয়েই দেশের সার্বিক সমস্যার সমাধান সম্ভব, অন্যথায় নয়। তাই–

একে অন্যের দোষ দিয়ে কি হবে আর বলো?
সবাই মিল্যা লাগ্যা পড়ি
নিজে নিজের কাজ করি
শান্তির রব সব তুলো।
দেশ বিদেশে ভাল বলবে উঁচু হবে মাথা॥[৫৮]

এভাবেই গম্ভীরা শিল্পী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবদান রেখেছে, রেখেছে নানাবিধ সমাধানের পথ নির্দেশ।

বিবিধ বিষয়ক গম্ভীরা

পূর্বে এ কথাও উল্লেখিত হয়েছে, গম্ভীরা শিল্পীরা সাধারণত পারিপার্শ্বিক নানা ঘটনা বা সমস্যাকে নানাভাবে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তাই তাঁদের গানে সামাজিক রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও সমকালীন নানাবিধ বিষয় যেমন, আঞ্চলিক সমস্যা, যোগযোগের দুরবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খেলাধুলা, বৃক্ষরোপণ, খালকাটা ইত্যাদির কথাও বিধৃত হয়েছে। তবে উল্লেখ্য সব ক্ষেত্রেই তা সমাজ শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছে। প্রশাসন বা প্রতিনিধিদের খামখেয়ালীর বিরুদ্ধে গণমানসকে সচেতন করে তোলাই তার কাজ। প্রসঙ্গক্রমে দু'একটা গান উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন– যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে–

হে নানা কি জ্বালাই পড়্যাছি হে
ভাবতে পারছি না কিছু মনে।
রাস্তায় চলতে বলা যায় না
বিপদ আসে কোন ক্ষণে॥

১। দ্যাশে চলেছে যানবাহন
গুণলে কত যে কাহন
কোচে ট্রাকে উঠছে লোকে
ছাদেও উঠছে দেখছি চোখে
ঠাসাঠাসি চলছে মানুষজনে।
ঘটছে দুর্ঘটনা, মানুষ মরছে অকালে, এই সব কারণে॥

২। ট্রেনে লঞ্চে উঠলে পারে
বিদায় চাহো সবার তরে
পারবো কি গন্তব্যে যাইতে
ঘরের ছেলে ঘরে আসতে

দুর্ঘটনা ঘটছে যে হারে।
ট্রাফিক আইন মানো সবাই, জীবন শেষ করো না অকারণে॥

৩। রাস্তা ঘাটের কথা আজ
বলতে লাগে বেজায় লাজ
দু'পাশ বোঝায় বাড়ি ঘরে
রাস্তায় গরু বকরী চরে
রোডের উপর ধান শুকানো কাজ।
এই সব বন্ধ হলে দুর্ঘটনা ঘটবে না জীবনে॥[৫৯]

গম্ভীরা যেহেতু নবাবগঞ্জের নিজস্ব সম্পদ, সেহেতু অনেক গানে আঞ্চলিক সমস্যাও নবাবগঞ্জের ঐতিহ্যের কথাও উক্ত হয়েছে–

১। নবাবগঞ্জ জেলা শহর কত যে সুনাম
কাঁসা, রেশম, লাক্ষা, চমচম কত রকম নাম,
নানা কত যে এসবের দাম।
কোথায় গেল কাঁসা-লাক্ষা, কোথায় হারালো নাইকো জানা॥

২। মহানন্দা নদীর ওপার শিবগঞ্জ থানা
ভোলাহাট, গোমস্তাপুর শুধু অবহেলা।
নানা আরো কত যে ঝামেলা।
এতকাল চল্যা গেল মহানন্দার ব্রিজ হলো না॥

৩। উত্তরবঙ্গের পুরাতন এই নবাবগঞ্জ শহরে
আন্তঃনগর ট্রেন আসে না লোকালের বহরে
নানা বলব কত যে তোমারে।
যোগাযোগের দিকে ক্যান নানা নজর দ্যায় না॥

৪। হাসপাতাল আছে কিন্তু তেমন ওষুধ নাই
টেলিভিশন, রেডিওতে শুনা কিছু দায়,
নানা আর কত বলা যায়?
বরেন্দ্র-প্রকল্পের গভীর নলকূপে পানি যে থাকে না॥
হে নানা বলবো ক্যামনে জি
হাঁরঘে অবস্থা খানা॥[৬০]

অবশ্য, স্বীকার করতে হয় এই আঞ্চলিক সমস্যার মধ্যেই সমগ্র দৈশিক সমস্যা জড়িয়ে আছে। আঞ্চলিক গানে রূপকের মাধ্যমে তা প্রকাশ পেয়েছে।

বনাঞ্চল দিনের পর দিন উজাড় হয়ে যাবার ফলে সারা বিশ্বে যে প্রাকৃতিক অবক্ষয় শুরু হয়েছে, আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা 'গ্রিন হাউস ইফেক্ট' এর সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন এবং বিশ্ব পরিবেশ ঠিক রাখার জন্য অনাবাদী জমিতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালনে শিক্ষিত মহল তৎপর, গ্রামের স্বল্প–শিক্ষিত কবিদের মাঝেও তার সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁরাও গ্রামের মানুষকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছেন–

হে নানা শুন্যা যাও যলদি হে
বৃক্ষরোপণের কথা।
বৃক্ষরোপণ না করলে
ঘুচবে না হাঁরঘে দরিদ্রতা।

১। সবুজ শ্যামল দৃশ্যে ভরা মোদের বাংলাদেশ
কত কবি গান লিখেছে নাইখো তাহার শেষ
নানা শুনলে বুঝবে সবিশেষ।
লকড়ির জন্য গাছ কাটছে হায়, সবাই যে যথাতথা॥

২। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা কহেন গাছ লাগালে পারে
বৃষ্টি-বাদল হইবে ভাইরে সারা বর্ষ ভরে,
নইলে মরুভূমি উঠবে গড়ে।
খরা যদি আসে নানা, ঘুর‍্যা যাবে সবার মাথা॥

৩। তাই বলি শুন সবাই মন-প্রাণ দিয়্যা
শপথ করো গাছ লাগাবো একটা কর‍্যা নিয়্যা,
প্রচুর ফসল উঠবে, ভরবে হিয়া।
অধিক খাদ্য ফলানো কাজের হবে তবে সার্থকতা॥[৬১]

গম্ভীরা গানের উদ্ভবকাল থেকেই তার বৈশিষ্ট্য ছিল জনমানসে নিত্যকার সমস্যা বা ঘটনাবলিকে প্রতিবিম্বিত করা এবং সেই ফঁকে কর্তৃপক্ষের বা সরকারের প্রতি পরোক্ষ সমালোচনা করা। কিন্তু খুব সম্প্রতি কোনো কোনো দল শাসক শ্রেণীর স্তুতিমূলক গম্ভীরা পরিবেশন করায় গম্ভীরা গান তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থেকে অনেকটা স্খলিত হয়ে পড়ছে। এ ব্যাপারে সচেতন ও শিক্ষিত পণ্ডিত সমাজ সচেষ্ট না হলে হয়ত আমাদের এই নবাবগঞ্জ জেলার নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরা একদিন অন্যান্য লোকসঙ্গীতের মতো কালের গতিচক্রে খেই হারিয়ে ফেলবে–তাতে বিচিত্র কি?

১. প্রদ্যোত ঘোষ, লোকসংস্কৃতি, গম্ভীরা, কলকাতা পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২, পৃ. ৭০
২. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসংস্কৃতি, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪, পৃ. ১২৬
৩. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস, কলিকাতা, লেখক সমবায় সমিতি, আদি পর্ব, সংক্ষেপিত সংস্করণ, ১৩৭৩, পৃ. ৩৯৯
৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩য় সংস্করণ, ১৩৬৪, পৃ. ১৩৬
৫. প্রদ্যোত ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ, ১৯৬২, পৃ. ৫
৭. এস. এম. আব্দুল লতিফ স্মরণিকা–রাজশাহী বৈশাখী মেলা, ১৩৯৪
৮. প্রদ্যোত ঘোষ, পূর্বোক্ত পৃ. ৭১

৯. তৃপ্তি ব্রহ্ম, লোক-জীবনে বাংলার লৌকিক ধর্ম সঙ্গীত ও ধর্মীয় মেলা, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৩৯২, পৃ. ২৪৭
১০. প্রদ্যোত ঘোষ, গম্ভীরা লোকসঙ্গীত ও উৎসব, একাল ও সেকাল, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৬৯, পৃ. ২৯-৩০
১১. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৫
১২. হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮২, পৃ. ৭১
১৩. শিব প্রসাদ ভট্টচার্য, ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা কলিকাতা, মর্ডাণ বুক এসেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৯, পৃ. ২২
১৪. হাবিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
১৫. আশুতোষ ভট্টচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
১৬. আশুতোষ ভট্টচার্য, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭, পৃ. ২৫৫
১৭. ঐ, পৃ. ২৫৫-২৫৬
১৮. প্রদ্যোত ঘোষ, প্রগুক্ত, পৃ. ৭৪
১৯. ঐ, পৃ. ৭৪
২০. ঐ, পৃ. ৭৪
২১. ঐ, পৃ. ৭৫
২২. আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২
২৩. ঐ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬১
২৪. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা, কলিকাতা, উচ্চারণ, ১ম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৯০, পৃ. ৩১
২৫. প্রদ্যোত ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
২৬. আশুতোষ ভট্টচার্য, প্রগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬২
২৭. প্রদ্যোত ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
২৮. আ. কা. শেখ নূর মোহাম্মদ, নবাবগঞ্জ পরিচিতি, রাজশাহী জেলা কাউন্সিল, ১৩৩৭, পৃ. ৮৯
২৯. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, কলিকাতা, নিউএজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৪, পৃ. ৫৬
৩০. প্রদ্যোত ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০২
৩১. ঐ, পৃ. ১১১-১১২
৩২. মাহবুবুল আলমের সংগ্রহ থেকে গৃহীত, গ্রন্থাগারিক, শাহ নেয়ামতুল্লাহ কলেজ, নবাবগঞ্জ
৩৩. তবেদ
৩৪. তবেদ
৩৫. তবেদ
৩৬. প্রদ্যোত ঘোষ, প্রাগুক্ত পৃ ৮৩
৩৭. মাহবুবুল আলম, তদেব
৩৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬
৩৯. ঐ, পৃ. ২৬৬
৪০. সর্দার আব্দুল লতিফের সংগ্রহ থেকে (গম্ভীরা গায়ক, ভোলাহাট)

৪১. প্রমথ চৌধুরী, প্রবন্ধ সংগ্রহ, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, অখণ্ড সংস্করণ, ১৯৬৮, পৃ. ১৩৪
৪২. মাহবুবুল আলম, প্রাগুক্ত
৪৩. তদেব
৪৪. তদেব
৪৫. হাবিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭
৪৬. প্রদ্যোত ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
৪৭. ঐ. পৃ. ১৮-১০৯
৪৮. ঐ. পৃ. ৭৯
৪৯. ঐ. পৃ. ৮০
৫০. নিজস্ব সংগ্রহ, নবাবগঞ্জ ১৯৯২
৫১. ঐ
৫২. ঐ, শিবগঞ্জ ঐ
৫৩. মাহবুবুল আলম, প্রাগুক্ত, ১৯৮৭
৫৪. তদেব

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের গম্ভীরা গান : একটি তুলনামূলক আলোচনা

ড. মাযহারুল ইসলাম তরু

'গম্ভীরা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও নওগাঁ জেলায় এবং পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত জনপ্রিয় লোকসংগীত। গম্ভীরার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই লোকসংগীত লোকসমাজ চৈতন্যের বার্তাবাহী। সুদীর্ঘকাল ধরে এসব অঞ্চলের লোকশিক্ষা ও লোকরঞ্জনের দায়-দায়িত্ব গম্ভীরা-শিল্পীরা যেভাবে পালন করে আসছেন তা তাঁদের অনন্য সাধারণ শিল্প-প্রীতিরই নিদর্শন।

'গম্ভীরা' গানের উৎপত্তি অবিভক্ত মালদহ জেলায়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে গম্ভীরা গানের বহু পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পী মালদহ ত্যাগ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহী জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জে এসে বসবাস করতে থাকেন। এঁদের তৎপরতায় পূর্ব পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় বিভিন্ন জেলায় গম্ভীরার ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে এবং অত্যন্ত অল্প সময়েই গম্ভীরা গানে শিবের অস্তিত্বে বিলুপ্তি ঘটিয়ে সেস্থান দখল করে নানা ও নাতি। পশ্চিমবঙ্গের গম্ভীরা শিব কেন্দ্রীক (যদিও রূপকার্থে) এবং সঙ্গীত ও অভিনয়ের সমৃদ্ধ সমসাময়িক বিষয় সম্পর্কিত অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের গম্ভীরা সঙ্গীত-নৃত্য ও কৌতুকাভিনয়ের মাধ্যমে শাসক শ্রেণীর তথা সমাজের দোষ-ত্রুটি, গ্লানি বা অসঙ্গতি তুলে ধরার মাধ্যম। আর তাই পাকিস্তান আমলে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী গম্ভীরা গানকে ভালো চোখে দেখেনি। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় গম্ভীরা নতুন জীবন লাভ করে।

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে 'গম্ভীরা' একই নামে পরিচিত হলেও পরিবেশনগত দিক দিয়ে দু'দেশের গম্ভীরা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা বাংলাদেশের ও পশ্চিমবঙ্গের গম্ভীরা গানের তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপনের চেষ্টা করবো তবে তার আগে গম্ভীরা গানের উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

'গম্ভীরা' শব্দটির অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হলেও আজ পর্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট ফোকলোর গবেষক ড. প্রদ্যোত ঘোষ তাঁর লোকসংগীত : গম্ভীরা" শীর্ষক গ্রন্থে শব্দটির উৎপত্তিগত যে অর্থ নির্ণয় করেছেন তা হচ্ছে–গম্ভীরা (গম্ভীরা মূল)

১. পুরীধামে কাশীমিশ্রের ভবনে চৈতন্যদেবের বাসস্থান নিভৃত গভীর প্রকোষ্ঠ, অলিন্দের পর দালান, তার ভেতরে ক্ষুদ্র গৃহ। "গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা লব" (চৈতন্য চরিতামৃত–৩১৩)
   গম্ভীরাতে গোসাঞি প্রভূকে শোয়াইল (চৈতন্য চরিতামৃত-৩৫০)

২. জগন্নাথ দেবের শয়ন মন্দির গম্ভীর। "গম্ভীরা কক্ষে অন্ধকার অতি গম্ভীরা কুহর জ্বলে প্রদীপ সন্ততি" (চৈতন্য চরিতামৃত-৩০৩)
৩. গ্রাম্য দেবতার স্থান (দিনাজপুর)
৪. শিবের মন্দির, গাজন ঘর, গাজন উৎসব।[১]

অবশ্য অন্ধকার প্রকোষ্ঠ বা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ সম্পর্কে অন্যান্য গবেষকও একমত। কারণ মধ্যযুগের অনেক কাব্যে এই অর্থ 'গম্ভীরা' শব্দটির অনেক প্রমাণ মেলে। তবে আমাদের আলোচ্য গম্ভীরা শব্দের সাথে গৃহ, মন্দির বা তাদের অন্তঃপ্রকোষ্ঠের কোনও সম্পর্ক নেই। গম্ভীরা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে কোন কোন গবেষক শিব মন্দির অর্থেই শব্দটি গ্রহণ করার পক্ষপাতি।[২] কারণ শিব বা মহাদেবের অপর নাম গম্ভীর। আর সংস্কৃত 'গম্ভীর' শব্দ থেকেই 'গম্ভীরা' শব্দটি এসেছে তা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। সুতরাং চলতি কথায় এই মহাদেবের বন্দনা গীতই গম্ভীরা।[৩] দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে গম্ভীরা এখন আর শিববন্দনা বা মহাদেবের সঙ্গে যুক্ত কোন লোকাচারকে বোঝানো হয় না। গম্ভীরা বলতে এখন একটা বিশেষ জনপ্রিয় লোকসংগীতকে বোঝায়। এই লোকসংগীতের উদ্দেশ্য শিব বন্দনা নয়, সমাজ সমালোচনা।[৪] আর তাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ সংগীত আজ সবার প্রিয়।

উৎপত্তি : প্রাচীনকালে 'গম্ভীরা' পূজা উৎসব হিসেবেই প্রচলিত ছিল এবং উদ্ভব প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে অনুমান করা হয়।[৫] এ পূজা সাধারণত শিব বা মহাদেবকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হতো যা 'শিবের গাজন' নামে পরিচিত ছিল। পশ্চিমবাংলার মালদহ জেলার কোথাও কোথাও এখনও তার অস্তিত্ব টিকে আছে।[৬] ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য গম্ভীরা গানের সঙ্গে গাজনের সম্পৃক্ততা স্বীকার করতে রাজী নন। তাঁর মতে, গম্ভীরা গানে দীর্ঘদিন ধরে মূর্তি উপস্থাপনা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। তবুও তাঁর মতে গম্ভীরা লোকসংগীত ছাড়া আর কিছুই নয়।[৭] আর এই লোকসংগীত উদ্ভবের পেছনে একটি বিশেষ জাতিগত এবং ভৌগোলিক পরিবেশগত প্রভাব রয়ে গেছে তা অস্বীকার করা যাবে না।

ভৌগোলিক দিক দিয়ে এই সঙ্গীতাঞ্চল উত্তরাঞ্চল বা বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। এই অঞ্চলের উত্তরাংশ প্রধান কোচ জাতি দ্বারা অধ্যুষিত। কোচ জাতি ভারতের অতি প্রাচীন আদিবাসী, রাঢ় অঞ্চলে যে আদিবাসী সমাজ ক্রমে ক্রমে হিন্দু ভাবাপন্ন হয়েছে, তার সাথে কোচ জাতির মৌলিক কোন সম্পর্ক নেই। রাঢ় দেশীয় আদিম অধিবাসী প্রধানত আদি অস্ত্রাল (Proto-Austroloid) গোষ্ঠী ভুক্ত, কিন্তু উত্তরবঙ্গের আদিম অধিবাসী ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীযুক্ত, ইন্দো-মঙ্গোলয়েড অন্যান্য জাতির মতো পীতবর্ণ নয়, বরং কৃষ্ণবর্ণ।[৮] যদিও এরই পাশাপাশি পালিয়াদের চেহারায় পরিষ্কার ইন্দো-মঙ্গোলয়েড ছাপ বিদ্যমান। এই ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে 'গম্ভীরা উৎসব' বা বাৎসরিক উপজাতীয় অধিবেশন (Tribal Council) উপলক্ষে সঙ্গীত ও নৃত্য প্রচলিত গানের উৎপত্তি বলে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন।[৯] গবেষকবৃন্দ গম্ভীরা সম্পর্কে যে মতামতই ব্যক্ত করুন না কেন সার্বিক দিক বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই যে, গম্ভীরা মূলত পূজা উৎসব হিসেবেই উদ্ভূত হয়েছে।

শ্রেণীবিন্যাস : মধ্যযুগে কৃষ্টি কালচারের প্রধান অবলম্বন ছিল বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর গুণকীর্তন। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীকে কল্পনা করে পূজা উৎসব হতো। মানুষ নিজেদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব অভিযোগ, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতি তাঁদের পাদপদ্মে নিবেদন করে প্রতিকারের আশায় বসে থাকতো। এইভাবে চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি লৌকিক দেবতা সম্পর্কে মানুষের মনে বিশ্বাস গড়ে ওঠে। ধর্ম ঠাকুরের পূজা শুরু হয় এই প্রেক্ষাপটেই।[১০]

শিব ও ধর্ম ঠাকুর অভিন্ন কল্পিত হওয়ায় কোন কোন অঞ্চলে 'আদ্য' নামেও পরিচিত। এ কারণে হরিদাস পালিত শিবের গাজনকে 'আদ্যের গম্ভীরা' বলে উল্লেখ করেছেন। তবে বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে তো নয়ই, এমকি বৃহত্তর মালদহ জেলায় কোথাও কোথাও আদ্যের গম্ভীরার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।[১১]

প্রাচীনকালে এসব কারণেই 'গম্ভীরা' দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যথা–

১. শিবের গাজন।

২. পালা গম্ভীরা বা গম্ভীরা গান।

আমাদের গম্ভীরা সাধারণত হিন্দু সমাজের প্রচলিত ও দেব-দেবীর বিষয় নিয়ে রচিত হতো। অন্যদিকে পালা গম্ভীরায় তৎকালীন সংঘটিত বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্থান পেত।[১২]

গম্ভীরা গানের বিবর্তন : গম্ভীরা গানের উৎস মূলত 'বর্ষ বিবরণী' বা বর্ষ পর্যালোচনা থেকেই। সারা বছর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সমস্যা, অভাব-অভিযোগ এতে স্থান পেত এবং মধ্যযুগীয় সনাতন বিশ্বাসে শিবকে সুখ-দুঃখের নির্বিকার প্রতীক রূপে কল্পনা করে তাঁর কাছে নিবেদন করা হতো। অর্থাৎ মানুষ যখনই কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছে, তখনই তার প্রতিকারার্থে সঙ্গীতের মাধ্যমে শিবের শরণ নিয়েছে। তাদের বিশ্বাস, এসব কিছুই শিবের ইচ্ছায়। শিবই সকল প্রকার সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের দূর্ভোগের একমাত্র কারণ।[১৩] এখানে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে–

শিব তোমার লীলা খেলা কর অবসান
বুঝি বাঁচে না আর জান।
অনাবৃষ্টি কর‍্যা সৃষ্টি
মাটি করল্যা নষ্ট হে
দৃষ্টি থাকতে কষ্টি কর‍্যা
দেখছ নাকি কষ্ট হে
মিষ্ট কথায় তুষ্ট কর‍্যা
শিষ্ট লোকের ইষ্ট মার‍্যা
করল্যা মোদের গুষ্টি ছাড়া।
শুনি বলি পষ্ট কর‍্যা
তারপরে ম্যালেরিয়ায়
হলাম হালাকান,

বুঝি বাঁচে না আর জান।
অন্নদা মা ভিক্ষা তোমার
করবে নাকি দানা হে,
সময়কালে না হয়্যা জল
অসময়ে ফলল কুফল।
(ও সব) মুশরী কালাই গ্যালো ডুব্যা
ক্ষেতের ফসল ম'ল
আম গ্যালো ছালা গ্যালো
ক্যামনে ধরি গান
বুঝি বাঁচে না আর জান।[১৪]

এই গানটিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট অভাবের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে শিবের উদ্দেশ্যে। কারণ সরল কৃষক মনে করে, শিব যেমন দরিদ্র ও নিঃসহায়, তেমনি তিনি সকল কৃষক সমাজেও দারিদ্রের কারণ। তিনি ইচ্ছা করলেই সমাজের দুঃসহ দুঃখ দারিদ্রের অবসান করতে পারেন–

প্যাটেতে ভাত নাই, ও শিব, গোলাতে[১৫] নাই ধান
কি দিয়্যা বাঁচাবো ও শিব ছেল্যা পিল্যার জান।
ও বুঢ়া শিব দয়া করো
পরণে তেনা নাই ও শিব বরজে[১৬] নাই পান।
কি দিয়্যা রাখিবো ও শিব মাইয়্যা[১৭] লোকের মান
ও বোকা শিব দয়া করো।[১৮]

নিষ্ক্রিয়তা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য কৃষক-কবির নিকট শিব কৃপার পাত্র হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেবতার সাথে মানুষের যে একটি সহজ সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় গম্ভীরা গানে তার ব্যত্যয় ঘটেনি।[১৯]

বিশ শতকের প্রারম্ভে গম্ভীরা গানে শিব মূর্তি তিরোহিত হয়। সে স্থান দখল করে মানবরূপী শিব। অর্থাৎ শিবের প্রতীকে একজন মানুষকে দাঁড় করিয়ে তাঁর কাছে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপস্থাপন করে ফরিয়াদ জানানো হতো। যেমন–

(তুমি) কেন উদাসী, কাশীবাসী, ওহে কাশীশ্বর।
দুনিয়াটা যায় রসাতল[২০] রক্ষা করো হর॥
কামার, কুমোর, ছুতার, চাষা
ছাড়লো তারা জাত ব্যবসা
চাকরি লয়ে বাবু হয়্যা ভাবছে কতো বড়।
গাঁয়ের মাটি শিল্প হলো মাটি
বাংলার মাটি আছে খাঁটি
কৃষি-শিল্প শিখাও মোদের
(তুমি) দেশকে তুলে ধর;
চাষ উন্নতি করতে হলে

চলবে না, আর পুরানা চালে
দেশ-বিদেশের নতুন নিয়ম
আমদানী সব করো।
রং তামাসা টুকীর গানে
দেবতা গলায় উলু বনে
শিখাও মোদের ভক্তি মন্ত্র
পূজা-গঙ্গাধর॥[২১]

শিব শতকের প্রারম্ভে রচিত গম্ভীরা থেকে শিবমূর্তি তিরোহিত হলেও তখন পর্যন্ত তাতে শিব পূজার প্রভাব বিদ্যমান থাকে। পরবর্তী সময়ে দুই বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার প্রেক্ষিতে সমাজ মানসে পরিবর্তন আসে। গম্ভীরা গানেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। মানুষ সচেতন হয়। তারা ব্রিটিশ সরকারের শোষণে অতিষ্ট হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। তাই তাদের গম্ভীরায় শিব আর মহাদেব না হয়ে, হয়ে ওঠেন ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি। তাঁর সামনে শিল্পীরা ব্রিটিশ সরকাবের সামগ্রিক দুর্নীতির কথা তুলে ধরতেন বলিষ্ঠতার সাথে। ফলে গম্ভীরা গান বর্ষ পর্যালোচনা বা বর্ষ বিবরণী উপস্থাপনার পরিবর্তে হয়ে ওঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অন্যতম মাধ্যম। ব্রিটিশ সরকারের মুখর একটি গানের কিছু অংশ হচ্ছে–

জমি-জমা চাষ করে যা ফসল উঠাই
তাহে মোদের কি স্বত্ব নাই?
তুমি ওজন করিয়া কাগজ ধরাইয়া
গাড়ি করো বোঝা।
ভারতের অর্জিত জিনিস তুমি কর চালান
আমরা ভারতের লোক খেটে মরি
বাঁচে কিনা জান
ধন্য তুমি বুদ্ধিমান।[২২]

শিবের এই প্রতীকী পরিবর্তনের পেছনে একটা চিত্তাকর্ষক ঘটনা রয়েছে। ড. প্রদ্যোৎ ঘোষ, তাঁর 'লোকসংস্কৃতি : গম্ভীরা' গ্রন্থে ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন। ১৯২০-২৩ খ্রিষ্টাব্দের কোনও সময় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মালদহ আসার কথা ছিল। স্থানীয় প্রখ্যাত গম্ভীরা লেখক ও গায়ক মোহাম্মদ সুফী মাষ্টার স্যার আশুতোষ অর্থাৎ শিবের সামনে গম্ভীরা গাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একজন পাত্রকে শিব সাজিয়ে আসরে হাজির করেন। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত স্যার আশুতোষ মালদহে না আসায় তাঁর এক প্রতিনিধি আসেন। তবুও সুফী মাষ্টার শিবকে উপস্থিত করে গান গেয়েছিলেন। গানটির অংশ বিশেষ–

হে দ্যাখ, হে দ্যাখ কারে ডাকতে
কেডা এলা ভাইরে–
ইনি কি স্যার আশুতোষ?
হাইকোর্টের জজ

গায়ে মাখা কেন ছাইরে?[২৩]

এই ঘটনার পর থেকে সব গম্ভীরায় শিব উপস্থিত হতে থাকেন, সর্বকালের হোতা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে। সুতরাং শিব চরিত্রকে সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের প্রতিভুরূপে গম্ভীরাগানে উপস্থিত করা এবং তাকে জনপ্রিয় করে তোলার মূলে সূফি মাষ্টারের অবদান অনস্বীকার্য।[২৪]

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর গম্ভীরা গানের পৃষ্ঠপোষক ও গায়েনরা মালদহ ত্যাগ করে এদেশে চলে আসেন। ফলে আদি উৎপত্তিস্থল মালদহে এ গানের চর্চা মারাত্মকভাবে কমে যায়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহী জেলার চাঁপইনবাবগঞ্জ মহকুমায় গম্ভীরার ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে। এতদঞ্চলে গম্ভীরা গানের প্রবর্তনকারীদের মধ্যে যারা অগ্রপথিকের কাজ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শেখ সফিউর রহমান বা সুফি মাষ্টার, মোহম্মদ সোলায়মান, মোহম্মদ মোহসীন আলী মোক্তার, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ ফজলুর রহমান, তৈয়ব আলী, লুৎফল হক, মনিমুল মাস্টার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বিভাগোত্তরকালে রাজশাহীর গম্ভীরা গানে শিবের অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে এবং সে স্থান দখল করে নানা ও নাতি। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে পূর্বের ধারাই অব্যাহত থাকে।

এবারে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত গম্ভীরা গানের পরিবেশন রীতি উপস্থাপনা করা যেতে পারে। প্রথমেই আসা যাক পশ্চিমবঙ্গের গম্ভীরা গানের কথায়।

পশ্চিমবঙ্গের গম্ভীরা গানের ঢঙ যাত্রার। ১৪/১২/১৬ ফুটের মতো অংশ গোল করে ছেড়ে দিয়ে দর্শকেরা মাটিতে বসে। সেই ছেড়ে দেয়া অংশেই গম্ভীরা হয়। ওপর সামিয়ানা বা অন্যকোনো আচ্ছাদন (ইদানিংকালে ত্রিপল জাতীয় জিনিস ব্যবহৃত হয়) দেয়া হয়। একটু দূরে গ্রিনরুম বা সাজঘর থাকে কোনও বাড়িতে বা অস্থায়ী ঘেরা জায়গায়। খালি অংশটির একপাশে থাকে বাদক বা গায়কেরা। বাদক বা যন্ত্রশিল্পীদের মধ্যে থাকেন–

হারমোনিয়াম বাদক	১ জন	দোহার	২ থেকে ৬/৭ জন
জুড়ি বাদক	২/৩ জন	ঢোলক বাদক	১ জন
তবলা বাদক	১ জন	মন্দিরা বাদক	১ জন
বাঁশি বাদক	১জন	কর্ণেট বাদক	১ জন

একটি গম্ভীরা গানে কয়েকটি অংশ। যেমন–মুখপাদ, শিববন্দনা, ডুয়েট বা দ্বৈত সঙ্গীত, চার ইয়ারী, পালাবন্দিগান, খবর বা রিপোর্ট।

মুখপাদে গম্ভীরার একটি গান করে এসে তাদের পরিচয় দেয়। এটির দুটি অংশ, প্রথমটিকে বলে 'ধুয়া' ও দ্বিতীয়টিকে বলে 'চিতানি'। ধুয়ার আড়াই ফের গান। 'চিতানি' অংশে আছে দুই ফের গান। তেহাই অর্থাৎ মান পর্যন্ত সব গানই হয়, অর্থাৎ ২, ২ $\frac{১}{২}$.৩ সব ফেরই হয়। তবলারও বিভিন্ন বোল বর্তমান।

মুখপাদে তিনজন ব্যক্তি শুদ্ধ একতালে গায়। চতুর্থ জন পরে দাদরায় গায়। ধিন্ ধিন্ ধা তিন নাগ্, তার সঙ্গে রেলা ও তেহাই।

মুখপাদের পর বন্দনা। বন্দনা অংশে মহাদেব (শিব) সেজে আসেন একজন। পরিধানে বাঘছাল, ডান হাতে ত্রিশূল, মাথায় জটা ও বাম হাতে ডম্বরু। মহাদেব এখানে রূপকার্থে উপস্থিত হন। সকল শক্তির আধার হিসেবে তাঁকে দেশের নানা দুর্দশা সম্পর্কে অবহিত করা ও তার প্রতিকারের জন্য আবেদনই এই অংশের মুখ্য বিষয়। এখানে উপস্থিত অন্য চরিত্রগুলোর গায়ে ছেঁড়াগেঞ্জি, পরনে ধুতি (মালকোচা করে), কপালে চুনের টিপ, মাথায় ও হাতের কব্জিতে ছেঁড়া ন্যাকড়া বা দড়ি বাঁধা থাকে-এর অর্থ দারিদ্র পীড়িত জনগণ। উভয় পক্ষের ব্যাঙ্গাত্মক উক্তি প্রত্যুক্তি চলে। কিছুক্ষণ সংলাপ চলার পর শিব সমস্যা প্রতিকারের আশ্বাস দিয়ে অন্তর্হিত হন। তখন শিবকে লক্ষ্য করে সবাই গান ধরে–

শিব বন্দনা

শিব দন্ডবৎ হে তোমার অভয় পায়।
(ও) তোমার বারিয়্যা যুক্তিগোলো মুক্তির বেশ উপায়॥

১. স্বরাজ স্বরাজ কোহতে কোহতে স্বরাজ আন্যা দিল্যা,
কাচ্চিপাক্কি দুভাগ কোর্য্যা গ্যাড়া দিল্যা কিল্যা,
ফুর্ত্তিতে আছে ছেল্যা পিল্যা,

২. ওপারেতে আল্লাহ্ আকবর হাঁক শুনি হরদম্,
(আবার) এপারেতে হাঁক্ ছাড়ে ফের বন্দেমাতরম্,
বুলি দুট্যায় সরগরম।
(আবার) বর্ডারেতে অর্ডার মাফিক পুলিশ পাহারায়॥

৩. একদিকে বজ্রআঁটুনী ফস্কা গিরো আদানে প্রদানে,
ঘুস্ ঘুস্ কর্য্যা যায় আসে ফের কার জিনিস কে টানে,
সবাই বুঝে অনুমানে,
আবার পাশপোর্টের খুব আরচাপতন ব্ল্যাকের খেল খ্যালায়॥

৪. ব্রিটিশের চাল ভালোই রকম চালিয়্যা দিল্যা দেশে
মাইয়া-মরদ, বুড়া-বুড়ী চল্‌ছে নানান বেশে–
হাওয়া খাচ্ছে হেসে হেসে,
কোরছে বর্জননীতি উল্টা অর্জন ব্রিটিশী প্রথায়॥

৫. মদ সিগারেট ভরদম্ চালাও নাইকো পিকেটিং
ভেজাল খাইয়্যা ভেজাল করছ সবাইতেই চিটিং
সিনেটারির জোর মিটিং,
আবার 'এ' হ'তে 'জেড' ভিটামিনে কত কি খাওয়াও।

৬. তোমার কুশিক্ষা সুশিক্ষা টুঁর‍্যা পাই না শিক্ষার মাঝে
স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ দুটাই ব্যাড়ায় ক্লীবের সাজে
কিবা আপ টুডে বিরাজে,

আবার সধবা, বিধবা কি কুমারী চিন্যা দায়॥

৭. মায়ের জাতে প্রসব করত এটা চিররীতি
এখন যে কে প্রসব করবে এটাই আসছে ভীতি।
যখন উল্টাচ্ছে সব নীতি,
শেষে নারদ ঋষির মতন যেন ছেলে না পয়দায়॥
(রচনা : সতীশ চন্দ্র গুপ্ত, আইহো, মালদা)

শিবাবন্দনার পর নানান বিষয় নিয়ে রচিত গান পরিবেশিত হয়। বিভিন্ন সমস্যা থাকে ঐসব গানের বিষয়বস্তুতে। যেমন–ভাষা, সমস্যা, বেকার সমস্যা, দেশের রাজনৈতিক দলাদলি, অর্থনৈতিক সংকট, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত–

গান

(অল্প মূলধনের ব্যবসায়ীর নিজেদের চরম দুর্গতি বর্ণনা)
ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ী আজকাল ব্যবসা করা হ'ল দায়।
সংসার চালাবার উপায় তো নাই॥
(দিদা)। দোকান করে গেনু মরে,
ট্যাক্স আর কত দেওয়া যায়।
দিলে বাকি, পড়ছি ফাঁকি,
(আবার) চার্জ দিলে খাতা দেখতে হয়॥
লাইসেন্স করা মানে পায়ে ধরা,
অফিসের অন্ত নাই॥

(ব্যবসায়ীর গান শেষ হলে একজন বি. এ পাশ বেকার তার দুঃখ বর্ণনা করলে ব্যবসায়ী কিছুটা মানসিক প্রশান্তি পায়।)

বেকার। বি. এ পাশ করার নেই কোনো দাম,
চাকুরী খুঁজ্যা হনু হালাকান॥
(আবার) রূপিয়্যা দিলে চাকরী মিলে
নহিলে ব্যাকিং থাকা চাই॥
আবার...
একি হাওয়া এল দেশে
জান বুঝি বরবাদ হ'ল শেষে।
(আবার) মেয়েদের আধিপত্য দেখে
মনে হয় ম্যাইয়া হয়্যা যাই॥
আজকাল...
থাকব না ভারতে, যাব চন্দ্রলোকে,
রকেটে আরোহণ করি
দেখব স্বর্গ-মর্ত্য।
বেকার জীবন হবে সার্থক

প্রণাম জানাব হরির পায়॥
আজকাল...
(রচনা : ভূপেন্দ্রনাথ সাহা, আইহো, মালদা)

শিব-বন্দনার পর সব অনুষ্ঠানসূচিতে অভিনেতাদের মধ্যে একজন একেবারে ছিন্নবস্ত্রে থাকে। সে দরিদ্র জনসাধারণের প্রতিনিধি। তার বক্তব্য সবচেয়ে কৌতুকপূর্ণ। কিন্তু নিষ্ঠুর সত্যের মোড়কে ঢাকা। হাস্যরসের মাধ্যমে বক্তব্য পরিস্ফুট করে কুশীলবেরা, কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে লুকিয়ে থাকে কঠিন সত্য। কথাগুলি লোকদের ভাবায়। এ ধরনের ২/৪টি গান পরপর পরিবেশিত হয়ে থাকে। গানের পর শুরু হয় ডুয়েট বা দ্বৈত সঙ্গীত। এতে একজন পুরুষ-নারীর বেশ ধারণ করে। একজন পুরুষ ও একজন নারী চরিত্রই মূলত ডুয়েট-এর কুশীলব।

ডুয়েট
(বেকার স্বামী ও চাকুরে স্ত্রীর কলহ)

স্ত্রী– লাভ ম্যারেজ করে সারা জীবন ধরে
জ্বলে মরলাম হায়!
আস্ফালন তার শোভে কি যায়
একটি পয়সার মুরাদ নাই।

(১)

স্বামী– এ কথা ভাবোনি তখন
বিয়ে করেছিলে যখন,
বাসায় ডাকিয়া চিঠি পাঠিয়ে (কত) প্রেম নিবেদন
তোমার তরে বাপ-মা ছেড়ে আমার এমন দশা হায়!

(২)

স্ত্রী– হুজুর বলে ডাকবে আমারে
চলবে হুকুম তামিল করে
এদিক ওদিক চললে দিব চাকরী খতম করে
তখন টো টো করে মরবে ঘুরে খাবে কি বল আখার ছাই?

(৩)

স্বামী– সরকারের যা বলিহারী
এ যুগে আমরাই আনাড়ী
পুরুষেতে পায় নাকো কাজ চাকরী পায় নারী
এরা ছেড়ে হাঁড়ি, দুলিয়ে শাড়ি সব কাজই দখল করতে চায়।

(৪)

স্ত্রী– শক্তিস্বরূপিনী নারী
ইংলিশ চ্যানেল দিচ্ছে পাড়ি
হাতি নেয় বুকে রেবা রক্ষিতে দেখ বাহাদুরী
এই দেশের লাট সাহেব নারী আরো কত প্রমাণ চাই।

(৫)

স্বামী– আমার মত যারা বেকার
আগে করতে শেখো রোজগার
তারপর লাভ ম্যারেজ করো নৈলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার
স্ত্রী রোজগারে ভরসা করলে আমার দশা হবে হায়।

(৬)

স্ত্রী– এতকাল ছিলে উপরে
নামিয়েছে স্বাধীন সরকারে
শাসন গর্জন চলিবে না আর পত্নীর উপরে
ভাল না লাগিলে যাব চলে–পতির মোদের অভাব নাই।

(রচনা : গোপীনাথ শেঠ, ইংরেজবাজার, মালদা)

ডুয়েট-এর পরের অংশ চার ইয়ারী। চার ইয়ার বা বন্ধু, অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে এ পর্বের পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা চার। বৈঠকী ঢঙে চলে সংলাপ ও গান। চার ইয়ারী (লোকনাট্য) অংশ নিম্নরূপ ঃ

চার ইয়ারী

(ক)

১. ইন্দিরা গান্ধী (ভারতের প্রধানমন্ত্রী)-করে বাংলাদেশের মুক্তি, নিজের চুক্তি, যুক্তি সারে করেছি নিজে কাজ।
২. মুজিবর রহমান্ (বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী)–বাংলাদেশ ভূলবে না তোমায়, থাকতে বাংলা সমাজ।
৩. জুলফিকার আলি ভুট্টো (পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী)–আমি লড়ে দেখব একবার, করতে প্রতিকার।
৪. উচিত বক্তা–সেই দুধে দই জমবে না আর
খেলে খাওযা হবে তোমার সার।
যতই লাফান ঝাপান, আর তরপান
সব হয়ে গেল বেকার॥

(খ)

১. যত রকম সাহায্য দেবার, যা হয় দরকার, দিয়ে যাব তার হবে না কোন আন।

২. থাকতে জীবন রাখবে বাংলা তোমারই সম্মান।

৩. সহায় চীন, আমেরিকা–ভয়ের কারণ নাই

৪. সেই গুড়ে বালি পড়ছে ভাই

বন্ধুরা সব হবে না সহায়–
ভিয়েতনামের মুক্তি আমেরিকা দিল
পড়ে দেখ সবার ঠেলায়।

(গ)

১. বিশ্বের সকল দেশ মিলে, স্বীকৃতি দিলে, মেনে নিলে সবাই বাংলাদেশের বিধান।

২. নির্বাচনই দেখিয়ে দেবে এর সঠিক প্রমাণ।

৩. সৈন্যদল না হলে ফেরান, স্বীকৃতি দিবে না পাকিস্তান।

৪. পাকিস্তান ধুয়ে মুছে হবে সাবাড়, চারিদিক ঘিরে ভাঙবে তোমার ঘাড়, দেখ সীমান্ত গান্ধী, বেলুচিরা, কাজে

(রচনা : রামকিঙ্কর পণ্ডিত, ইংরেজবাজার, মালদা)

চার ইয়ারীর পর শুরু হয় পালাবন্দি গান। এতে বেশ কয়েকজন শিল্পী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে একজন সাধারণ জনগণের প্রতিনিধি বা স্পষ্টবক্তা বা উচিত বক্তার ভূমিকা গ্রহণ করে। এ ভূমিকাটি গ্রহণ করে দলে সর্বাপেক্ষা দক্ষ অভিনেতা। তাঁর বক্তব্য ও রঙ্গ-পরিহাসেই গম্ভীরার নাট্যিক ভাবটি পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয়। কাহিনীর মধ্যে গতি বা Tempo বর্তমান (দর্শক-শ্রোতাদের দৃষ্টি ঐ উচিত বক্তার দিকে নিবদ্ধ থাকে)। সম্পূর্ণ বক্তব্যটি পরিস্ফুটনে তার ভূমিকাই মুখ্য। তার সাফল্য ও ব্যর্থতার উপরেই নির্ভর করে অনুষ্ঠানের মান। এবারে একটি পালাবন্দি গান উদ্ধৃত করা হলো–

পালাবন্দি গম্ভীরা গান

১ম অংক ১ম দৃশ্য

শিববন্দনা

প্রণামি হে শিব তুমি কি সেই শিব,
অশিব ছাড়া যে–কিছুই নাই।
দেখছি কিছুই নাই শিব, কিছুই নাই॥

(১)

কোথায় শিরে ফণী, কোথায় সুরধনী, ভালে নয়ন মণি হ'ল লীন,
ফণীর সে গর্জন, তরঙ্গের তর্জ্জন, মদন বর্জন সেই অগ্নিক্ষীণ,
হ'ল অগ্নিক্ষীণ হ'ল

ওহে ও মহাকাল, নর্ত্তক সে তাল বেতাল
ডমরুর ডিম্ ডিম্ বাদ্য কোথায়,
বাদ্য কোথায়, নৃত্য কোথায়॥

(২)

কোথায় হে কৃত্তিবাস, কোথা সে কৃত্তিবাস, আবাস ইন্দ্রপ্রস্থ্ করলা সার,
কই হে কৈলাসপতি, মা ভব প্রসূতি, আদ্যাশক্তি-সাঁথ নাই কি আর,
সাঁথে নাই কি আর তাই'তে হাহাকার,
তব বাহন বৃষ, তাও দেখি কৃষ, তৃষাতুর হয়ে বারি চায়,
দেখি বারি চায়, চারিদিক তাকায়॥

(৩)

ফণী শিরোপরে, ডেকে নৃত্য করে, মন্তর পড়ে কেবা আড়ালে,
শান্তি শান্তি কা'র নীরবে রত পড়ে, ভেকের ভুয়া সাহস বাড়ালে,
সাহস বাড়ালে, গাছের চড়ালে,
তোমার যে ভূস্বর্গে, চির অরিবর্গে, থানা হানা দিয়ে কি ফুকরায়,
কি ফুকরায় কত কি... ।

(৪)

ভদ্রমূর্ত্তি ছাড়, রুদ্রমূর্ত্তি ধর, কোষ্যা ত্রিশূল ধন ত্রিশূলী,
খণ্ড প্রলয় কালে অগ্নি জ্বালাও ভারে, প্রকাশ বব বম্ বম্ বুলি,
বব বম্ বুলি ত্রিশূল তুলি, জাগাও শবাসন,
করাল বদনা সেই শক্তি মায়া, মহাশক্তি মায়া, মহাশক্তি মায়া॥

(৫)

অন্নপূর্ণার দেশে, অন্নবিনা ক্লেশে, মধ্যবিত্ত শ্রমিক চাষি শেষ,
কি পাপে কি হ'ল, অনাহারে মল, রৈল বেঁচে পুঁজিপতি বেশ,
পুঁজিপতি বেশ, অফিসার মেলমেশ, মুনাফা বাড়ছে, গরিবকে মারছে,
ক'রে কত হুল্‌বল্ বরকনায়, ছল্‌বল্ বরকনায়, কৌশল জাল বিছায় ।
সতীশচন্দ্রের বাণী, শুন ত্রিশূলপাণি, প্রদানি স্বরাজের আত্মবোধ,
ফিরাও মনোভাব, সংঘবদ্ধভাব, অভাব কুস্বভাব সব কর রোধ,
তুমি কর রোধ দেশাত্মবোধ, নইলে মক্কা যাও, বন্দিশালে যাও ।
ভুলে যাব সব নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়॥ (প্রস্থান)

১ম অংক ২য় দৃশ্য

(স্থান/রাজপথ, পাগল বেশধারী জনৈক নাগরিক গাইতে গাইতে প্রবেশ করে)

পাগল। বাপরে বাপ্ স্বরাজ কুণ্ঠে লুকাল, বাপরে!
মরা গাঙ্গে বান ডাক্যা ফের দেখ্তে দেখ্তে শুখাল। বাপরে!
হায়, স্বরাজ বাঙালির স্বপন, বঙ্গবাসীর সাধনার ধন স্বাধীনতা,
হায়রে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী শহীদ জীবন চুকাল। বাপরে!

(২)

কতশত ভারত রবি, স্বরাজের আরাধ্য ছবিরে, হায়রে হায়
তারা ব্রিটিশের বিরোধী বলে সবকে জেলে ঢুকালো॥ বাপরে!

(৩)

কাউরই ভাগ্যে হ'ল পোষ মাস, কাউরই ভাগ্যে হ'ল সর্ব্বনাশ রে!
স্বরাজরে–দেখছি গণ্ডা গণ্ডা পাণ্ডা জুট্যা ভুয়া আণ্ডা ফুঁকাল।
(জনৈক বাউলের প্রবেশ)

গান

ওরে কি ঢুঁরছিস্রে পাগল ভাই, তোর কি মাথা-মুণ্ডু কিছুই নাই।
ওর-স্বরাজ এঠে, পাবি কুণ্ঠে, দেখবি দ্যাখ্ দিল্লীর আড্ডায়॥

১. স্বরাজ ভাঙ্গ্যা ক'রলে দু'খান, একটা পাক্কি এক হিন্দুস্থান,
হিন্দস্থানের স্বাধীনতা, ঢুঁর্‍্যা পাস যদি ওর পাত্তা, দ্যাখেক–
অফিসে অফিসে, ওঠে পাবি এ্যাকনা দিশে, দেখবি ধনিকতন্ত্রের
পাছে, দেখবি মা লক্ষ্মীদের কাছে, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ফাঁক্কা কাই॥

২. ডিপারমেন্ট হাজার একটা, সবেত লাগা আছে ফ্যাঁকটা।
যদি ফুস্পাসে ঘুষ চালান, তবে সব কাম হ'বে খালাশ,
না ত হওয়া কাম তোর নষ্ট, তোকে কোহ্যা দিনু স্পষ্ট,
উঠিয়া রাখেক সমাহর্ত্তা, রাখেন ডিপার্টমেন্টের কর্ত্তা,
সবকে আমলাচক্রে ঘোল খাওয়ায়॥

পাগল। সেই তোরে হামি শুধু ঢুঁর্‍্যা ব্যাড়াছি স্বাধীনতা, কুণ্ঠে গ্যাল–
আজ ১০/১২ বছর হল স্বাধীনতা পায়্যাছি,[১], এ স্বাধীনতা কুণ্ঠে গেল?
তোর কথা ঠিকই ভাই এখুনে বুঝতে পারনু একটা গান মনে পড়লে বাউল ভাই–

বাউল। কি গান রে?

পাগল। এই ব্রিটিশ আমলের গান, একনা উল্ট্যা লিয়্যাছি।
ওরে স্বদেশ স্বদেশ কহিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়রে দাদা–

এদেশ তোদের নয়,
ব্রিটিশের সাজ, ধর‍্যা ব্যাড়ায় দেখ্যা লাগে ভয়-অদেরকে দেখ্যা লাগে ভয়,
চিন্যা যায় না, পাত্তা পাই না, কেই বা ম্যাজিস্ট্রেট কে এস. পি হয়॥
এদেশ তোদের নয়,
ব্রিটিশের সাজ, ধর‍্যা ব্যাড়ায় দেখ্যা লাগে ভয়-অদেরকে দেখ্যা লাগে ভয়,
চিন্যা যায় না, পাত্তা পাই না, কেই বা ম্যাজিস্ট্রেট কে এস. পি হয়॥

(১)

কোট প্যান্ট নেকটাই সাজের ভরং, চরং চড়্যা আছে, অরা চরং চড়্যা আছে
নেংটী মারা মানুষ হাম্‌রা ভিঁরিনাখো কাছে, ডরে ভিঁরিনাখো কাছে,
অরাই স্বদেশী, ব্রিটিশ বেশি, অরাই স্বাধীনতা করলে জয়॥ দাদা–
(গান গাইতে গাইতে ফাজিলের প্রবেশ)

গান

আল্লা বিপাকে মাল্লে জানক, শুয়্যা শুয়্যা খোয়াব দেখনু
লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান॥ বিপাকে...

১. হায়রে পাকিস্তান কি বেহেস্ত স্থান ধরনু জিন্দাবাদ শ্লোগান।
এদিক উর‍্যা আস্যা জুর‍্যা বোঁস্যা সোলজারে পাক্‌রাছে কান॥ বিপাকে...

২. পায়্যা সাধের বেহস্ত্ পাকিস্তান, ছাড়নু বৈরাগী আস্তান,
এদিক আম গ্যাল আম, ছালা গ্যাল ভাবতে ভাবতে হালাকান॥ বিপাকে...

৩. খোদা খাঁট্ তক্কির সব কর মাপ্ পূর্ব-পশ্চিমে দুই কর সাপ,
খোদা একদর‍্রা সব কর‍্যা পূর্ব-পশ্চিমের লাগাও একসরাণ॥ বিপাকে...

বাউল। হাঁ চাছা তুই কাঁহা?

ফাজিল। আর কহিস না বাপজান, পাকিস্তানে সব সোলজার আস্যাছে, আর হামাঘরে নাস্তানাবুদ কোর‍্যা ছাড়ছে, হায় আল্লা। বক্‌রা-বকরীরদফা শ্যাস কোর‍্যা ছাড়সে। কিছু কোহ্‌তে গেলেই মার। হামাঘোরের মানইজ্জৎ আর মুস্‌লাম নাই বাজি, সেই হামার ভিটটা দেখতে আস্যছিনু, কেহু লিয়্যা লিয়্যাছে কি আছে। দেখনু আছে॥

বাউল। ভিট্যা দেখ্যা আর কি হবে বাছা? বিক্রি করবি কি?

ফাজিল। বিক্রি, ভাগ্যে বিক্রি করিনি, না তো কুনখানে আস্যা বাসা বাঁধতুক?

বাউল। মানে তুই কি চোল্যা আসবি ফের?

ফাজিল। আসতে হবেই বাপজান, তোরা খুব সুখে আছিস, কংগ্রেস রাষ্ট্রের মত কি রাষ্ট্র, আছে? এখানে হিংসা নাই, অবিচার নাই, ভারতবাসী কিসে সুখী থাকবে, কিসে কর্মী হবে আর বহু চেষ্টা চলছে: রাস্তা-ঘাট, স্কুল, ডাক্তারখানা, বহুরকমের কারখানা–সবদিক দিয়্যা ভারত উন্নত। হিন্দু-মুসলমানে কোন বিভেদ নাই, এমন জাগা ছাড়্যা কি গুখোরি কাম কোর‍্যাছি; এটা বৈরাগীরাজ্য বাপজান, এটা গৌর-নিতায়ের রাজ্য– এখানে কষ্টে কেউ থাকবে না।

বাউল। হাজার হোক তোষোরে জাতীয় রাজ্য, তার কি নিন্দা করতে আছে?

ফাজিল। সুনামও করবে না, দুর্নামও করবো না, আর বাপদাদার ভিট্যাও ছাড়বো না, শুধু হাতপায় চলে আসবো, কোদা থাকবে। তবে মনে রাখিস অখণ্ড হবেই হবে। পূর্ব-বাংলা সব বুঝছে যাই বাপজান, দিন থাকতেই পাকিস্তান রওনা দিব।

বাউল। পাশপোর্ট-ভিসা তোর আছে?

ফাজিল। উঠা তোর পাশপোর্ট-ভিসা, ঘুসে কি না হয় বাপজি? ঘুসে ব্ল্যাক চলছে, যাওয়া আসা চলছে। বর্ডার-পুলিশ সব ধামাধরা, পয়সা পাইলে ওরা কি না করতে পারে? নামে বর্ডার-পুলিশ কাজ কিছুই নাই। এইতো আধমন সুপারী আননু, হামার যাওয়া-আসা খরচ পষিয়্যা গ্যাল। যাই–

বাউল। আদাব চাচা (ফাজিলের প্রস্থান)

পাগল। শুনলি বাউল ভাই, ফাজিল চাচা বলছে এটা বৈরাগী রাজ্য।

গান

পাগল। ঐ দ্যাগ ফাজিলচাচার কথা শুন্যা দুঃখ লাগছে আর হাসি,
কি সুখে যে আছি হামরা জানছে বঙ্গবাসীরে, কি কোর‍্যা স্বরাজ পানু
জিন্দ্যাতে আধমরা হনু, হায়রে কুণ্ঠে যে প্রতিজ্ঞা, গান্ধী মহাত্মাজীর আজ্ঞা
দাদা কুণ্ঠে গ্যালো সিগারেট পোড়া বিলাতী চিজ্ বর্জন;
কুণ্ঠে গ্যালো পিকেটিং আবগারীর গর্জনরে-কুণ্ঠে চরকা কাটার শব্দ
মাঞ্চেষ্টারকে করতে জব্দ; কুণ্ঠে তিনশোর নীচে মাইনা
এ্যারই হদিস্ খুঁজ্যা পাই না, আবার ঘুসের তো ভাই কথাই নাই–
স্বাধীনতার বলিহারী যাই, সাজালো ব্রিটিশের মাসতুতো ভাই
স্বাধীনতার বলিহারী ভাই।
বাউল। ওরে ঘাবড়ালে চলবে না দাদা, দেখ্যা যা চুপ কোর‍্যা, দশবছরের
মধ্যে দেশটা উঠলো ক্যামন গোড়্যারে– রাস্তাঘাট আর শিক্ষা বিভাগ,
নৃত্যগীত আর রাগিনী রাগ, গাঁয়ে ডাক্তারখানা ওষুধ নিতে নাইলো মানা
ওরে রেল, ইস্টিমার, উড়াজাহাজ, পথচলার সুবিধা,
তুরন্ত যাবি, তুরন্ত আসবি নাই যে কোন বাঁধারে।
উচ্চ শিক্ষায় মায়্যা মরদ, চাকরীর বাপের করছে দরদ,
এমন দরদ, এমন দরদ বুঝবে কেটা, পাগলা বুঝিস নাতো সেটা;
ওরে হিন্দু হিন্দু এক হ'ল জাতের গরম, বড়াই সব ম'লো,
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব মোল, জাতের গরম, বড়াই সব প'লো।
পাগল। ওরে সবই বুঝছি সবই জানছি দেশ উঠছে আকাশে,
ক্যানে পরিকল্পনা-চলছে উর্ধ্বশ্বাসেরে
ঘাটতির কথাই হরহামাসা, এটা ওতো মস্ত তামাসা,
ধার কর বিদেশ হতে যত ঘাটতি পূরণ করতে, দেখছি ট্যাক্স ট্যাক্স
মহাট্যাক্স, আয়ের নাইখো ওর,

নিজের ধনে নিজে হামরা হোয়্যা আছি চোর রে।

মাইনার অঙ্ক কোটী কোটী সব বিভাগেই চলছে পট্টি,

ধরতো কোন বা ওপর আলা-ঘুষ যে চলছে পালা পালা

সবাই ঘুষের ঘুমন্ত গোঁসাই, স্বাধীনতার বলিহারী যাই॥

বাউল। ওরে দু'শো বছর গুত্তা খায়্যা, কুত্তা সাজ্যাছিলি, মানুষের যা মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিলি যে, দেশ এ্যাখন হয়্যাছে স্বাধীন, গোলমালে চলবে কটা দিন–

পরে সায়েস্তা সব হবে, এদেশ নিজের বুঝবে যবে;

দেখবি গরিব মধ্যবিত্ত, কৃষক পাবে পূর্ণস্বত্ত্ব।

এখন নিজেরাই সামল্যা চলো।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাব ম'ল।

(রচনা : সতীশচন্দ্র গুপ্ত, আইহো, মালদা)

গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ খবর বা রিপোর্ট (Report) একটি বিশেষ অঞ্চল বা শহরের (যে স্থানে অনুষ্ঠান হয়) নতুন খবরাখবর। সমাজের অন্যায়, দুর্নীতি মানুষকে অবহিত করার একটি বিশেষ মূল্যবান মাধ্যম এটি। রিপোর্ট নিম্নরূপ–

খবর বা রিপোর্ট

(স্থানীয় বা দেশের খবরের তালিকা)

কোন সুরেতে গাহিব গান-আজাই।

করি এ সুর ওসুর ঘুসুর ঘুসুর সুর বিনে গান গাওয়া দায়॥

১. ভারতের প্রেসিডেন্ট মশাই
প্রতিবছর উপাধি বিলায়
পুরাতন অফিসার একজন
করেছিল নর-নারীর নির্য্যাতন
সেই কাজের গুণে এতদিনে 'পদ্মশ্রী' উপাধি পায়।

২. হায়রে দুঃখের উপর দুঃখ
গেল রাতে শুয়ার সুখ
রাতে শুয়্যা থাকলে ঘরে
মশা টেনে বাহির করে
মশা মারতে গিয়া গিন্নী গালে আমার চড় বসায়।

৩. রাত্রি মালদা শহরে
লাইটহীন সাইকেল পুলিশ ধরে
দারোগাবাবুদের বেলায়
লাইট জ্বালার দরকার নাই
এগার কোটি টাকার পুলিশ পায় না হদিশ
চোর-ডাকাতরা যায় কোথায়।

৪.	বিহানীর বিচার বেশ ভালো
	জ্যোৎস্নারাতে রাস্তায় জ্বলে আলো
	ঘোর অন্ধকার রাতে
	আলো জ্বলে না পথে
	চোরডাকাতে খুশী এতে বিহানীকে শ্রদ্ধা জানায়।
৫.	দীন-দুঃখীর অবস্থা ভয়ঙ্কর
	ধ্বংস মুখে হচ্ছে অগ্রসর
	তাই বলি হে ঈশান
	কারো মোদের শান্তিদান
	শেষে করে প্রণিপাত শেঠ গোপীনাথ চরণ তলে দিও ঠাঁই।
৬.	মালদার সদর হাসপাতাল
	মেয়ে রুগীদের হচ্ছে বারো হাল
	আজ বহুদিন ধর‍্যা
	ডাক্তারনী গিয়াছে সর‍্যা
	তাই অবিলম্বে হাসপাতালে লেডী -ডাক্তার আনা চাই।
	(রচনা : গোপীনাথ শেঠ, ইংরেজবাজার, মালদা)

গম্ভীরা গান শেষ হয় একটি সর্বজনগ্রাহ্য সমাধানের মধ্য দিয়ে। সংলাপগুলি পৃথক লেখা হয় না। কতকটা কবিগানের মতো উপস্থিত বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে সংলাপ তৈরী করে পাত্র-পাত্রীরা।

এবারে বাংলাদেশে প্রচলিত গম্ভীরা গানের একটি নমুনা উপস্থাপনা করা যেতে পারে–

বাংলাদেশের গম্ভীরা গানের নানা আর নাতিই মুখ্য চরিত্র, তাঁদের কথাবার্তা, নাচ ও গানের মাধ্যমেই গম্ভীরা গানের সূচনা থেকে শেষ হয়। তবে বন্দনা পরিবেশনের রীতি রয়েছে বর্তমান গম্ভীরা গানেও, যা অতীতেও পরিবেশিত হতো। তবে পার্থক্য হচ্ছে পূর্বের বন্দনা ছিল শিব বা মহাদেবকে উপলক্ষ করে আর বর্তমান বন্দনা যুগোপযোগী বিষয়ভিত্তিক। যেমন–

কাঁদবি কতো কাল, মা তোর কি জঞ্জাল॥
মাগো তোর অর্ডারে যুদ্ধ হলো
কত রক্ত দিয়্যা স্বাধীন হলো
কতো নেতা আইলো গ্যালো
মোরা হইনু শুধু নাজেহাল॥
মাগো, মনে করি হলাম স্বাধীন
কিন্তু মোরা বিশ্বের অধীন
আবার মরবো যেদিন হবো স্বাধীন
তোর স্বাধীনে কিবা ফল।

এই বন্দনার পরই শুরু হয় মূল গম্ভীরা গান। নানা-নাতি ছাড়াও গম্ভীরা গানে নিম্নলিখিত সহযোগী শিল্পী থাকেন–

১. দোহার	৬/৭ জন
২. হারমোনিয়াম বাদক	১ জন
৩. তবলা বাদক	১ জন
৪. জুড়ি বাদক	১ জন

হারমোনিয়াম, তবলা ও জুড়ি বাদকেরাও দোহার হিসেবে কণ্ঠ দিয়ে থাকেন।

গম্ভীরা গানের শুরুতেই মঞ্চের নিচে দর্শকদের সামনে নাতিকে দেখা যায়। সে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে এদিক সেদিক তাকায় আর দর্শকদের জিজ্ঞেস করে–'হ্যাজী, তোমরা হামার নানাকে দেখ্যাছো জী?' দর্শক-শ্রোতারা তার নানাকে দেখেনি বলে জানালে নাতি মঞ্চের দিকে তাকায় এবং মঞ্চে উপবিষ্ট শিল্পীদের একই প্রশ্ন করে। শিল্পীরা তার নানাকে দেখেনি বলে জানায় এবং তাকে মঞ্চে গিয়ে এসে দুই একটা গান শোনাবার জন্য অনুরোধ জানায়। তাদের অনুরোধে নাতি মঞ্চে বন্দনা গেয়ে গেয়ে নৃত্য পরিবেশন করতে থাকে। এমন সময় লাঠি হাতে অকস্মাৎ নানার আগমন ঘটে। লাঠি দিয়ে তিনি নাতিকে আঘাত করেন এবং নাস্তা নিয়ে সময়মতো মাঠে না গিয়ে এখানে আসার কৈফিয়ত তলব করেন। নাতি ইনিয়ে বিনিয়ে মঞ্চে আসার কারণ বর্ণনা করে এবং এখানে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে তার গুরুত্ব সম্পর্কে নানাকে বুঝিয়ে তাকে কিছু বলার জন্য রাজি করায়। তারপর নানা-নাতির যৌথ কণ্ঠে শুরু হয় গান ও কথাবার্তা। গম্ভীরা গানের প্রধান চরিত্র নানা-নাতির পোশাক ফুটে ওঠে বাংলায় শত সহস্র গ্রামের কৃষকের রূপ। নানার পরণে তাকে ছেড়া, লুঙ্গি, মুখে পাকা দাড়ি, মাথায় মাথাল, হাতে পাঁচনি অর্থাৎ ছোট লাঠি, কখনো কাঁধে লাঙ্গল। তেমনি নাতির পরণেও থাকে শত ছিন্ন গেঞ্জি, কোমরে গামছা, কখনো গামছার আঁচলে বাঁধা তাকে ছাতু অথবা কলাইয়ের রুটি। নানাকে কখনো হুক্কা টানতেও দেখা যায়।

বন্দনার পর নানা-নাতির যৌথ পরিবেশনায় শুরু হয় গম্ভীরা গান। এখানে শিক্ষা সম্পর্কিত একটি গম্ভীরা গানের দৃষ্টান্ত দেয়া হলো–

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার মধ্য দিয়েই জাতি উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিষাক্ত বীজ ঢুকে পড়েছে। শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও দিনের পর দিন সন্ত্রাস আর হানাহানিতে নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে নানা-নাতির মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

ধূয়া (স্থায়ী) : হে নানা শুনব্যাতো আইসোজি
দ্যাশের কামুন ল্যাখা পড়া।
পড়্যা শুন্যা মানুষ হোতে
পারে না হাঁরঘে ছোঁড়া।

যন্ত্র সঙ্গীতের তালে তালে নানা ও নাতি ধূয়া পরিবেশন করে। দোহাররাও তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলায়। এ সময় উভয়েই থেমে যায়, থেমে যায় বাদ্যযন্ত্রের ঝংকার ও দোহারদের কণ্ঠও। নাতি ধূয়ার বক্তব্য সম্পর্কে নানাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে। নানা

বয়স্ক মানুষ, তার অভিজ্ঞতা অনেক। তিনি যুক্তির মাধ্যমে নাতিকে সবকিছু বুঝিয়ে দেন। নাতির বয়স কম। বাস্তবতা সম্পর্কে তার জ্ঞান সীমিত। সে এমন উক্তি করে যাতে দর্শক শ্রোতারা কৌতুক অনুভব করেন। তার অঙ্গ-ভঙ্গিও দর্শক শ্রোতাদের বেশ আনন্দ দেয়। গানের অংশগুলো পূর্ব রচিত হলেও 'কথাবার্তাগুলো নানা ও নাতি তাৎক্ষণিকভাবে তৈরী করেন। ধূয়ার পর শুরু হয় গান ও নৃত্য। প্রতিটি অন্তরায় (পরধূয়া) পর নানা-নাতির কথাবার্তা হয় এবং দোহারীরা ধূয়া পরিবেশন করে । নানা ও নাতির কথাবার্তার মধ্যে থাকে সমস্যার কথা, এবং সমাধানের উপায় এবং সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন। গম্ভীরার অন্তরাগুলো নিম্নরূপ–

ক্যামনে পড়ভে হাঁরঘে গোভ্যা
তোমরা সভাই বলো
বন্ধ থাকে এগারো মাস
খুলা থাকে এক মাস
এদিক ওদিক শুধু চলো।
কার কথা কেবা শুনে
না শুনলে দ্যায় তাড়া।
নানা হে ... ...॥

নানা ও নাতির প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা নাচ, যন্ত্রসহযোগ দোহারদের ধূয়া পরিবেশন।

পড়তে গিয়া পালিয়্যা আসে
লয়তো ছাত্রের দোষ,
আজকের পরীক্ষা পরশু হবে
ক্যামুন কর‍্যা ছাত্র রবে
পড়ার থাকে না যে পরিবেশ
দেখ্যা শুন্যা গোভা কহে
খাবো না আর হুড়া॥
নানা হে ... ...।

আবার নানা ও নাতির প্রাসঙ্গিক কথা-বার্তা, নাচ ও যন্ত্রসহযোগে দোহারদের স্থায়ী (ধূয়া) পরিবেশন–

আমরা সবাই এক হয়্যা
দাবি করি চলো
(শুধু) অন্নের সঙ্গে বস্ত্র লয়
ঠিক মতো পড়তে চাই
এক হয়্যা মুখ খুলো।
এক সঙ্গে দাবি করলে
কাটবে হাঁরঘে ফাঁড়া।

গম্ভীরা গানের সমাপ্তি হয় বিষয়বস্তু উপস্থাপনার পর নাতিকে উপদেশ প্রদানের মধ্য দিয়ে দর্শক-শ্রোতা ও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির (গম্ভীরা শিল্পীরা তাঁকে 'বড়নানা' বলে সম্বোধন করে থাকেন) মনে সমস্যাটি সম্পর্কে অনুভূতি জাগিয়ে তা সমাধানের পদক্ষেপ

গ্রহণের আবেদন জানানোর মধ্য দিয়ে। গম্ভীরা অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ নির্ভর করে নানা-নাতি উভয়ের সাফল্য ও ব্যর্থতার ওপর।

১। ড. প্রদ্যোত ঘোষ লোকসংগীত : গম্ভীরা, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, পৃষ্ঠাঃ ১।
২। হরিদাস পালিত, আদ্যের গম্ভীরা, প্রথম প্রকাশ ১৯০৭, কলকাতা, পৃ. ১০।
৩। মাযহারুল ইসলাম তরু, জেলা নবাবগঞ্জের ইতিকথা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ১৯৯০, পৃ. ১৪৪।
৪। তাসাদ্দক আহমেদ, নবাবগঞ্জ জেলার লোকসংগীত : গম্ভীরা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪ পৃ ৪৬।
৫। ড. প্রদ্যোত ঘোষ, গম্ভীরা লোকসংগীত উৎসব : একাল ও সেকাল, কলকাতা প্রথম প্রকাশঃ ১৯৬৯, পৃ ৩৪-৩৫।
৬। তাসাদ্দক আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।
৭। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, পৃ. ২৭২।
৮। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, পৃ. ২৫৪।
৯। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।
১০। তাসাদ্দক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।
১১। হরিদাস পালিত, আদ্যের গম্ভীরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।
১২। তাসাদ্দক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।
১৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।
১৪। প্রদ্যোত ঘোষ, লোকসংগীত : গম্ভীরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।
১৫। ধান রাখার জন্য নির্মিত বিশেষ ধরনের ঘর। বাঁশের বেড়া দিয়ে একধরণের গোলা তৈরী হয়। মাটি দিয়েও আরেক রকমের গোলা তৈরীর নিয়ম বরেন্দ্র অঞ্চলে রয়েছে।
১৬। পান উৎপাদনের জন্য বাঁশ ও ছনের চালা দিয়ে নির্মিত ঘরের মতো উঁচু ক্ষেত-ছাউনী।
১৭। মহিলা, স্ত্রীলোক।
১৮। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৩।
১৯। তাসাদ্দক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।
২০। ধ্বংসের দিকে।
২১। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ৩ম খণ্ড, পৃ. ২৬১-২৬২।
২২। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪-২৬৫।
২৩। ড. প্রদ্যোত ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮।
২৪। তাসাদ্দক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬।
২৫। সাক্ষাৎকার : রকীবুদ্দিন, গম্ভীরা নাতি, গ্রাম বাসুনিয়াপট্টি, পো: চাঁপাইনবাবগঞ্জ, তারিখ : ১২ মার্চ ১৯৯৯, (বয়স : ৬২ বছর)

দুই বাংলার খ্যাতিমান গম্ভীরাশিল্পী ও রচয়িতা

ড. মাযহারুল ইসলাম তরু

বরেন্দ্র অঞ্চলের বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় প্রচলিত এক শ্রেণীর লোসংগীতের নাম 'গম্ভীরা'। 'গম্ভীরা' শব্দটির অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হলেও আজ পর্যন্ত তার অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট ফোকলোর গবেষক ড. প্রদ্যোৎ ঘোষ তাঁর 'লোকসংগীত : গম্ভীরা' শীর্ষক গ্রন্থে শব্দটির বুৎপত্তিগত যে অর্থ নির্ণয় করেছেন তা হচ্ছে–গম্ভীরা (গম্ভীর মুল)

১. পুরীধামে কাশীমিশ্রের ভবনে চৈতন্যদেবের বাসস্থান নিভৃত গভীর প্রকোষ্ঠ, অলিন্দের পর দালান, তার ভেতরে ক্ষুদ্র গৃহ।
   "গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা লব" (চৈতন্য চরিতামৃত-৩১৩)
   গম্ভীরাতে গোস্বাঞি প্রভূকে শোয়াইল" (চৈতন্য চরিতামৃত-৩৫০)
২. জগন্নাথ দেবের শয়ন মন্দির গম্ভীর। 'গম্ভীরা কক্ষে অন্ধকার অতি গম্ভীরা কুহরে জ্বলে প্রদীপ সন্ত তি" (চৈতন্য চরিতামৃত-৩০৩)
৩. গ্রাম্য দেবতার স্থান (দিনাজপুর)।
৪. শিবের মন্দির, গাজন ঘর, গাজন উৎসব।

অবশ্য অন্ধকার প্রকোষ্ঠ বা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ সম্পর্কে অন্যান্য গবেষকও একমত। কারণ মধ্যযুগের অনেক কাব্যে এই অর্থে "গম্ভীরা" শব্দটির অনেক প্রমাণ মেলে। তবে আমাদের আলোচ্য "গম্ভীরা" শব্দের সাথে গৃহ, মন্দির বা তাদের অন্তঃপ্রকোষ্ঠের কোন সম্পর্ক নেই। গম্ভীরা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে কোনও কোনও গবেষক শিব মন্দির অর্থেই শব্দটি গ্রহণ করার পক্ষপাতি। কারণ শিব বা মহাদেবের অপর নাম গম্ভীর। আর সংস্কৃত "গম্ভীর" শব্দ থেকেই "গম্ভীরা" শব্দটি এসেছে তা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। সুতরাং চলিত কথায় এই মহাদেবের বন্দনা গীতই গম্ভীরা। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে গম্ভীরা এখন আর শিববন্দনা বা মহাদেবের মতো সম্পৃক্ত কোনও লোকাচারকে বোঝানো হয় না। গম্ভীরা বলতে এখন একটা বিশেষ জনপ্রিয় লোকসংগীতকে বোঝায়। এই লোকসংগীতের উদ্দেশ্য শিব বন্দনা নয়, সমাজ সমালোচনা। আর তাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ সংগীত আজ সবার প্রিয়।

উৎপত্তি : প্রাচীনকালে 'গম্ভীরা' পূজা উৎসব হিসেবেই প্রচলিত ছিল এবং তার উদ্ভব প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে অনুমান করা হয়। এ পূজা সাধারণত শিব বা মহাদেবকে কেন্দ্রকরেই অনুষ্ঠিত হতো যা শিবের গাজন নামে পরিচিত ছিল। পশ্চিম বাংলার মালদহ জেলার কোথাও কোথাও এখন তার অস্তিত্ব টিকে আছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য গম্ভীরা গানের সঙ্গে গাজনের সম্পৃক্ততা স্বীকার করতে রাজী নন। তাঁর মতে, গম্ভীরা গানে

দীর্ঘদিন ধরে মূর্তি উপস্থাপন করার প্রথা প্রচলিত ছিল। তবুও তাঁর মতে গম্ভীরা লোকসংগীত ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই লোকসংগীত উদ্ভবের পেছনে একটা বিশেষ জাতিগত এবং ভৌগোলিক পরিবেশগত প্রভাব রয়ে গেছে তা অস্বীকার করা যাবে না।

ভৌগোলিক দিক দিয়ে এই সঙ্গীতাঞ্চল উত্তরবঙ্গ বা বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। এই অঞ্চলের উত্তরাংশ প্রধানত কোচ জাতি দ্বারা অধ্যুষিত। কোচ জাতি ভারতের অতিপ্রাচীন আদিবাসী, রাঢ় অঞ্চলে যে অধিবাসী সমাজ ক্রমে ক্রমে হিন্দু ভাবাপন্ন হয়েছে, তার সাথে কোচ জাতির মৌলিক কোনও সম্পর্ক নেই। রাঢ় দেশীয় আদিম অধিবাসী প্রধানত আদি অস্ত্রাল (Proto-Australiod) গোষ্ঠীভুক্ত, কিন্তু উত্তরবঙ্গের আদিম অধিবাসী ইন্দোমোঙ্গলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত, ইন্দো-মোঙ্গলয়েড অন্যান্য জাতির মতো পীতবর্ণ নয়, বরং কৃষ্ণবর্ণ। যদিও এরই পাশাপাশি পলিয়াদের চেহারায় পরিষ্কার ইন্দোমোঙ্গলয়েড ছাপ বিদ্যমান। এই ইন্দো-মোঙ্গোলয়েড জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে 'গম্ভীরা উৎসব' বা বাৎসরিক উপজাতীয় অধিবেশন (Tribal Council) উপলক্ষে সঙ্গীত ও নৃত্য প্রচলিত ছিল। শিবকে উপলক্ষ করেই সাধারণত বর্ষবিবরণী বা 'বর্ষ পর্যালোচনা' হিসেবে এগুলোর পরিবেশন হতো। এসব হতেই গম্ভীরা গানের উৎপত্তি বলে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন। গবেষকবৃন্দ গম্ভীরা সম্পর্কে যে মতামতই ব্যক্ত করুন না কেন সার্বিক দিক বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই যে, গম্ভীরা মূলত পূজা উৎসব হিসেবেই উদ্ভুত হয়েছে।

শ্রেণীবিন্যাস : মধ্যযুগে কৃষ্টি কালচারের প্রধান অবলম্বন ছিল বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর গুণকীর্তন। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীকে কল্পনা করে পূজা উৎসব হতো। নিজেদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না, অভাব অভিযোগ, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতি তাদের পাদপদ্মে নিবেদন করে প্রতিকারের আশায় বসে থাকতো। এইভাবে চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি লৌকিক দেবতা সম্পর্কে মানুষের মনে বিশ্বাস গড়ে ওঠে। ধর্ম ঠাকুরের পূজা শুরু হয় এই প্রেক্ষাপটেই।

শিব ও ধর্মঠাকুর অভিন্ন কল্পিত হওয়ায় কোন কোন অঞ্চলে আদ্য নামেও পরিচিত। এ কারণে হরিদাস পালিত শিবের গাজনকে 'আদ্যের গম্ভীরা' বলে উল্লেখ করেছেন। তবে বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে তো নয়ই, এমনকি পশ্চিম বাংলার বৃহত্তর মালদহ জেলার কোথাও আদ্যের গম্ভীরার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

প্রাচীনকালে এসব কারণেই 'গম্ভীরা' দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যথা–

১. শিবের গাজন বা আদ্যের গম্ভীরা

২. পালা গম্ভীরা বা গম্ভীরা গান।

আদ্যের গম্ভীরা সাধারণত হিন্দু সমাজের প্রচলিত ও দেব-দেবীর বিষয় নিয়ে রচিত হতো। অন্যদিকে পালা গম্ভীরায় তৎকালীন সংঘটিত বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্থান পেত।

গম্ভীরা গানের বিবর্তন : গম্ভীরা গানের উৎস মূলত 'বর্ষ বিবরণী' বা বর্ষ পর্যালোচনা থেকেই। সারা বছর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা সমস্যা, অভাব-অভিযোগ এতে স্থান পেত এবং মধ্যযুগীয় সনাতন বিশ্বাসে শিবকে সুখ–দুঃখের নির্বিকার প্রতীক রূপে কল্পনা করে

তাঁর কাছে নিবেদন করা হতো। অর্থাৎ মানুষ যখনই কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছে, তখনই তার প্রতিকারার্থে সঙ্গীতের মাধ্যমে শিবের শরণ নিয়েছে। তাদের বিশ্বাস, এসব কিছুই হয় শিবের ইচ্ছায়। শিবই সকল প্রকার সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের দুর্ভোগের একমাত্র কারণ। এখানে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে–

শিব তোমার লীলা খেলা কর অবসান
বুঝি বাঁচে না আর প্রাণ।
অনাবৃষ্টি কর‍্যা সৃষ্টি
মাটি করল্যা নষ্ট হে
দৃষ্টি থাকতে কষ্টি কর‍্যা
দেখছ নাকি কষ্ট হে
মিষ্ট কথায় তুষ্ট কর‍্যা
শিষ্ট লোকের ইষ্ট মার‍্যা
করল্যা মোদের গুষ্টি ছাড়া।
শুন বলি পষ্ট কর‍্যা
তারপরে ম্যালেরিয়ায়
হলাম হালাকান,
বুছি বাঁচে না আর জান।
অন্নদা মা ভিক্ষা তোমার
করবে নাকি দানা হে,
সময়কালে না হয়্যা জল
অসময়ে ফলল কুফল।
(ও সব) মুশরী কলাই গ্যালো ডুব্যা
ক্ষেতের ফসল ম'ল
আম গ্যালো ছালা গ্যালো
ক্যামনে ধরি গান
বুঝি বাঁচে না আর জান।

এই গানটিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট অভাবের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে শিবের উদ্দেশ্যে। কারণ সরল কৃষক মনে করে, শিব যেমন দরিদ্র ও নিঃসহায়, তেমনি তিনি সকল কৃষক সমাজেও দারিদ্র্যের কারণ। তিনি ইচ্ছা করলেই সমাজের এই দুঃসহ দুঃখ দারিদ্র্যের অবসান করতে পারেন–

প্যাটেতে ভাত নাই, ও শিব, গোলাতে নাই ধান
কি দিয়্যা বাঁচাবো ও শিব ছেল্যা পিল্যার জান।
ও বুঢ়া শিব দয়া করো
পরণে তেনা নাই ও শিব বরজে নাই পান।
কি দিয়্যা রাখিবো ও শিব মাইয়্যা লোকের মান

ও বোকা শিব দয়া করো।

নিষ্ক্রিয়তা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য কৃষক-কবির নিকট শিব কৃপার পাত্র হয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেবতার সাথে মানুষের যে একটা সহজ সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় গম্ভীরা গানে তার ব্যত্যয় ঘটেনি।

বিশ শতকের প্রারম্ভে গম্ভীরা গানে শিব মূর্তি তিরোহিত হয়। সে স্থান দখল করে মানবরূপী শিব। অর্থাৎ শিবের প্রতীকে একজন মানুষকে দাঁড় করিয়ে তাঁর কাছে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপস্থাপন করে ফরিয়াদ জানানো হতো। যেমন–

(তুমি) কেন উদাসী, কাশীবাসী, ওহে কাশীশ্বর।
দুনিয়াটা যায় রসাতল রক্ষা করো হর॥
কামার, কুমার, ছুতার, চাষা
ছাড়লো তার জাত ব্যবসা
চাকরি লয়ে বাবু হয়্যা ভাবছে কতো বড়।
গায়ের মাটি শিল্প হলো মাটি
বাংলার মাটি আছে খাঁটি
কৃষি-শিল্প শিখাও মোদের
(তুমি) দেশকে তুলে ধর।
চাষ উন্নতি করতে হলে
চলবে না আর পুরানা চালে
দেশ-বিদেশের নতুন নিয়ম
আমদানী সব করো।
রং তামাসা টুকীর গানে
দেবতা গলায় উলু বনে
শিখাও মোদের ভক্তি মন্ত্র
পূজা-গঙ্গাধর।

বিশ শতকের প্রারম্ভে রচিত গম্ভীরা থেকে শিবমূর্তি তিরোহিত হলেও তখন পর্যন্ত তাতে শিব পূজার প্রভাব বিদ্যমান থাকে। পরবর্তী সময়ে দুই বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার প্রেক্ষিতে সমাজ মানসে পরিবর্তন আসে। গম্ভীরা গানেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। মানুষ সচেতন হয়। তারা ব্রিটিশ সরকারের শোষণে অতিষ্ঠ হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। তাই তাদের গম্ভীরায় শিব আর মহাদেব না হয়ে, হয়ে ওঠে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি। তার সমানে শিল্পীরা ব্রিটিশ সরকারের সামগ্রিক দুর্নীতির কথা তুলে ধরতেন বলিষ্ঠতার সাথে। ফলে গম্ভীরা গান বর্ষ পর্যালোচনা বা বর্ষ বিবরণী উপস্থাপনার পরিবর্তে হয়ে ওঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অন্যতম মাধ্যম। ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনায় মুখর একটি গানের কিছু অংশ হচ্ছে–

জমি-জমা চাষ করে যা ফসল উঠাই
তহে মোদের কি স্বত্ব নাই?
তুমি ওজন করিয়া কাগজ ধরাইয়া

গাড়ি করো বোঝ।
ভারতের অর্জিত জিনিস তুমি কর চালান
আমরা ভারতের লোক খেটে মরি
বাঁচে কিনা জান
ধন্য তুমি বুদ্ধিমান।

শিবের এই প্রীতীকী পরিবর্তনের পেছান একটা চিত্তাকর্ষক ঘটনা রয়েছে। ড. প্রদ্যোত ঘোষ তাঁর 'লোকসংস্কৃতি : গম্ভীরা' গ্রন্থে ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন। ১৯২০-২৩ খ্রিস্টাব্দের কোনও এক সময় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মালদহ আসার কথা ছিল। স্থানীয় প্রখ্যাত গম্ভীরা লেখক ও গায়ক মোহাম্মদ সুফী মাস্টার স্যার আশুতোষ অর্থাৎ শিবের সামনে গম্ভীরা গাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একজন পাত্রকে শিব সাজিয়ে আসরে হাজির করেন। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত স্যার আশুতোষ মালদহে না আসায় তাঁর এক প্রতিনিধি আসেন। তবুও সুফী মাষ্টার শিবকে উপস্থিত করে গান গেয়েছিলেন। গানটির অংশবিশেষ–

হে দ্যাখ, হে দ্যাখ্ কারে ডাকতে
কেডা এলো ভাইরে
ইনি কি স্যার আশুতোষ?
হাইকোর্টের জজ
গায়ে মাখা কেন ছাইরে?

এ ঘটনার পর থেকে সব গম্ভীরায় শিব উপস্থিত হতে থাকেন, সর্বকালের হোতা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে। সুতরাং শিব চরিত্রকে সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের প্রতিভূরূপে গম্ভীরাগানে উপস্থিত করা এবং তাকে জনপ্রিয় করে তোলার মূলে সুফী মাস্টারের অবদান অনস্বীকার্য।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর গম্ভীরা গানের পৃষ্ঠপোষক ও গায়েনরা মালদহ ত্যাগ করে এদেশে চলে আসেন। ফলে আদি উৎপত্তিস্থল মালদহে এ গানের চর্চা দারুণভাবে কমে যায়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহী জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমায় গম্ভীরার ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে। এতদঞ্চলে গম্ভীরা গানের প্রবর্তনকারীদের মধ্যে যাঁরা অগ্রপথিকের কাজ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শেখ সফিউর রহমান বা সুফি মাষ্টার, মোহাম্মদ সোলায়মান মোক্তার, মোহাম্মদ মোহসীন আলী মোক্তার, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ ফজলুর রহমান, তৈয়ব আলী, লুৎফল হক, মনিমুল মাস্টার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বিভাগোত্তরকালে রাজশাহীর গম্ভীরা গানে শিবের অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে এবং সে স্থান দখল করে নানা ও নাতি। নানা-নাতি সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যত রস-রসিকতা চলতে পারে, ততটা অন্য কোনও সম্পর্কে সম্ভব নয় বলেই সম্ভবত এই বিবর্তন।

দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে দুই ধারার গম্ভীরা গানের চর্চা অব্যাহত থাকে। পশ্চিমবঙ্গে পালা গম্ভীরা এবং বাংলাদেশে প্রচলিত ডুয়েট গম্ভীরা (নানা-নাতীর গম্ভীরা) চর্চায় সুদীর্ঘকাল ধরে অসংখ্য গুণী শিল্পী ও রচয়িতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

আসছেন। তাঁদের অবদানে লোকসাহিত্যের এই সমৃদ্ধ ধারাটি ক্রমাগত অগ্রগতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমি দুই বাংলার সেই খ্যাতিমান গম্ভীরা শিল্পী ও রচয়িতাদের পরিচয় তুলে ধরতে চেষ্টা করবো।

কৃষ্ণধন দাস গোস্বামী (১৮০৮–১৯১০) : ১৮০৮ সালে মালদহ জেলার আইহো গ্রামে এক বৈষ্ণব পরিবারে কৃষ্ণধন দাস গোস্বামীর জন্ম। তাঁর গম্ভীরা গানগুলি সাহিত্যরস সমৃদ্ধ ও ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ। লেখাপড়া না জেনেও বাল্যকাল থেকেই তিনি গম্ভীরা গানের রচয়িতা ও সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। বছর বছর গান রচনা ও রচনা করা গানের বিক্রয়লব্ধ অর্থে তাঁর জীবন নির্বাহ হতো। একবার বালক বয়সে বৈষ্ণব বেশে যখন তিনি ভিক্ষায় বেরিয়েছিলেন তখন জনৈক ভৈরব তাঁকে দেখে রসিকচিত্তে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি তখন তাঁর তাৎক্ষণিক রচিত গম্ভীরা সংগীতের মাধ্যমে নিম্ন গানের কলি দিয়ে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন।

হামার নাম কিষ্ট দাস, শ্রীকৃষ্ণে দাস, আইহো গ্রামে বাড়ি,
হামার বাবা জীবনকৃষ্ণ, মালা চন্দনধারী
মা গৌরাঙ্গিনী, গর্ভধারিণী, মেয়ে পতি সেবা অধিকারিণী।
হামার বয়স বুঝি আট, বাবা পুঁথি করে পাঠ,
হামি বস্যা বস্যা শুনতুম সব, ক'হলে কথা বাবা পাবে ব্যথা,
তাই সদা থাকতুক নীরব
বাবার কাছে ক, খ, গ, ঘ শিখ্যাছিনু, এগারো বারোতে পুঁথি ধর্য্যালিনু
শিশুবোধ পড়্যা পড়া করনু শেষ, বাবা ধরিয়্যা দিলে বাবাজী বেশ।

পরবর্তীকালে কৃষ্ণধন দাস গম্ভীরা গান ছাড়াও কবিগান, আলকাপ গান ও কীর্ত্তন গান রচনা করেন। বড় বড় কবিদলকে কবিযুদ্ধে পরাজিত করেন। তারপর গম্ভীরা গান ও আলকাপ গানকে প্রচার করে নিজ রচনা গুণে সংগীত জগতকে এমনভাবে মাতিয়ে তোলেন যে, পরিণামে তিনি একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী গম্ভীরা শিল্পী ও গম্ভীরা গানের পেশাদার লেখকে পরিণত হন। তিনি গম্ভীরা গানের বিক্রয়বদ্ধ অর্থ দিয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতেন। ১৯১০ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

সতীশচন্দ্র গুপ্ত ওরফে সতীশ কবিরাজ (১৮৮২-১৯৭৫) : প্রখ্যাত গম্ভীরা রচয়িতা ও শিল্পী সতীশচন্দ্র গুপ্ত ওরফে সতীশ কবিরাজ ওরফে সতীশ ডাক্তার ১৮৮২ সালে মালদহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম স্বর্গীয় রাধারমণ গুপ্ত। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষা না থাকলেও তাঁর গ্রন্থপাঠ ও বিদ্যাচর্চা ছিল আজীবন জাগরূক।

সতীশ গুপ্ত যুবক বয়সে ডাক্তার কালীপ্রসন্ন ব্যানার্জী ও ডাক্তার বৈকুণ্ঠ মুখার্জীর কাছ থেকে এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা করেন। এরই সাথে কবিরাজী চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। এছাড়া সাবান তৈরী ও বিভিন্ন রং তৈরীর প্রক্রিয়া জানতেন তিনি। তবে চিকিৎসাই ছিল তাঁর প্রধান পেশা।

ছোট থেকেই সঙ্গীতের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। প্রথমে পরেশ মালাকার এর যাত্রা দলে তিনি যোগদান করেন। সে দলের যন্ত্রশিল্পী ও সঙ্গীত রচয়িতা হিসেবে বেশ কয়েক বছর কাটানোর পর অপর একটি যাত্রা দলে যোগদান করেন। তবে যাত্রা দলের

গীতিকার ও যন্ত্রশিল্পী হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করলেও তাঁর প্রকৃত সাফল্য আসে গম্ভীরা গান রচনায়। তিনি পালাবন্দি গানও রচনা করেছেন অসংখ্য। মালদহের আঞ্চলিক ভাষায় তাঁর গানই সবচেয়ে সার্থক। তাঁর শব্দ চয়ন ও ছন্দ বিন্যাসে মুন্সিয়ানা লক্ষ্যণীয়।

একজন লোককবি হিসেবে সতীশ গুপ্ত কাব্যরত্নাকর উপাধি লাভ করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে 'সৃজনী' গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ ড. আশুতোষ ভট্টচার্য তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত লোকসংগীত গবেষক ড. প্রদ্যোত ঘোষ এ সংবর্ধনা অনুষ্টানে সভাপতিত্ব করেন।

শিব-বন্দনা

ঐ দ্যাখ্ ন্যাংটা বুড়া সংটা সাজ্যা ঢঙটা কোর‍্যা আছে বোস্যা।
বুড়া আস্ত খ্যাপা ভষম ল্যাপা বাঘের ছালটা পড়ছে খোস্যা॥
আছে বোস্যো।

১. বুড়া ষাঁড়ে চোড়্যা এ্যালো দোর‍্যা গম্ভীরাতে পূজা খ্যাতে।
ঐ দ্যাখ রদবোদ্যা ঐ বাঁশুয়া বলদ আসছে রে ভাই ক্যামন শুঁষ্যা।
আছে বোস্যা।

২. বুড়ার মাথায় ল্যাপটা আলাদ ভাঁপটা জটে সাঁপটা ফোঁস ফোঁসাছে।
আবার মাইয়া একটা তাইয়া কেমন, ঢেউ খ্যালাছে আছে রোস্যা॥
আছে বোস্যা।

৩. ধুৎতেরি ধুতরার ফুল কি সখ কোর‍্যা কেউ দ্যায়রে কানে।
[আবার] হরদম মুখে বম বম বুলি ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে কোস্যা॥
আছে বোস্যা।

৪. আবার ভোঁ ভোঁ ভরং ভরং শিঙ্কা ডুমরু বাজাছে বোস্যা।
ঐ দ্যাখ বোমকেশ জটাজুট জালে আকাশে যেন পড়ছে হাঁইস্যা।
আছে বোস্যা।

৫. আবার কপাল ফুট্যা, আগুন ছুট্যা, সারা দুনিয়া করছে আলা।
গাঁজায় দম কি দিচ্ছেরে কম, কলিকির ধুয়া ফেলছে চুষ্যা।
আছে বোস্যা।

৬. ঐ দ্যাখ দুদিকে দুটা হুলুকমুখা সিদ্ধি ঘুটছে তালে তালে।
আবার পালে পালে কুচনী-বুচনী, ভাঙ্গ-ধুতরা খাওয়ায় ঘোঁস্যা॥
আছে বোস্যা।

৭. দ্যাখেক ঝলর-মলর ঝুলছে ভাস, হাড়ের-মালা ভরা গলা।
বুড়া তাল বেতালে নৃত্য করে রাম নামে হোয়্যা বেহুঁস্যা॥

৮. ভেবে সতীশ বলে পদতলে, ভক্তি বলে জুড়েক আসন।
বুড়ার এমনি শাসন, যমের ভাষণ আসে না এখানে পোষ্যা॥

গান

(শাশুড়ী যুগের পরিবর্তন দেখে ঠিক ভালোভাবে নতুন বৌ-এর নতুন চালচলন গ্রহণ করতে না পেরে তার প্রতি তার মনোভাব প্রকাশ করে)

ওটে লয়্যা বো, লয়্যা লয়্যা দেখছি সব জায়গা।
ম্যাগ লয়্যা ভাতার লয়্যা
লয়্যা সাজ সজ্জায়।
[আবার] লয়্যা লয়্যা কুহুরা দেখ্যা
সাধের প্রাণ জুড়ায়॥

১. ওটে দুধ লয়্যা, ঘি লয়্যা, লয়্যা খাবার পায়।
কেক, বিস্কুট দিয়্যা ঠাকুর ভোগ লাগায়।

২. [ওটে] লয়্যা লয়্যা ঠাকুরপোরা লয়্যা বৌদি পায়।
লয়্যা লয়্যা ঘাটে মাঠে লয়্যা হাওয়া খায়।

৩. ছুঁড়ি লয়্যা ছোঁড়া লয়্যা লয়্যা গান গাওয়ায়।
লয়্যা লয়্যা নাচে লয়্যা লহরা বেশ লাগায়॥

৪. লয়্যা সভা লয়্যা জলসা লয়্যারা সব যায়।
লয়্যা লয়্যা বুলি বল্যা লয়্যার মন সজ্জায়।

যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ওরফে মটর (১৮৯২–১৯৮৫) : বিশ শতকের গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গের অমরাথ মণ্ডল ও আবদুল মজিদ গম্ভীরা গানের মূল অভিনেতা ছিলেন। এর পরবর্তী প্রায় পাঁচ দশক ধরে 'গম্ভীরা লোকনাট্য সম্ভবের' অবিসম্বাদিত মূখ্য অভিনেতা (উচিত বক্তা) ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ওরফে মটর।

মটরের জন্ম ১৮৯২ সালে মালদহ জেলার ইংরেজ বাজার শহরের কুতুবপুর বাবু পাড়ায়। তাঁর পিতার নাম স্বর্গীয় গণেশ চৌধুরী, তাঁরা জাতিতে মৎস্যজীবী (মহলদার)। মটরের শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টমান, পেশায় ছিলেন মালদা কোর্টের মুহুরী।

গম্ভীরাদলের সঙ্গে জড়িত হওয়ার আগে মটর মনসাব গান (বিষহরি গান), আলকাপ ও খ্যামটার গান করতেন। গম্ভীরা গানের প্রতি আগ্রহী হয়ে প্রথমে তিনি আমরনাথ মণ্ডলের দলে যোগদান করেন। পরবর্তীতে গোবিন্দ শেঠের দলে যোগদান করেন। কিন্তু দলনেতার মৃত্যু হলে তিনি তাঁরই যমজভ্রাতা গোপীনাথ শেঠের দলে যোগদান করেন। কিছুদিন পর দলের সঙ্গে মতান্তর ঘটলে সেই দল ত্যাগ করে ১৯৬৬ সালে তিনি নিজে দল গঠন করেন। মটর ছিলেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণের বিশাল বপু বিশিষ্ট। তাঁর অঙ্গ-ভঙ্গিমা, অনায়াস-সিদ্ধ সংলাপ তাঁকে জীবদ্দশায় কিংবদন্তী-সমান শিল্পীরূপে অসাধাবণ জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছে দিয়েছিল। তাঁর অভিনয় ভঙ্গিমা তথা Comic dance like চক্রাকারে ঘোরার ভঙ্গিমা পরবর্তী গম্ভীরা লোকনাট্যসম্ভবের মূখ্য আঙ্গিক প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখনেই মটরের কৃতিত্ব। মটর দেশ বিদেশে প্রায় সহস্রাধিক অনুষ্ঠান করেছেন। তিনি সুইস ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন, ইরানিয়ান স্টাডিস ও কোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডকুমেন্টারি চিত্রে রূপদান করেছেন। লাভ করেছেন ইন্সটিটিউট অব ফোককালচার আয়োজিত ড.

আশুতোষ ভট্টাচার্য কর্তৃক সংবর্ধনা (১৯৮১)। ভারতীয় গম্ভীরার এই কিংবদন্তীর নায়ক শিল্পী মটর ১৯৮৫ সালে পরলোকগমন করেন।

মোহাম্মদ সফিউর রহমান ওরফে সুফি মাস্টার (১৮৯৪-১৯৮০) : প্রখ্যাত গম্ভীরা রচয়িতা ও গম্ভীরা গানের আধুনিক সংস্করণের জনক মোহাম্মদ সফিউর রহমান ওরফে শেখ সফিউর রহমান ওরফে সুফি মাস্টার ১৮৯৪ সালে অবিভক্ত ভারতের মালদহ জেলার ইংরেজ বাজার থানার ফুলবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ বেশারত।

সুফি মাস্টার মালদা জিলা স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। পড়াশুনা ত্যাগ করেছিলেন নানান সমস্যার কারণে, তারপর যোগ দেন ডাক বিভাগের পোস্টম্যান পদে। চাকুরীর পাশাপাশি তিনি সঙ্গীত চর্চা অব্যাহত রাখেন। সুফি মাস্টার ছিলেন স্বভাব কবি। প্রথমে তিনি পালা গান, নিমাই সন্ন্যাস, রাধার মানভঞ্জন ইত্যাদি রচনা করেছেন। এক সময় তিনি মালদহের খ্যাতনামা আলকাপ সরকার আকবর খলিফার আলকাপ দলে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে কিশোরী মোহন চৌধুরী ওরফে কিশোরী পণ্ডিতের গম্ভীরা দলে যোগ দেন। শেষে তিনি নিজেই গম্ভীরা দল গঠন করেন। দেশ বিভাগ পূর্বকালে তাঁর পালা গম্ভীরা গানের প্রতিটি চরিত্র ছিল ব্রিটিশ বিরোধী। তাঁর গম্ভীরা গানে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা লক্ষ্য করে ব্রিটিশ সরকার সুফি মাস্টারের মাথার জন্য এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।

দেশ বিভাগের সময় ১৯৪৭ সালে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার বা Option নিয়ে শেখ সফিউর রহমান মালদহ থেকে রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমার রহনপুরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এখানে এসে তিনি গম্ভীরা চর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং পালা গম্ভীরাকে নানা-নাতির ভূমিকায় রূপ দিয়ে ডুয়েট আধুনিক গম্ভীরায় নবরূপায়ণ করেন। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় তিনজন ব্যক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এঁরা হচ্ছেন–সোলেমান মোক্তার, কালু মোক্তার ও পশুপতি মোক্তার।

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী গম্ভীরা গানকে মোটেও পছন্দ করতো না। তাই ১৯৪৮-৪৯ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জের তৎকালীন পাঞ্জাবি মহকুমা প্রশাসক গম্ভীরা গানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞাকে সুফি মাস্টার উপেক্ষা করে গম্ভীরা গান পরিবেশন অব্যাহত রাখেন।

গম্ভীরা গানে বন্দনা অংশে শিবকে উপস্থিত করিয়ে তাঁকে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করে সুফি মাস্টার যেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, ঠিক তেমনি স্বাধীনোত্তর যুগে 'অপসন' –এ চাকুরী নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) চাঁপাইনবাবগঞ্জে এসে ইসলামীয় প্রভাবে দেবতা শিবকে পরিবর্তন করে 'নানা নাতি'-র Form তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব। অর্থাৎ অবিভক্ত ও বিভক্ত বাংলার আধুনিক গম্ভীরা গানের আঙ্গিক প্রকরণের তিনিই স্রষ্টা। তাছাড়া হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যবোধ জাগরনে তাঁর উদার মানসিকতা বিস্ময়কর।

সুফি মাস্টার রচিত 'গম্ভীরা সঙ্গীত' নামে একটি গম্ভীরা সংকলন মালদা থেকে বাংলা ১৩২৯ সনে প্রকাশিত হয়। এতে শিব বন্দনা, টাকা ও বিদ্যার বিবাদ, বাঙালি সৈন্যগণের

মহাদেবকে সেনাপতিত্বে বরণ করে যুদ্ধে আহবান, চাষার ছেলের স্কুলে ভর্তি হবার কামনা, ব্রিটিশ সৈন্যের জয়, বিলাতি বাবুদের প্রতি ভৎর্সনা, লাট দরবার ভোটে বিভ্রাট, দুজন গ্রাম্য লোকের ডুয়েত ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছিল।

গম্ভীরা গান রচনার কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন সুফি মাস্টার। তাঁর গান শুনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রশংসা করেছেন। ১৯১৮ সালে কবিগুরু তাঁকে সোনার মেডেল উপহার দিয়েছিলেন পাবনা সাহিত্য সম্মেলনে। শুভেচ্ছা পেয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নিকট থেকে। জীবনের শেষভাগে ১৯৭৮ সালে তিনি রাজশাহী থেকে 'মাদার বখ্শ সাহিত্য সংস্কৃতি পুরস্কার' এবং ১৯৭৭ সালে 'উত্তরা সাহিত্য মজলিস পুরস্কার' লাভ করেন। আধুনিক গম্ভীরা গানের রূপকার সুফি মাস্টার ১৯৮০ সালে পরিণত বয়সে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রহনপুরে ইন্তেকাল করেন।

শেখ সফি রহমান ওরফে সুফি মাস্টারের গম্ভীরা গানের নমুনা :

টাকা -বিদ্যা

(ধন ও বিদ্যার কলহ)

বিদ্যা : বিদ্যানাম্ নরস্যপোধিকং প্রসন্নাহি গুপ্তধনম
বিদ্যা ভোগকারী যঃ সঃ সুখকারী বিদ্যা গুরবে গুরু॥
বিদ্যা বন্ধু বিদেশ গমনে বিদ্যারাজসু পূজিতা।
নাই ধনবিদ্যা বিহীন পশু।

টাকা : টাকা ধর্মঃ টাকা স্বর্গঃ টাকাহি পরমং গুরু।
যস্য গৃহে টাকা নাস্তি হা টাকা হা টাকা সদা।
টাকার জন্য বিলাও গত্বা, সাহেব সাজে আদরং।
ধুত্যাদিত্বাং পরিত্যক্তা কোট প্যান্টে সাজনম্।
হা টাকা হা টাকা করি বুক চাপড়স্।

উভয়ে: ভাইরে লাগল টাকা-বিদ্যায় বিষম দ্বন্দ্ব
সভায় বিচার কর কেডা বড় কে ভালমন্দ॥

বিদ্যা: স্বদেশে পূজিত রাজা।
বিদেশে খায় পটল ভাজা॥
বিদ্বান লোকে জগতে পূজ্য।
দেখ বিদ্যার মজা॥
বিদ্যা দেয় ধন, তুই ছাড় টাকার ধন।
টাকা অভিমানী মূর্খধনী, চোখ থাকতে অন্ধ।

টাকা: টাকা পরিযুগে মান্য, টাকা রাজা বলে গণ্য,
ধন্য ধন্য টাকায় কত হয় ধর্ম পূণ্য॥
টাকার জোরে বিদ্যা কিনি তোর
টাকা নইলে পারে সব কিছু বন্ধ॥

বিদ্যা: জগৎপূজ্য সরস্বতী, বিদ্বানের কণ্ঠে বসতি
আর্যভট্ট, নিউটন, কালিদাস প্রভৃতি।
বিদ্যা দেয় জ্ঞান-ধন জ্ঞানে হয় হরিসাধন
তার স্বাক্ষী রূপ-সনাতন স্বর্গবাসী হন।
টাকার মুখ এইকালে, দুঃখ পায় পরকালে
তরে যায় বিদ্যাবলে যত ভক্ত বৃন্দ॥

টাকা: শুধাও মুসলমান হিন্দুকে যতনে রাখে সিন্ধুকে
লক্ষ্মী বলে পূজে আমায় জগতের লোকে।
টাকা করে পাকা, মিউনিপ্যালিটির রোড
যায় নালায় গন্ধে।

বন্দনা ১৯৪৫

(পশ্চিমা সভ্যতা গ্রাস করায় শিব ও দেবদেবীর অপমান)
তোমার এরূপ হতবুদ্ধি দেব, মাথায় গজালো কেন।
বোধ হয় সিদ্ধি গুড়া ছেড়ে বিদেশীয় সুরা করেছ পান॥ (হর)

১. ইন্দ্ররাজার বজ্রকেড়ে, নুরসাহেবের দিলা করে,
তাই হে টেলিগ্রাফের তারে পাই মোরা প্রমাণ। (হর)

২. দেখি চন্দ্রদেব নাইটে, জব্দ ইলেকট্রিক লাইটে।
বেঁধেছে বেশ আধে কাঁধে, নাহি পরিত্রাণ। (হর)

৩. ত্রেতাযুগে পাই হে প্রমাণ, বাল্মীকি দেয় কুশে প্রাণ দান।
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কলের গান আমেরিকা প্রধান। (হর)

৪. দেবাদিদেব শূন্যপথে, বেড়াতেন হে চেপে রথে।
সেই বিদ্যাটি ব্যোমযানে কর‍্যাছো যোগদান। (হর)

৫. পবন মধ্যে জাহাজের পালে, বরণ বাধ্য স্টিমার রেলে,
(আবার) বিলাতে টেমস্ নদীকূলে বিশ্বকর্মার ধাম।

৬. ঋক, যদুঃ, অথর্ব, সাম-এসব বেদের রাখনো না নাম।
(এখন) শিক্ষা দিচ্ছে স্টুপিড ড্যাম, করে ইংলিশম্যান। (হর)

ইন্দ্রদমন শেঠ (১৯০৫-১৯৮০) : পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট গম্ভীরা রচয়িতা ইন্দ্রদমন শেঠ ১৯০৫ সালে মালদহ জেলার আইহো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নকড়ি শেঠা। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা মাইনর পাশ অর্থাৎ বর্তমান কালের অষ্টম মান। তিনি আইহো অঞ্চলে কর আদয়কারী ছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই তিনি সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। প্রাণের তাগিদে তিনি সামাজিক বিষয়ান্বিত অসংখ্য গম্ভীরাগান রচনা করেন। মালদার আঞ্চলিক ভাষায় সতীশগুপ্তের পর তাঁর শব্দচয়ন ও পদবিন্যাস স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার। ইন্দ্রদমন শেঠ ১৯৮০ সালে পরলোকগমন করেন।

(বাংলার অধঃপতনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা গান)
হায়রে স্বাধীনতার ধারা। হায়রে স্বাধীনতার ধারা।
এখন ভাঙ্গ্যা চুর্য্যা উর্য্যা পুর্য্যা কুনদিকে হবে খাড়া।

১. হিন্দু মোসলেম জেন খ্রিস্টান এক দরজা সব হলে,
দেখতে দেখতে কলির কাণ্ড ঘোর কলিতে পোল
ওঁরি মধ্যে থ্যাকা পূর্ব-পশ্চিমবঙ্গ হ'ল সারা॥

২. বাঙালী আর নয় বাঙালি, অবাঙালি নেতা,
তাদের চাপে, হাপে দাপে থুৎনী থাঁতা,
পূব-পশ্চিম বাঙালি এখন জিন্দাতে আধমরা॥

৩. পূব-পশ্চিম বাঙালি মিল্যা স্বরাজ আনলে মোর্য্যা,
হায়রে সে বাঙালি এখন সও হাত জলের তলে পোর্য্যা,
আবার অবাঙালি বাঙালিকে করলে লস্‌সি গাড়া॥

৪. বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান বিজ্ঞানে দুনিয়াৎ ছিল সেরা,
এখন সেই বাঙালি ঘোর কাঙালী ব্যাড়া জালে ঘেরা
চাক্‌রী চাক্‌রী কোর্য্যা পায়ে ধোর্য্যা হচ্ছে আত্মহারা॥

৫. কোথায় সুরেন, চিত্তরঞ্জন, কোথায় বঙ্কিম, রবি,
ওরে ক্ষুদি আদি শহীদেরা আর বঙ্গের ছবি,
তোদের ধমনীতে তাদের রক্ত দ্যায় না কিরে সাড়া॥

৬. জাগ বাঙালি ছাড় বাঙালি, উঠা কাঞ্চি--পাক্কি,
ওরে বঙ্গভঙ্গ এক হোয়ে যাক, রেখে ধর্মসাক্ষী,
নইলে বাঙালির স্থান নাই ভারতে হলি ছন্নছাড়া॥

সৈয়দ মোহাম্মদ সোলেমান ওরফে সোলেমান ডাক্তার (জ. ১৯০৮) : গম্ভীরা গানের অন্যতম রূপকার সৈয়দ সোলেমান ওরফে মোহাম্মদ সোলেমান ওরফে সোলেমান ডাক্তার ১৯০৮ সালের ১৮ই মার্চ অবিভক্ত ভারতের মালদহ জেলার পুরাতন মালদায় (ওল্ড মালদা) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম সৈয়দ ফাইমুদ্দিন।

সোলেমান ডাক্তার পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পেশায় ছিলেন চিকিৎসক প্রথমে ইংরেজ বাজারের পুড়াটুলিতে হাজী ডাক্তারের ডাক্তারখানায় হাতে খড়ি। এই ডাক্তারখানায় এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি উভয় ওষুধই দেয়া হতো। এখানে কিছুকাল অবস্থান করে তিনি চিকিৎসা পেশায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তারপর চিত্তরঞ্জন বাজারের পাশে দোকান খোলেন। সেখান থেকেই ডাক্তার হিসেবে তাঁর পরিচিতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬২ সালে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমা শহরে চলে আসেন।

সোলেমান ডাক্তার একজন স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি প্রায় সহস্রাধিক গম্ভীরা গান রচনা করেছেন। সামাজিক বিষয় অপেক্ষা দেশের রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত গম্ভীরা গান রচনায় তাঁর অধিক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর রচিত গানের অধিকাংশই আজ হারিয়ে গেছে। তিরিশের দশকে তাঁর গানের বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটে। প্রখ্যাত শিল্পী ও সঙ্গীত

রচয়িতা বিশ্বনাথ পণ্ডিত তাঁর দলে ছিলেন, পরে উভয়ের মধ্যে মতান্তর হওয়ার পর বিশ্বনাথ পণ্ডিত পৃথক দল গঠন করেন।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে ধর্মের বন্ধন মুক্তি তথা রাজনীতি বিয়ক গম্ভীরা গানে সুফি মাস্টারের সঙ্গে সোলেমান ডাক্তার এক স্মরণীয় নাম। তাছাড়া অধুনা বাংলাদেশে এসে চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে গম্ভীরা গানের প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সোলেমান ডাক্তার পরিণত বয়সে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে পরলোকগমন করেন। তাঁর গানের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

(ছেলের বাবা ও মেয়ের বাবা)

ছেলের বাবা: আগে সামলা নিজের বাড়ি
দিস্ পরেরি দোষ, হয়ে বেহোঁস
মেয়ে রেখে ধাড়ী॥

১

মেয়েরই, গুণ, কানা বেগুন
জেনেও তার মাতা।
ঘরে বসে আটা পিসে
হয়ে ঢেঁকি যাঁতা।
কেউ বলতে গেলে, ভাজা তেলে
তারি ভাঙ্গে হাঁড়ি॥

২

সোনার চুড়ি হাতে ঘড়ি
চশমা এঁটে।
খোপারই চুল, জড়িয়ে ফুল
বাঁধে ঢেউ কেটে।
ও ঘুরে মতলব করে, ফ্যাসান ধরে
ও পরে মার্কা মারা শাড়ি॥

৩

টকি দেখে, নাচ গান শিখে
আরও কত কি।
প্রাণ ঢেলে কাঁদে ফেলে
খায় মাখন ঘি।
বেড়ায় নৌকায় চড়ে, গুণ ধরে
সমুদ্রে দেয় পাড়ি॥

মেয়ের বাবা: যাই তোর কথার বলিহারী
সাফাই ঝেড়ে, মাথা নেড়ে
দেখাও দোষ আমারি॥

১

ছেলেরা আজ পেয়ে স্বরাজ
সেজে ধর্মা ষাঁড়।
সাধু বেশে ঘরে এসে
খুঁজে মধুর ভাঁড়।
খেলে তাস পাশা, লয়ে আশা
করে আড্ডা জারি॥
মাসি পিসি, যে যার খুশি
সম্বন্ধ পেতে,
আসে যায়, শুষে খায়
রঙ্গেতে মেতে।
চলে উজান ভাটা, ভুলে ঘাটা
সেজে ব্রহ্মচারী॥

২

লেখা পড়া, বিয়ে করা
শিকেতে তুলে,
উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, চাঁদের ফাঁকে
ফুটন্ত ফুলে
ঘুরে বিলাসিতায়, চরম মাত্রায়
হয়ে বেরোজ গাড়ি॥

বিশ্বনাথ পণ্ডিত (১৯২০-২০০১) : মলদহের প্রখ্যাত গম্ভীরা রচয়িতা বিশ্বনাথ পণ্ডিত ১৯২০ সালে মালদহ জেলার ইংরেজ বাজার থানার হাটখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম অমৃতলাল। পূর্ব পুরুষের আদিবাস বিহার হলেও প্রায় দুশো বছর আগে মালদায় তাঁদের পরিবারের আগমন ঘটে।

বিশ্বনাথের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও, তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। তাঁর পেশা ছিল মূলত মৃৎশিল্প। প্রতিমাশিল্পী, পুতুল, সস্ ও ওয়েল পেন্টিং-এ ছিল তাঁর অসাধারণ দক্ষতা। তিনি তৈরী করতেন বিচিত্র আকারের মাটির পুতুল ও টেরাকোটা পুতুল।

গান ছিল বিশ্বনাথ পণ্ডিতের রক্তে প্রবহমান। যখন তার বয়স ৭/৮ বছর ঠিক তখনই তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হন গম্ভীরার অন্যতম রূপকার মোহম্মদ সফিউর রহমান ওরফে সুফি মাস্টার। প্রথমে কৃষ্ণযাত্রার অভিনেতা হিসেবে সঙ্গীতাঙ্গনে পদচারণা শুরু করলেও তাঁর

বিকাশ ঘটে সুফী মাস্টারের দলে যোগদানের ফলে। ১৯৩৭ সালে বিশ্বনাথ নিজেই একটি দল গঠন করেন।

বিশ্বনাথ পণ্ডিতের গম্ভীরা দলের গান লেখক (গম্ভীরা রচয়িতা) ছিলেন গোপাল দাস। পরবর্তীকালে সোলেমান ডাক্তারের গানও তাঁর দলে পরিবেশন করা হতো। শেষ পর্যায়ে তিনি নিজেই সঙ্গীত রচনা শুরু করেন। ১৯৬০-৬২ সাল পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব দলের অনুষ্ঠান হতো।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গম্ভীরা গান পরিবেশন করে খ্যাতি লাভ করেন বিশ্বনাথ। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গম্ভীরা উৎসবে তিনি সোলেমান ডাক্তারের বন্দনা দিয়ে আসর শুরু করেন। তাঁর গান খ্যাতিমান চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক, অভিনেতা উৎপল দত্ত, শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রমুখের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন। ১৯৯৩ সালে তিনি তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'লালন পুরস্কারে' ভূষিত হন। ১৯৯৪ সালে মালদহে অনুষ্ঠিত জেলা গম্ভীরা উৎসব ও প্রতিযোগিতার আসরে তিনি সভাপতি ড. প্রদ্যোত ঘোষ ও জেলা শাসক কর্তৃক সম্মাননা লাভ করেন। ভারত সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর তাঁর মৃত্যুর ৩/৪ দিন পর সে ঘোষণাপত্র তাঁর পুত্রদের হাতে আসে।

বিশ্বনাথ পণ্ডিত অনন্য শ্রুতিধর এবং স্মৃতিধরও বটে। গানের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকে তাঁর পাণ্ডিত্য এ পর্যন্ত গম্ভীরার রাজ্যে মেলেনি। বিশ্বনাথ পণ্ডিতের গানের নমুনা–

আমের গান

(দুই আম বিক্রেতা-একজন ছেলে, অন্যজন মেয়ে)

মেয়ে ঃ বাবু, বলি তোমার কাছে, ওধারে যেও পাছে
এখানেও আছে, নামকরা আম।
(তুমি) লাওনা দেখ্যা শুন্যা
নিজের হাতে গুন্যা
একটাও পাবা না খুঁজ্যা, সরা পচা
(একেবারে পচা) আম

ছেলে: বাবু বড় কষ্ট কইরা, গাছের ওপর চইর‍্যা
এন্যাছি পাইর‍্যা, মালদইয়া আম।
(তুমি) লাওনা না লাও, চাইখা দেইখা যাও
একে একে শুনাই কত রকম নাম।
ক্ষীরমোহন, মতিঝুরণ, দিলসাজ, ক্ষীরসাপাতি,
বৃন্দাবনী, গোপালভোগ, দুধিয়া, ভারতী,
লোহাজং, বেগমবাহার, দুধকুমোর, কুয়াপাহাড়া,
আরাজনা, মিছরিকন, সুরমাফজলী, ঘি কাঞ্চন,
মোহনভোগ, লম্বাভাদুরা, চকচকা, গুটিসিন্দুরা,

বেলুয়া, কেলুয়া, আক্‌লুমাটি,
জালিবান্ধা, হিল্‌সাণেপাটি,
সীতাভোগ, বদনাসোনারা,
রামপসিন, জিলাপিক্যারা,
বোম্বাই, সবজা, শৌল্‌ঢুক্‌কা,
রুহিমুণ্ডা, চোঙা, হুক্‌কা,
কালাপাহাড়, মুনিরা, দিলবাহার, ফুনিয়া,
তোতামুখি, শিয়ালখাউকি,
ল্যাংড়া, গোলাপজাম॥ (ধুয়া)
খুটারিয়া, ধোকরিয়া, নাকুয়া, তাবাকবুসন
করলাদাগি, কিষাণভোগ, গোলাপখাস, তালকুন,
মণিকাঞ্চন, কাচ্চামিঠা, কুমড়াজালি, রসুনপাতা,
চিনিচাম্পা, মোহনবাঁশি, কালুয়াদাগী, বারোমাসি
জামানিয়া, সাওনিয়া, কাউয়াডিম্বি, মণ্ডানিয়া
আশ্বিনা, কর্মা, মধুচুসকি
গিধ্‌নী হাগ্‌গা, পানি লটকি
রাখালভোগ, জহুরিয়া
নবাব পসিন, কপুরিয়া
অমৃতভোগ, কোহিতুর
গৌড়জিতি, মোতিচুর
হিমসাগর, ঢোরসা, রঙবাহার, বাতাসা
চিড়াভিজা, কোসাকাঞ্চন,
লখ্‌না, পতিরাম। (ধুয়া)

দোকড়ি চৌধুরী (১৯২৭) : ইংরেজবাজারের বাঁশবাড়ির দোকড়ি চৌধুরী ছিলেন একজন গম্ভীরা সংগীত রচয়িতা ও গায়ক শিল্পী। যাঁদের জন্য গম্ভীরা সংগীত রচয়িতা ও গায়ক শিল্পী। যাঁদের জন্য গম্ভীরা সংগীত এখনও মালদহে আসন পেতে বসে আছে তাঁদের উত্তরসূরী হচ্ছেন দোকড়ি চৌধুরী। ১৯৬৫ সালে যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী (মটর) যখন কুতুবপুর গম্ভীরা দল ছেড়ে নতুন দল তৈরি করেন, তখন দেবনাথ রায়ের (হাবলা) সঙ্গে তিনিও ছিলেন মটর দলের গম্ভীরা সংগীত রচয়িতা। গম্ভীরা সংগীত রচয়িতা ও গায়কশিল্পী হিসেবে তিনি মালদহের মানুষের কাছে অতিপরিচিত। তিনি এখন গম্ভীরা সংগীতকে হাতিয়ার করে সামাজিক অন্যায়, অবিচার ও পীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন। দোকড়ি চৌধুরী রচিত গম্ভীরা গানের নমুনা:

কি খাবিটে বহিন পাক্কা আম
ধুয়া রাখ্‌ সুয়াদের চোপাখান।
হামরা মালদোর লোক, গিল্‌ছিটে ঢোক
বিশ টাকা কিলো আমের দাম

সম্বছর আগের দিনে, কুড়িয়ে কাত্তা আম বাগানে
বাগদুর চাখ্যা শিয়াল খাউকি, খ্যায়াছে সাপে পোকা ব্যাঙে
আইজ্ উগলাউ মিলে না বহিন
না চাখনু একনা সরা আম।
মাকই বাদামের ছাতুয়া, খ্যায়ে ছিলাম মাখিয়্যা
জ্যোষ্টি আষোঢ়, শাওন ভাদ্দর, খ্যায়াছি রশিয়্যা
দেখেনি ভাতরুটির মুখ, হায় রে কি সুখ
এ্যাখুন খ্যাচে মিনিস্টার, চেয়ারম্যান।
তাই কহি বহিনটে আম পেবি আর কুনঠে
গাড়ি গাড়ি চালান গেছে বিদ্যাশের বাজারে হাটে
ভাইভাদর আসনা, সেও প্যাসনা
লিসনা মুখের আর আমের নাম।

নির্মল দাস ওরফে নিরু (১৯২৯-২০০৫) : পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত পালা গম্ভীরার অন্যতম প্রধান চরিত্র মূখ্য অভিনেতা (উচিত বক্তা)– হিসেবে যাঁরা অনন্তকাল ধরে স্মরণীয় থাকবেন তাঁদের মধ্যে নির্মলদাস ওরফে নিরু অন্যতম।

নির্মলদাসের জন্ম মালদহ জেলার ইংরেজবাজার থানার গয়েশপুর গ্রামে ১৯২৯ সালে। তাঁর পিতার নাম অঘোরনাথ। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর তিনি মালদহ কোর্টের মুহুরি হিসেবে কার্যক্রম শুরু করেন।

ছোটবেলা থেকেই গম্ভীরা গানের প্রতি তাঁর আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে তিনি দেবনাথ রায় ওরফে হাবল এবং বিশ্বনাথ পণ্ডিতের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর গোপীনাথ শেঠের দলে যোগদান করেন। দলের প্রধান অভিনেতা যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ওরফে মটরের সহযোগী নারী চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেন। মটর বাবু পৃথক দল করলে নিরু গোপীনাথের দলে মূখ্য অভিনেতা হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিনি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর গম্ভীরা গানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মটর বাবুর সমসাময়িক যুগে অন্যতম এবং মটর পরবর্তী নিরুই পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ গম্ভীরা অভিনেতা এতে সন্দেহ নেই।

নিরু কলকাতা দূরদর্শন, আকাশবাণীর শিল্পী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে গম্ভীরা গান পরিবেশন করেন। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি ছিল সরব। ইনষ্টিটিউট অব ফোককালচার, মালদহ সম্মিলন ও কলকাতা স্মারক সম্মান সহ বিভিন্ন সম্মান ও সংবর্ধনা তিনি লাভ করেন। নির্মল দাস (নিরু) বর্তমানে মালদায় ইংরেজ বাজার থানায় কুতুবপুর নয়াগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

ডা. দেবপ্রসাদ সাটিয়ার (১৯৩১-২০০৫) : প্রগতিশীল গম্ভীরাশিল্পী ও রচয়িতা ডা. দেবপ্রসাদ সাটিয়ার ১৯৩১ সালে অভিভক্ত বাংলার মালদহ জেলার ইংরেজ বাজার থানার গোলাপট্টিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম স্বর্গীয় শঙ্করী প্রসাদ। তাঁরা চার পুরুষ ধরে গোলাপট্টিতে বসবাস করে আসছেন।

দেবপ্রসাদের শিক্ষা জীবনের সূচনা মালদহ শহরে। ১৯৪৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে আই. এস. সি'তে ভর্তি হন। আই. এস. সি পাসের

পর কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৫৬ সালে এম. বি. বি. এস পাশ করেন। কলকাতা পি. জি হাসপাতালে দু'বছর হাউস স্টাফ হিসেবে কাজ করার পর তিনি মালদহ ফিরে আসেন। ১৯৫৮ সাল থেকে তিনি ইংরেজ বাজারে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত হন।

পেশায় চিকিৎসক হলেও ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রতি ছিল তাঁর অসীম আগ্রহ। মালদহ গম্ভীরার কেন্দ্রভূমি তাই শৈশব থেকেই তিনি গম্ভীরার আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হন। কলকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যায়নকালীন সময়ে তিনি বহু অনুষ্ঠানে গম্ভীরা গান পরিবেশন করেন। ইংরেজ বাজারের এই খ্যাতিমান চিকিৎসক যে কোন অনুষ্ঠানে গম্ভীরা গানের আমন্ত্রণ পেলে তা সানন্দে গ্রহণ করতেন। একসময় তিনি একটি গম্ভীরা দলও গঠন করেন।

ড. দেবপ্রসাদ সাটিয়ারের গম্ভীরা গানের 'শিব হে' নামের একটি ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে। এতে তাঁর ৮টি জনপ্রিয় গান স্থান পেয়েছে। গম্ভীরা ছাড়াও ১৯৯৭ সালে লঘু সঙ্গীতের সংকলন গ্রন্থ 'সঙ্গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ দেবপ্রসাদ পেয়েছেন অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা। ১৯৯৪ সালে তিনি জেলাভিত্তিক গম্ভীরা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা ও আই, এম, এ (I.M.A) মালদার গুণী সংবর্ধনা লাভ করেন।

ডা. দেবপ্রসাদের গান অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ। তাঁর গান সরস অথচ নির্ভীক, এমনকি নিজের শ্রেণীচরিত্র (ডাক্তার শ্রেণী) কেও আক্রমণে তিনি হতোদ্যম বিরত হননি। ২০০৫ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। ডা. দেবপ্রসাদ সাটিয়ারের গম্ভীরা গানের নমুনা :

কলকাতা দর্শন ১৩৬০ বঙ্গাব্দ

(গ্রাম্য টেপীর বাপের কলকাতা দর্শনের অভিলাষের কথা)

১. চল টেপীর মা, হামরা দুজনা ঘুর‍্যা আসি কলকাতায়।
রেলগাড়ীৎ চোড়্যা, যাবো দোড়্যা সাধ ছিল মনে বাড়াই।

২. পান্তাভাতে নুন পিঁয়াজ দিয়্যা ব্যাঁধা লে তুই গামছাতে লিয়্যা
ওইঠে পথে-বিপথে ভিন-গাঁয়েতে কি খাবো ভুখের জ্বালায়।

৩. ওইঠে পথে ঘাটে গুন্ডা কড়া জোর।
পাছে পাছে ল্যাগতে পাবে তোর।
রাখিস কড়া নজর, রাখ্ ব্যাঁধা তোর।
ওই খুঁট্টা হামার খুঁট্টায়।

৪. ওইঠে কালী ঘাটে আছে জাগান কালী,
মানত কর‍্যা দিব পাঁঠা বলি।
বলবো চোখ তুল্যা চা মা করালী
নইলে বংশ খালি থ্যাকা যায়।

৫. ওইঠে রাস্তা দিয়া চলে টেরাম গাড়ি

ইনজিন নাই, ধুঁয়ার নাই তারই।
খালি টিক্কি দিয়্যা তারে তারে
কেমনে কর‍্যা আগায়-পাছায়।

৬. ওইঠে মরদ-মাইয়ার কোন তফাৎ নাই।
একই সঙ্গে হেলতে-দুলতে যায়।
তোকেও কোরবো মডার্ণ হালের ফ্যাশান
হাত ধর‍্যা খাবো হওয়ায়।

কুতুবুল আলম (১৯৩৬-১৯৯৯) : বাংলাদেশের গম্ভীরা গানের কিংবদন্তীর শিল্পী কুতুবুল আলমের জন্ম ১৯৩৬ সালের ২৩ জুন চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব শামসুর রহমান, বি. এ, বি. টি তিনি একজন শিক্ষাবিদ ও সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন।

কুতুবুল আলম বি. এ পর্যন্ত পড়লেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেননি। কর্মজীবনে প্রবেশ করেন ১৯৬৫ সালে। প্রথমে সচিবালয়ে রিলিফ এন্ড বিহ্যাবিলিটেশান বিভাগের নিম্নমান সহকারি পদে চাকুরি করেন। ১৯৬৩ সালে কৃষি তথ্য সংস্থার মহকুমা পর্যায়ে 'মাঠ সংগঠক' পদে যোগদান করেন। ১৯৬৭ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বদলী হয়ে আসেন। তারপর বিভিন্ন জেলায় চাকুরি করার পর সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হয়ে অবসর গ্রহণ করেন।

একজন অভিনেতা হিসেবে তাঁর সাংস্কৃতিক জীবনে সূচনা। অভিনয় করেছেন অসংখ্য নাটকে। চলচ্চিত্রেও তাঁর ঘটেছে সরব পদচারণা। গম্ভীরা গানের হাতে খড়ি ১৯৪৯ সালে। ঐতহ্যবাহী হরিমোহন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন সময়ে তিনি প্রথম গম্ভীরা করেন। ১৯৭৪ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে গম্ভীরা করেন। গম্ভীরা গানে 'নানা' হিসেবে অভিনয় প্রতিভায় জীবদ্দশায় তিনি প্রবাদ প্রতিম। লাভ করেছেন অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা। এসব পুরস্কারের মধ্যে রাজশাহী বরেন্দ্র একাডেমী বৃহত্তর রাজশাহী জেলা সমিতি, ঢাকা, নবাবগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমী, রাজশাহী সঙ্গীত ভবন, পদ্মা থিয়েটার, বাংলাদেশ ফোকলোর কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত সম্মাননা উল্লেখযোগ্য। তিনি দেশের বাইরেও গম্ভীরা পরিবেশন করেছেন। ১৯৯৪-৯৫ সালে তিনি ভারতের দিল্লী, কলকাতা, বর্ধমান, হলদিয়া, ডায়মণ্ড হারবার প্রভৃতি স্থানে গম্ভীরা পরিবেশন করেন। গম্ভীরার এই প্রবাদপ্রতিম শিল্পী ১৯৯৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর ঢাকায় পরলোকগমন করেন।

রকিবুদ্দীন (১৯৪২-২০০৬) : বাংলাদেশের গম্ভীরা গানের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পী (নাতি) রকিবুদ্দীনের জন্ম ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহ জেলার ফুলকুড়ি গ্রামে ১৯৪২ সালে। তাঁর পিতার নাম সাবের আলী। দেশ বিভাগের পর তিনি পিতার সঙ্গে মালদহ থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ চলে আসেন।

রকিবুদ্দীনের পিতা ছিলেন বিখ্যাত গম্ভীরা রচয়িতা (নতুন আঙ্গিকের গম্ভীরা গানের রূপকার) শেখ সফিউর রহমান ওরফে সুফি মাস্টারের ভাই। তিনি গম্ভীরা দলের সঙ্গে যুক্ত

ছিলেন। পিতার অনুপ্রেরণা তাঁকে গম্ভীরা গানের প্রতি অনুরক্ত করে তোলে। এককথায় বলা যায় গম্ভীরা গান উত্তরাধিকার সূত্রে রকিবুদ্দীনের রক্তে মিশে আছে।

রকিবুদ্দীন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন হরিমোহন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি খেয়াল, ঠুমরি ইত্যাদি গান গাইতেন, পাশাপাশি অভিনয় করতেন নাটকে। ১৯৭২ সালে তৎকালীন সমবায় মন্ত্রী মতিউর রহমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলে তাঁর সম্মানে গম্ভীরা গানের আয়োজন করা হয়। সেই গম্ভীরায় প্রথমবারের মতো নাতি হিসেবে আবির্ভূত হন রকিবুদ্দীন। তারপর আর পিছন ফিরে তাকানো নয়। ১৯৭২ সাল থেকেই বাংলাদেশ বেতারে গম্ভীরা পরিবেশন শুরু করেন। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের শিল্পী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন।

১৯৯৪ এর ১৮ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৫ এর ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি ভারতের দিল্লী, কলকাতা, বর্ধমান, হলদিয়া, ডায়মণ্ড হারবার গম্ভীরা পরিবেশন করেন। কুতুবুল আলমের মৃত্যুর পর তিনি পর্যায়ক্রমে মাহবুবুল আলম ও সাইদুর রহমানকে নানা করে দলে গঠন করেন। তিনি ৬ নভেম্বর ২০০৬ চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের বাসুনিয়াপট্টির নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪২-২০০৪) : পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় গম্ভীরা রচয়িতা ও শিল্পী বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪২ সালে হুগলী জেলার পোলরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম অনাথ বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা স্থায়ীভাবে মালদহের চাঁচলে বসবাস করে আসছেন।

বৈদ্যনাথ Electronics Equipments Training College-এ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর Murphy Company তে Service Engineer রূপে যোগদান করেন। কিছুকাল চাকরী করার পর Murphy Dealer হন। শেষে শিশুতীর্থ নামে একটি নার্সারি স্কুল স্থাপন করেন।

গম্ভীরা গানের প্রতি বৈদ্যনাথের আগ্রহ শৈশব থেকেই। সেই অনুরাগের কারণে তিনি যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী (মটর) ও নির্মল দাস (নিরু) এর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। ষাটের দশক থেকেই তিনি আশেপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে গম্ভীরা গানের আমন্ত্রণ পেতে থাকেন। মালদার আঞ্চলিক ভাষায় গম্ভীরা গান রচনা ও নতুন আঙ্গিকের স্রষ্টা হিসেবে খ্যাতিমান বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৪ সাল থেকে শিশুশিল্পীদের গম্ভীরা গান রচনার তালিম দেয়া শুরু করেন। তাঁর হাতে গড়া শিশুশিল্পী ঋক্ চক্রবর্তী ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত মালদহ জেলা গম্ভীরা প্রতিযোগিতায় বড়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সার্বিক অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন। গম্ভীরা গানের ধারা প্রবাহকে চলমান রাখার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখায় ১৯৯৭ সালে মালদহ জেলা তৃতীয় গম্ভীরা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে তিনি সংবর্ধনা লাভ করেন। গম্ভীরা গানের এই খ্যাতিমান শিল্পী ও রচয়িতা ২০০৪ সালে পরলোকগমন করেন। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গম্ভীরা গানের নমুনা :

শিব-বন্দনা

এ কোন ব্যাশেতে
এ্যাসাছো নানা॥

কোট-প্যান্টও পরোনি
টাটা সুমো চড়োনি
ষাঁড়ে চ্যড়ে এ্যাসাছো নানা
এ কোন ব্যাশেতে এ্যাসেছো নানা।
বাঘ-ছালটা পিন্যাছো
আখার ছাইটা ম্যাখেছো
ত্রিশূল হাতে এ্যাসেছো নানা।
তুমি স্যাকেলেই থ্যাকে গ্যালে নানা॥
দ্যাখে বদলে দিচ্ছে যে জামানা॥
মাষ্টারদের লিখতে হবে
প্রাইভেট পড়াবো না
নইলে আর বেতন পাবে না॥
এ নিয়ম সম্মানের না অসম্মানের
মগজে/এটাই-খেলছে না।
তুমি কপাল-চোখটা খুলে দ্যাখো নানা
এদের ভস্ম করা যায় কিনা?
নইলে ছ্যাচাই পালটাবে দুনিয়া॥

সিরাজুল ইসলাম (জ. ১৯৪২) : বাংলাদেশের অন্যতম খ্যাতিমান গম্ভীরা রচয়িতা মো. সিরাজুল ইসলাম ১৯৪২ সালে অবিভক্ত ভারতের মালদহ জেলার (বর্তমান বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা) নবাবগঞ্জ থানার বারঘরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নবাবগঞ্জ শহরের হরিমোহন ইন্সটিটিউশন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, নবাবগঞ্জ কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রি এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম. এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে রংপুর জেলার গাইবান্ধা থানার পলাশবাড়ী ডিগ্রি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তারপর বিভিন্ন সময়ে শিবগঞ্জ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে এবং শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ কলেজের অধ্যাপক হিসেবে চাকুরী করেন। তিনি বাংলাদেশ বেতার রংপুর ও রাজশাহীর শিল্পী হিসেবে খ্যাতিমান। বর্তমানে তিনি রাজশাহী বেতার স্পেশাল গ্রেডের রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী। তিনি তিন শতাধিক গম্ভীরা গান রচনা করেছেন। সিরাজুল ইসলাম রচিত গম্ভীরা গানের নমুনা :

(ঢাকায় অনুষ্ঠিত সার্ক সম্মেলনকে কেন্দ্র করে)

হে নানা সার্কের এ আসরে হে

আস্যাছি হামরা কয়জনা
গম্ভীরা গান দিয়া এখন
কবর দু'কথা আলোচনা।

১. শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াই
ভাবলেন দক্ষিণ এশিয়ায়
সার্বিক উন্নয়নের তরে
কাজে নামলেন উঠে পড়ে
অমর থাকলেন বিশ্ববাসীর হিয়ায়॥

২. ভারত শ্রীলংকা ভুটান
মালদ্বীপ নেপাল পাকিস্তান
চলবো মোরা সবে মিলে
সাথী হয়ে এক মিছিলে
তুলে সবে একতার শ্লোগান॥
দারিদ্র্য শত্রু
এ সব না হঠাইলে চলবে না॥

৩. সাতভাই চম্পা মোরা যত
থাকবো আপন ভায়ের মত
সুখী পারুল ডাকবে শেষে
এগিয়ে যাব ভালবেসে
পার হইব বাধা শত শত
সার্ক চলিবে আলো হাতে
দেখাইবে সঠিক নিশানা॥

মাহবুবুল আলম (জ. ১৯৫২) : বাংলাদেশের গম্ভীরা গানের বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় শিল্পী নানা মাহবুবুল আলম। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার দূর্গাপুর গ্রামে ১৯৫২ সালের ৮ জুলাই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সাদাতুল ইসলাম।

মাহবুবুল আলম চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ থেকে ১৯৮৩ সালে বি. এ পাশ করেন। তারপর শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ কলেজে গ্রন্থাগারিক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৬ এ গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ে ডিপ্লোমা করেন।

মাহবুব ছাত্র জীবন থেকে সংস্কৃতি অনুরাগী। যখন তিনি ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র তখনই স্কুলে গম্ভীরা গান করে সবাইকে মুগ্ধ করেন। তবে গম্ভীরা গান অনুশীলন শুরু করেন ১৯৮৪ সাল থেকে। শহরের বিশিষ্ট আলকাপ শিল্পী বীরেন্দ্রনাথ ঘোষকে নাতি বানিয়ে তিনি গম্ভীরা গাওয়া শুরু করেন। ১৯৮৬ সালে তাঁর দল বাংলাদেশ বেতার রাজশাহীর তালিকাভুক্ত হয়। বীরেন ঘোষকে নিয়ে তিনি বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীসহ বিভিন্ন জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে গম্ভীরা গান পরিবেশন করেন।

বীরেন ঘোষের মৃত্যুর পর কিছুকাল তিনি রকিবুদ্দীনের সঙ্গে গম্ভীরা জুটি বাধেন। পরবর্তী সময়ে ২০০০ সালে তিনি ফাইজুর রহমান মানি নামে তরুণ এক শিল্পীর সঙ্গে জুটি বাঁধেন এবং অদ্যাবধি তাঁর দলটি জেলার শীর্ষস্থানীয় দল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মাহবুব-এর 'চাঁপাই গম্ভীরা' এ পর্যন্ত দুই হাজারের অধিক গম্ভীরা পরিবেশন করেছে, অর্জন করেছে ব্যাপক প্রশংসা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লাভ করেছেন পুরস্কার ও সম্মাননা। এসব সম্মাননার মধ্যে রয়েছে-জাতীয় সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার, রোটারি ক্লাব সনদ, কুতুবুল নানা স্মৃতি সংসদ সম্মাননা। মাহবুব গম্ভীরা ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের আঞ্চলিক গান রচনা ও পরিবেশন করে ইতোমধ্যে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছেন।

হরিমোহন কুণ্ড : পশ্চিমবঙ্গের সাহাপুরের প্রখ্যাত গম্ভীরা কবি হরিমোহন কুণ্ড। তাঁর রচিত চাষিরূপে শিব একটি আধ্যাত্মিক গম্ভীরা। এখানে উক্ত শিববন্দনাটি উদ্ধৃত করা হলো।

শিববন্দনা (চাষীরূপে শিব)

তুমি হয়ে চাষী কাশীবাসী কেন কাশীশ্বর?
তোমার কর্মক্ষেত্র এই ব্রহ্মাণ্ড ক্ষেত্র তব হর॥
ব্রহ্মা যিনি বিষ্ণুকুমার, বীজবুনানী মজুর তোমার,
কতই যে বীজ হয়নি সুসার, ওহে গঙ্গাধর।
মন আত্মা দুই বলদ বেঁধে, কর্ম জোয়াল চাপিয়ে কাঁধে
মায়ারজ্জু নাসায় ছেঁদে কতই না আর তাড়া॥
সুখ দুঃখ দুই শক্ত যোদ্ধা সেই জোয়ালে আছে থোতা।
(তুমি) আশালাঠি দিচ্ছ গোঁতা ওহে দিগম্বর।
সৃষ্টি হতে লয় পর্যন্ত, চাষের কি হবে না অন্ত?
(তুমি) কিঞ্চিদপি হওয়া ক্ষ্যান্ত, ওহে বিশ্বেশ্বর।
তব ক্ষেত্রে এ সংসার, দিনে দিনে হচ্ছে অসার
হরিমোহন বলে ও সারাৎসার, সারবিতরণ কর।

শরৎচন্দ্র দাস : শরৎচন্দ্র দাস পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় ইংরেজ বাজার এলাকার একজন খ্যাতিমান গম্ভীরা রচয়িতা। তাঁর রচিত একটি গম্ভীরার প্রতিটি স্তবকের মধ্য দিয়ে তৎকালীন মালদহের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এখানে সেই গানটির কয়েকটি স্তবক উদ্ধৃত করা হলো

কলেরা এসে শহরে দেখা দিল প্রায় ঘরে ঘরে
কত বাঁচল কত মৈল কে তার খোঁজ করে।
এই কলেরায় হারিয়েছিল ভাই প্রাণের রাধিকারঞ্জন
মহান্ত বলদের গিরি নিজের সুখ পরিহরি,

এনট্যান্স স্কুল করতে দিতে চাইলে দালান বাড়ি
কর্তৃপক্ষ হয়ে স্বপক্ষ করবেন কি আশা পূরণ?
চাঁচলের রাজা বাহাদুর করেছেন কত দেশের অভাব দূর
নগরিয়া স্কুলে অর্থ দিয়েছেন প্রচুর
(আবার) হিন্দু-মুসলমান পায় রাজার দান
করেছেন তিনি প্রজারঞ্জন।
রজনী পণ্ডিত মশায় মালদহের উন্নতির আশায়
সাহিত্য সভা গড়লে তিনি এ বৃদ্ধ দশায়।
প্রবীণ পেয়েছেন তার সরকারি নবীন কালীরঞ্জন।
দশের তরে ভিখারী হামাদের বিপিন বিহারী
কৃষি শিল্প শিক্ষা দিতে যত্ন করে ভারি॥

বামনবিহারী গোস্বামী : বামনবিহারী গোস্বামী গোঁসাইবাড়ির বংশজাত একজন উচ্চশ্রেণীর গোঁসাই বামুন, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি এবং একজন নামকরা গম্ভীরা কবি। তাঁর গম্ভীরা সংগীতের মধ্যে রয়েছে একটা আধ্যাত্মিকতার ছাপ। এখানে তাঁর রচিত আনুমানিক ১৯০৩ সালের এক গম্ভীরা সংগীতের শিববন্দনা উদ্ধৃত করা হলো :

জয় জয় জগত্তারণ শম্ভু,
শিবে গরজত গঙ্গা অম্বু
সুচারু কণ্ঠ যিনি সুকম্বু
লম্বিত তাহে রুদ্র মাল।
কিবা অরুণাধর কুন্দ বদন,
হাস্যবদন শোভিত ভাল॥
লম্বিত জটা লটা পট শিরে
নয়ন যুগল ঢুলু ঢুলু করে
ধকধক জ্বলে ভাল সে অনল।
কিবা কটিতে বেষ্টিত শোভা বাঘাম্বর-
'ত্রিভুবন যিনি গতি মন্থর,
তরিতে অপার ভব সাগর
বামন মাগিছে ও পদ কেবল॥

এখানে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের খ্যাতিমান কয়েকজন গম্ভীরাশিল্পী ও রচয়িতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাঁদের সৃষ্টিকর্মের নমুনা তুলে ধরা হলো। এছাড়াও অসংখ্য গম্ভীরা শিল্পী ও রচয়িতা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে ছিলেন এবং আছেন। এখানে তাঁদের নাম তুলে ধরা যেতে পারে—পশ্চিমবঙ্গের অমর নাথ মণ্ডল, আশুতোষ ঘোষ, হরিবোল সাহা, কিনু

হালদার, কালুয়া, বিশুয়া, বীরেন ঘোষ, তারাপদ সরকার, বিমল গুপ্ত, তপন হালদার ধরণীধর সাহা, গোপাল দাস, কিশোরী পণ্ডিত, ঠাকুরদাস, মনোরঞ্জন দাস, গোলাম গুণ্ড ব্রজলাল পসারী, বিপিন খলিফা, শশী ডাক্তার, ইমরৎ হোসেন চৌধুরী, ভূপেন সাহা, জীবন হালদার, মৃণালকান্তি রায়, হাজারী বসাক, ধর্মদাস মণ্ডল, গোষ্ঠ বিহারী বাণিজ্যা, নীলকণ্ঠ দাস, গদাধর মণ্ডল, শমীর খলিফা, বিষ্ণু প্রসাদ নাগর, ধনকৃষ্ণ অধিকারী, মৃত্যুঞ্জয় শর্মা, শ্রীরূপ খলিফা, মধুসূদন খলিফা, বসন্ত মজুমদার, গোপালচন্দ্র দাস, তাবণ খলিফা, রজনী সরকার, উপেন্দ্র কর্মকার, সুদর্শন শেঠ, বিনয় গুপ্ত, কালীপদ গুপ্ত, গোপীনাথ শেঠ, রাম পণ্ডিত, দেবনাথ রায়, মৃত্যুঞ্জয় হালদার, সুধাকর দাস, তারাপদ লাহিড়ী, হরিদাস দাস, রাধানাথ কুণ্ড প্রমুখ। বাংলাদেশের গম্ভীরা রচয়িতা ও শিল্পীরা হচ্ছেন—পশুপতি মোক্তার, ফজলুর রহমান মোক্তার, মহসিন আলী মোক্তার নজরুল ইসলাম (ধুলু) সাবুরুদ্দীন প্রামানিক কাজী আফসার উদ্দিন, মোহিত কুমার দাঁ, লুটু মাস্টার, অক্ষয় কুমার পাল (লক্ষ্মীপাল), নাইমুল হক, মকবুল হোসেন, শেখ লাল মোহাম্মদ, আফজাল হোসেন, অধ্যাপক আবদুল গণি, নাজিম উদ্দীন নাজু, ফাইজুর রহমান মানি, বীরন্দ্র নাথ ঘোষ, সাইদুর রহমান, খাইরুল আলম, শিশ মোহাম্মদ, ওমর ফারুক, আয়েশ উদ্দীন, জিল্লার রহমান, বুদ্ধু ডাক্তার, মনিমুল হক, নজরুল ইসলাম, তাজিম সরকার, কমরুল হক, আবদুস সালাম, আবদুর রহমান সরকার, সঞ্জয় কুমার, খাবির উদ্দীন, আব্দুর রাজ্জাক খাদিজাতুর কুবরা, আরা, শংকর,, শাহজামাল, মুনির খান, রাহেলা খাতুন, সাবিনা ইয়াসমিন, শামীম হোসেন, শামসুর রহমান মিলন, শরিফুল আলম জুয়েল, শামীউল হক শাওন, মোজাম্মেল হক, এ. কে. এম. আসিফ ইকবাল পার্থ, স্বপন কুমার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীত গম্ভীরা গানের শিল্পী ও রচয়িতাদের নিয়ে এখন পর্যন্ত তেমন কোন গবেষণা হয়নি। অথচ এই কৃতি শিল্পীরা সুদীর্ঘকাল ধরে এই সঙ্গীত চর্চা তথা অনুশীলন করে দেশ ও জাতির সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন। অনেক সমস্যার সমাধানও হয়েছে তাঁদের প্রতিবাদী সঙ্গীতের আবেদনের প্রেক্ষিতে। তাই হারিয়ে যাবার আগেই এই লোককবি-শিল্পীদের জীবনী ও সৃষ্টিকর্ম সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।